Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের আচিক্ মান্দি নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর ধর্ম বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠানে সিনক্রেটিজম

SYNCRETISM IN THE RELIGIOUS BELIEF AND RITUALS OF ACHIK MANDI ETHNIC GROUP OF BANGLADESH

পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ

ইভা সাদিয়া সা'দ

বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলাদেশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ফেব্রুয়ারি, ২০২১

Dhaka University Institutional Repository

পিএইচ.ডি.
অভিসন্দর্ভ

ইভা সাদিয়া সা'দ

ফেব্রুয়ারি
২০২১

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের আচিক্ মান্দি নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর ধর্ম বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠানে সিনক্রেটিজম

SYNCRETISM IN THE RELIGIOUS BELIEF AND RITUALS OF ACHIK MANDI ETHNIC GROUP OF BANGLADESH

পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি. ডিগ্রির অর্জনের জন্য উপস্থাপিত

ইভা সাদিয়া সা'দ

পিএইচ.ডি. গবেষক
রেজিস্ট্রেশন নং- ৭০ (পুন:) শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭
বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা, বাংলাদেশ
ফেব্রুয়ারি, ২০২১

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের আচিক্ মান্দি নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর ধর্ম বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠানে সিনক্রেটিজম

SYNCRETISM IN THE RELIGIOUS BELIEF AND RITUALS OF ACHIK MANDI ETHNIC GROUP OF BANGLADESH

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি সম্পূর্ণ করার আবশ্যিক শর্ত
পূরণে বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগে উপস্থাপিত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

গবেষক

ইভা সাদিয়া সা'দ
রেজিস্ট্রেশন নং- ৭০ (পুন:)
শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭
বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

ড. কাজী নূরুল ইসলাম
অধ্যাপক
বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা, বাংলাদেশ
ফেব্রুয়ারি, ২০২১

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের আচিক্ মান্দি নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর ধর্ম বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠানে সিনক্রেটিজম

"বাংলাদেশের আচিক্ মান্দি নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর ধর্ম বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠানে সিনক্রেটিজম" (Syncretism in the Religious Belief and Rituals of Achik Mandi Ethnic Group of Bangladesh) শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার প্রণীত একটি মৌলিক রচনা যা আমি পিএইচ.ডি. ডিগ্রি অর্জনের উদ্দেশ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ড. কাজী নূরুল ইসলাম -এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য এই অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

উল্লেখ্য যে, আমার জানা মতে ইতোপূর্বে কোন গবেষক পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য এ শিরোনামে কোন অভিসন্দর্ভ রচনা করেননি এবং আমার রচিত এই গবেষণা অভিসন্দর্ভে কোন Plagiarism নেই।

ইভা সাদিয়া সা'দ
ফেব্রুয়ারি, ২০২১

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ইভা সাদিয়া সা'দ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের একজন পিএইচ.ডি. গবেষক। তার রেজিস্ট্রেশন নং- ৭০ (পুন:) ও শিক্ষাবর্ষ: ২০১৬-১৭। সে আমার সার্বিক তত্ত্বাবধানে 'বাংলাদেশের আচিক্ মান্দি নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর ধর্ম বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠানে সিনক্রেটিজম' (Syncretism in the Religious Belief and Rituals of Achik Mandi Ethnic Group of Bangladesh) শীর্ষক গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করেছে। এটি সম্পূর্ণরূপে গবেষকের একক গবেষণাকর্ম, কোন যুগ্মকর্ম নয়। আমার নির্দেশনা অনুসারে সে কাজটি সুন্দর ও সফলভাবে করেছে। এ কাজটি একটি অনন্য ও মৌলিক কাজ বলে আমার ধারণা। ইতোপূর্বে এ বিষয়ে কোন গবেষণাকর্ম হয়নি। আমার জানা মতে গবেষকের এই অভিসন্দর্ভে কোন প্রকার Plagiarism নেই।

আমি এ অভিসন্দর্ভটি যথার্থভাবে নিরীক্ষণ করেছি এবং গবেষককে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি অর্জনের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করার জন্য অনুমোদন করছি। আমি তার সাফল্য কামনা করি।

ফেব্রুয়ারি, ২০২১

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক ড. কাজী নূরুল ইসলাম
বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের আচিক্ মান্দি নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর ধর্ম বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠানে সিনক্রেটিজম

উৎসর্গ

পিতা– অধ্যাপক এ. কে. এম. সা'দউদ্দিন
ও
মাতা– অধ্যাপিকা সৈয়দা তাহেরা সা'দ

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের আচিক্ মান্দি নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর ধর্ম বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠানে সিনক্রেটিজম

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

অবশ্যই সমস্ত প্রসংশা সৃষ্টিকর্তার, আমরা তাঁর প্রসংশা করি এবং তাঁরই সাহায্য চাই। আমরা মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি আমাদের কাজের অনিষ্ট থেকে। নানাবিধ প্রতিকূলতা ও সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও পিএইচ.ডি. ডিগ্রি অর্জনের জন্য এই অভিসন্দর্ভটি সম্পন্ন করতে পেরে আমি সেই মহান সৃষ্টিকর্তার সমস্ত প্রশংসা জ্ঞাপন করছি যাঁর অশেষ রহমত ব্যতীত এ গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

এ গবেষণাকর্মে যারা আমাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিভিন্ন সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এ পর্যায়ে সর্বপ্রথম গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে স্মরণ করছি অত্র গবেষণা অভিসন্দর্ভের তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও অধ্যাপক ড. কাজী নূরুল ইসলাম স্যারকে, যিনি অভিসন্দর্ভের বিষয় নির্ধারণ থেকে শুরু করে গবেষণাকর্মের শেষ পর্যন্ত নিরন্তর উৎসাহ-উদ্দীপনা, এ অভিসন্দর্ভের বিভিন্ন অধ্যায়, উপাধ্যায় বিন্যাস, গবেষণা পদ্ধতি ও তথ্য সংযোজন প্রক্রিয়া প্রভৃতি বিষয়ে সুচিন্তিত পরামর্শ ও মূল্যবান দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। শত ব্যস্ততার মাঝেও তিনি তাঁর অতি মূল্যবান সময় দিয়ে অভিসন্দর্ভের প্রতিটি শব্দ সযত্ন পাঠ করে প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন ও পরিমার্জন করে বর্তমান অভিসন্দর্ভটিকে এর অবয়ব ও ভাবসৌন্দর্য বৃদ্ধিসহ বর্তমান প্রাণবন্ত পর্যায়ে উন্নীত হতে নিরলস সহায়তা করেছেন।

আমি আরো স্মরণ করছি অধ্যাপক ড. আজিজুন্নাহার ইসলাম ম্যাডামসহ আমার সকল সম্মানিত শিক্ষকদের যাঁদের শিক্ষা আমার অনুপ্রেরণা। যাঁরা বিভিন্ন পর্যায়ে আমাকে অধ্যয়নে উৎসাহ প্রদান করে এসেছেন। আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও সহকর্মীবৃন্দ যাঁরা বিভাগীয় সেমিনার আয়োজনের ব্যাপারে আমাকে নিরন্তর অনুপ্রেরণা ও ঐকান্তিক সহযোগিতা দিয়েছেন। তাঁরা সেমিনারে সারগর্ভ আলোচনা পেশ এবং থিসিসের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে গঠনমূলক সমালোচনা করে যেভাবে আমাকে কৃতার্থ করেছেন তা অত্র গবেষণাকর্মটি সুন্দররূপে সম্পাদন করতে অনেক উপকারে এসেছে। তাঁদের অবদানের কথা কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

আলোচ্য অভিসন্দর্ভের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যাঁদের কাছ থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমি উপকৃত হয়েছি তাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তাছাড়া মূল্যবান তথ্য-উপাত্ত ও পরমর্শ প্রদান করে যারা এই গবেষণাকর্মকে সমৃদ্ধ করেছে তাঁদের সকলের প্রতি আমি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

এ পর্যায়ে অধ্যাপিকা সৈয়দা তাহেরা সা'দ– আমার মা এবং অধ্যাপক এ. কে. এম. সা'দউদ্দিন– আমার বাবাকে ভালবাসার সাথে স্মরণ করছি। তাঁদের দোয়া ও অনুপ্রেরণা আমার জীবন চলার পথের পাথেয় হিসেবে কাজ করেছে। বিশেষ করে বাবার নিরন্তর উৎসাহ, অনুপ্রেরণা, দায়িত্বশীলতা ও সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানের ফলেই গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে।

পরিশেষে, আমার পরিবারের সদস্যদের প্রতিও আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, কেননা তাঁরাও এ কাজের নিরন্তর সহায়ক।

ইভা সাদিয়া সা'দ
ফেব্রুয়ারি, ২০২১

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের আচিক্ মান্দি নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর ধর্ম বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠানে সিনক্রেটিজম

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ একটি বহুত্ববাদী দেশ যার অধিকাংশ অধিবাসী মুসলিম। এছাড়াও রয়েছে আরো চারটি ধর্মের অনুসারী তবে তাদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম হলেও প্রতিটি ধর্মেরই রয়েছে সুদীর্ঘ সমৃদ্ধ ইতিহাস। এই ধর্ম গোষ্ঠীগুলোর পাশাপাশি বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী রয়েছে, যাদের অনেকেরই রয়েছে নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী ধর্ম যা বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ ও বৈচিত্রময় করে তুলেছে। কিন্তু পরবর্তীকালে প্রায় সবগুলো গোষ্ঠীর সদস্যরাই কোন না কোন বিশ্বধর্মের অধীনে আসলেও তারা তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে ত্যাগ করেনি। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব আদিবাসী ধর্মের সাথে বিশ্বধর্মগুলোর কোন কোন প্রথা বা বিশ্বাস অসামঞ্জস্যপূর্ণ হলেও তারা দু'ধরনের ধর্মবিশ্বাসই একইসাথে পালন করে আসছে। এক্ষেত্রে দু'টি ভিন্ন প্রথা বা বিশ্বাসের অনুসরণে কোন বিরোধিতা তাদের কাছে ধরা পরে না। এর ফলে তাদের বিশ্বাস ও ধর্মীয় কার্মকাণ্ড একই ধর্মের অনুগত অনেক অনুসারীদের থেকে তাদের সংস্কৃতি ও ধর্মবিশ্বাসকে স্বতন্ত্র করেছে। এমনই এক ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী হচ্ছে আচিক্ মান্দি নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী যারা অন্যদের কাছে গারো নামে পরিচিত হলেও তারা নিজেদের আচিক্ মান্দি বা পাহাড়ের মানুষ বলে পরিচয় দিতে পছন্দ করে। ঐতিহ্যগতভাবে আচিক্ মান্দিরা সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাসী এবং দেব-দেবীর পূজা করে। বর্তমানে বাংলাদেশে বসবাসকারী গারোদের ৯৮ শতাংশই খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী এবং অধিকাংশই ক্যাথলিক। তবে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করলেও আচিক্ মান্দিরা নিজেদের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতিকে পুরোপুরি ত্যাগ করেনি। তাই বাংলাদেশের এই বিশেষ গোষ্ঠীর ধর্মীয় বিবর্তন প্রক্রিয়ায় খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করার প্রয়াস গ্রহণ করে এই অভিসন্দর্ভে সিনক্রিটিজমের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং এর পরিব্যাপ্তি, বাংলাদেশে আচিক্ মান্দি গোষ্ঠীর মধ্যে খ্রিষ্টধর্মের প্রসার ও এর বিভিন্ন প্রকরণ, তাদের বিভিন্ন আবাসন ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পরিবর্তন এবং সিনক্রিটিজমের উপসর্গ সমূহ যেমন বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান পর্যালোচনা করা হয়েছে। আসলে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর থেকেই তাদের ঐতিহ্যবাহী নাচ, গান, খাদ্যাভাস, বিশ্বাস ও মূল্যবোধ, সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ধারণা বিবর্তন হওয়া শুরু হয়েছিল। তারপরও তারা নিজেস্ব কিছু সংস্কৃতির রীতিনীতি ও প্রথা কিছুটা হলেও ধরে রেখেছে যা তাদের একতা ও স্বকীয়তা রক্ষায় তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে আচিক্ মান্দি নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণের সাথে সাথে তাদের জীবনধারা ও দৃষ্টিভঙ্গিও পরিবর্তন হচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নং-
ঘোষণা পত্র	iii
প্রত্যয়ন পত্র	iv
উৎসর্গ	v
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	vi-vii
মুখবন্ধ	viii
সূচিপত্র	ix-xiii
সারণি -এর তালিকা	xiv-xvi
চিত্রলেখ -এর তালিকা	xvii-xviii
আলোক চিত্র -এর তালিকা	xix
শব্দ সংক্ষেপ ও সংক্ষিপ্ত শব্দ	xx
সারসংক্ষেপ	xxi-xxiii

প্রথম অধ্যায়ঃ ভূমিকা **১-৩৩**

১.১।	ভূমিকা	২
১.১.১।	বাংলাদেশী গারোদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়	৪
১.১.২।	পাহাড়ী অঞ্চলের এবং সমতলভূমির গারো	৬
১.১.৩।	গারো ইতিহাস এবং এর গুরুত্ব	৮
১.১.৪।	গারোদের অস্তিত্বের সংকটঃ গারোদের দেশ	১৩
১.১.৫।	বাংলাদেশী গারোদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য	১৫
১.১.৬।	গারো নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী এবং খিষ্টধর্ম	১৬
১.১.৭।	ধর্ম এক বিভাজন অনেক	১৭
১.১.৮।	গারোদের খ্রিষ্ট ধর্মীয় জীবনধারা	১৮
১.১.৯।	গারো এবং মান্দি	২০
১.২।	গবেষণার পটভূমি	২২
১.৩।	গবেষণার লক্ষ্য	২৩
১.৪।	গবেষণার পদ্ধতি	২৬
১.৫।	গবেষণাকর্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	৩১

Dhaka University Institutional Repository

পৃষ্ঠা নং-

দ্বিতীয় অধ্যায়: একটি তাত্ত্বিক সমীক্ষা **৩৪-৪৯**

২.১। সিনক্রেটিজমের বুৎপত্তিগত ও ভাষাগত তাৎপর্য ৩৫

২.২। সিনক্রেটিজম ও সাংস্কৃতিক মিশ্রণ ৩৮

২.৩। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ও ধর্মে সিনক্রেটিজমের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র ৪৬

তৃতীয় অধ্যায়: বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীসমূহের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য **৫০-৭৩**

৩.১। বাংলাদেশের নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ৫১

৩.১.১। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের আদিবাসী গোষ্ঠীসমূহের ধর্ম ও সংস্কৃতি ৫২

৩.১.১.১। চাকমা ৫৩

চাকমাদের পারিবারিক ও সামাজিক কাঠামো ৫৪

ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মীয় উৎসব ৫৪

ভাতদ্যা পূজা ৫৫

হাল-পালনি ও মা-লক্ষী পূজা ৫৫

থান-মানা ৫৫

ধর্মকাম ৫৫

বিজু উৎসব ৫৬

কঠিন চীবর দান ৫৬

৩.১.১.২। মারমা ৫৭

ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মীয় উৎসব ৫৭

৩.১.১.৩। ত্রিপুরা ৫৭

ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মীয় উৎসব ৫৭

৩.১.১.৪। লুসেই ও পাঃখুয়া ৫৮

ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মীয় উৎসব ৫৯

৩.১.১.৫। বম ৫৯

ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মীয় উৎসব ৫৯

৩.১.১.৬। খ্রো ৬০

ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মীয় উৎসব ৬০

৩.১.২। উত্তরবঙ্গ ও ময়মনসিংহ-সিলেট অঞ্চলের আদিবাসী গোষ্ঠীসমূহের ধর্ম ও সংস্কৃতি ৬০

Dhaka University Institutional Repository

পৃষ্ঠা নং-

৩.১.২.১। সাঁওতাল ৬০

ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মীয় উৎসব ৬১

৩.১.২.২। রাখাইন ৬১

ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মীয় উৎসব ৬১

৩.১.২.৩। মণিপুরী ৬২

ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মীয় উৎসব ৬২

৩.১.২.৪। খাসি ৬৩

ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মীয় উৎসব ৬৩

৩.২। নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীসমূহের ধর্মবিশ্বাস- তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ৬৩

৩.৩। আদিবাসী ধর্ম ও সমাজ- পারস্পরিক সম্পর্ক ৭১

চতুর্থ অধ্যায়ঃ আচিক্ মান্দি নৃগোষ্ঠীর পরিচয় ও ধর্মবিশ্বাস ৭৪-৯০

৪.১। আচিক্ মান্দি নৃগোষ্ঠীর পরিচয় ৭৫

৪.২। গারোদের অতীত ইতিহাস এবং ভারতবর্ষে আগমন ৮২

৪.৩। আচিক্ মান্দি নৃগোষ্ঠী বা গারোদের ঐতিহ্যবাহী ধর্ম ৮৪

তাতারা রাবুগা ৮৫

সালজং ৮৫

সুসাইম ৮৫

গোয়েরা ৮৫

কালকেম ৮৫

৪.৪। সমাজ ব্যবস্থা ও আচিক্ মান্দি সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক ৮৫

৪.৫। আচিক্ মান্দি: ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠানের তাৎপর্য ৮৯

দেন বিলসিয়া ৮৯

'আগাল মাক্কা' বা 'আচিরক্কা' ৮৯

রংচু গাল্লা (নতুন চিড়ার উৎসব) ৯০

জামে গাপ্পা আহওয়া ৯০

ওয়ানগালা ৯০

পঞ্চম অধ্যায়ঃ আচিক্ মান্দি ও খ্রিষ্টধর্ম বিশ্বাস ৯১-১০৭

৫.১। ইংরেজ শাসনামলে মিশনারি কর্মকাণ্ড ৯২

৫.২। ইংরেজ শাসন পরবর্তীকালে খ্রিষ্টধর্মের স্বরূপ ১০০

৫.৩। শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন ও তার প্রসার ১০৫

পৃষ্ঠা নং-

ষষ্ঠ অধ্যায়: আচিক্ মান্দিদের ধর্মীয় বিকাশ ও সমাজের বিবর্তন: সিনক্রেটিজম ১০৮-১২২

৬.১। গারো সমাজ বিবর্তনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ১০৯

৬.২। আচিক্ মান্দি গোষ্ঠীর বর্তমান ধর্মবিশ্বাস- সিনক্রেটিস্টিক উপাদান চিহ্নিতকরণ ১১৩

৬.৩। আচিক্ মান্দিদের আচার অনুষ্ঠান বিবর্তনের স্বরূপ ১১৬

৬.৪। আচিক্ মান্দি পরিবার ও সমাজের বিবর্তন ১১৭

চি-রিপ্পা ১১৮

ওয়াল-শওয়া ১১৯

আখ্রম ১১৯

শপথ করানো ১১৯

৬.৫। আচিক্ মান্দিদের সমাজ ব্যবস্থায় উত্তরাধিকার প্রথার বিবর্তন ১২১

সপ্তম অধ্যায়: আচিক্ মান্দি গোষ্ঠীর বৃহত্তর আবসস্থলের বর্ণনা ও তাদের সিনক্রেটিস্টিক প্রবনতা ১২৩-১৩৩

৭.১। বাংলাদেশে আচিক্ মান্দিদের বিভিন্ন বাসস্থানের ইতিহাস ১২৪

৭.২। ঢাকার নর্দা-কালাচাঁদপুর এলাকার মান্দি গোষ্ঠীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ১২৫

৭.৩। ময়মনসিংহের টংনাপাড়া গ্রামের আচিক্ মান্দি গোষ্ঠীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ১২৭

৭.৪। ব্যাপ্টিস্ট ও রোমান ক্যাথলিক মূল ধর্মের থেকে আধুনিক কালের মান্দিদের ধর্মের দ্বিবিধ ভিন্নতা ১২৮

৭.৪.১। গারোদের খ্রিষ্ট ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের উপর তাদের সাংসারিক ধর্ম ও আদিবাসী কৃষ্টির প্রভাব ১২৮

৭.৪.২। গারোদের খ্রিষ্ট ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের উপর বাংলাদেশের নাগরিক সভ্যতা তথা রাজধানী ঢাকার সামাজিক জীবনের প্রভাব ১৩০

অষ্টম অধ্যায়: তথ্য উপাত্ত অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ ১৩৪-১৬৭

৮.১। সংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্য উপাত্তের বিশ্লেষণ ১৩৫

৮.১.১। জনতাত্ত্বিক পরিলেখ ১৩৫

৮.১.২। আচিক্ মান্দি গোষ্ঠীর বর্তমান ধর্মবিশ্বাস: সিনক্রেটিস্টিক উপাদান চিহ্নিত করণ ১৩৭

৮.১.৩। আচিক্ মান্দিদের আচার অনুষ্ঠানে বিবর্তনের স্বরূপ ১৪৭

৮.১.৪। আচিক্ মান্দি পরিবার ও সমাজের বিবর্তন ১৫৪

৮.১.৫। আচিক্ মান্দিদের সমাজ ব্যবস্থায় উত্তরাধিকার প্রথার বিবর্তন ১৫৮

৮.২। জনতাত্ত্বিক পরিলেখগুলোর সাথে আচিক্ মান্দিদের মধ্যে ধর্মীয় বিশ্বাস, আচার অনুষ্ঠান, বিবর্তন এবং উত্তরাধিকার প্রথার গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক নির্ণয় ১৬৩

৮.২.১। আচিক্ মান্দি গোষ্ঠীর বর্তমান ধর্মবিশ্বাস ১৬৪

ধর্মীয় বিশ্বাসে ভিন্নতা ১৬৪

		পৃষ্ঠা নং-
৮.২.২।	আচিক্ মান্দিদের আচার অনুষ্ঠানে বিবর্তনের স্বরূপ	১৬৪
	দেব-দেবীর উপাসনা	১৬৪
	পাদ্রিগণ কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা	১৬৫
	গির্জায় উপদেশবাণীতে দেব-দেবীর উপাসনাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা	১৬৫
	আচার-অনুষ্ঠান পালন/ অংশগ্রহণ	১৬৫
	সামাজিক প্রথাসমূহে খ্রিষ্ট ধর্মীয় যাজকদের অংশগ্রহণ	১৬৫
	প্রার্থনার জন্য সাপ্তাহিক সময় ব্যয়	১৬৫
৮.২.৩।	আচিক্ মান্দি পরিবার ও সমাজের বিবর্তন	১৬৬
	ধর্মের প্রয়োজনীয়তা	১৬৬
	খ্রিষ্টধর্মের স্বীকৃতি	১৬৬
	ধর্মীয় দ্বন্দ্ব	১৬৬
৮.২.৪।	আচিক্ মান্দিদের সমাজ ব্যবস্থায় উত্তরাধিকার প্রথার বিবর্তন	১৬৬
	মাতা-পিতা এবং প্রপিতামহগণের ধর্মীয় বিশ্বাস	১৬৬
	পরিবারবর্গের সঙ্গে ধর্মান্তর	১৬৭
	ধর্মান্তরিতের সময়ব্যাপ্তি	১৬৭
নবম অধ্যায়: উপসংহার		**১৬৮-১৭৮**
৯.১।	উপসংহার	১৬৯
	বিশ্বাস	১৬৯
	আচার-অনুষ্ঠান ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ড	১৭১
	নৈতিকতা	১৭২
	আধ্যাত্মিকতা	১৭২
পরিশিষ্ট:		**১৭৯-২২৩**
	নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি	১৮০
	প্রশ্নমালা	১৯১
	সারণি	১৯৫
	আলোকচিত্র	২১৯

সারণির তালিকা

পৃষ্ঠা নং-

সারণি- ০১ : উত্তরদাতাদের সামাজিক সামাজিক লিঙ্গ ভিত্তিক গণসংখ্যা সন্নিবেশ **১৯৫**

সারণি- ০২ : উত্তরদাতাদের বয়স ভিত্তিক গণসংখ্যা সন্নিবেশ **১৯৫**

সারণি- ০৩ : উত্তরদাতাদের এলাকা ভিত্তিক গণসংখ্যা সন্নিবেশ **১৯৫**

সারণি- ০৪ : উত্তরদাতাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ভিত্তিক গণসংখ্যা সন্নিবেশ **১৯৫**

সারণি- ০৫ : ধর্মীয় বিশ্বাসের গণসংখ্যা সন্নিবেশ **১৯৬**

সারণি- ০৬ : বিশ্বাসের বিভিন্নতার গণসংখ্যা সন্নিবেশ **১৯৬**

সারণি- ০৭ : ধারণা ও নীতি-বিশ্বাসসমূহের বিপরীতে বিশ্বাসসমূহের সামাজিক সামাজিক লিঙ্গ ভিত্তিক পর্যালোচনা **১৯৬**

সারণি- ০৮ : ধারণা ও নীতি-বিশ্বাসসমূহের বিপরীতে বিশ্বাসসমূহের বয়স ভিত্তিক পর্যালোচনা **১৯৭**

সারণি- ০৯ : ধারণা ও নীতি-বিশ্বাসসমূহের বিপরীতে বিশ্বাসসমূহের এলাকা ভিত্তিক পর্যালোচনা **১৯৮**

সারণি- ১০ : আচিক্ মান্দি ধর্মে দেব-দেবীর উপাসনার সামাজিক সামাজিক লিঙ্গ ভিত্তিক পর্যালোচনা **১৯৮**

সারণি- ১১ : আচিক্ মান্দি ধর্মে দেব-দেবীর উপাসনার বয়স ভিত্তিক পর্যালোচনা **১৯৯**

সারণি- ১২ : আচিক্ মান্দি ধর্মে দেব-দেবীর উপাসনার এলাকা ভিত্তিক পর্যালোচনা **১৯৯**

সারণি- ১৩ : আচিক্ মান্দি ধর্ম পালনে পাদ্রিগণ কর্তৃক নিষেধাজ্ঞার সামাজিক লিঙ্গ ভিত্তিক পর্যালোচনা **১৯৯**

সারণি- ১৪ : আচিক্ মান্দি ধর্ম পালনে পাদ্রিগণ কর্তৃক নিষেধাজ্ঞার বয়স ভিত্তিক পর্যালোচনা **২০০**

সারণি- ১৫ : আচিক্ মান্দি ধর্ম পালনে পাদ্রিগণ কর্তৃক নিষেধাজ্ঞার এলাকা ভিত্তিক পর্যালোচনা **২০০**

সারণি- ১৬ : গির্জার ধর্মীয় উপদেশবাণীর মধ্যে আচিক্ মান্দি ধর্মের দেব-দেবীর উপাসনাকে নিষিদ্ধ ঘোষণার সামাজিক লিঙ্গ ভিত্তিক পর্যালোচনা **২০১**

সারণি- ১৭ : গির্জার ধর্মীয় উপদেশবাণীর মধ্যে আচিক্ মান্দি ধর্মের দেব-দেবীর উপাসনাকে নিষিদ্ধ ঘোষণার বয়স ভিত্তিক পর্যালোচনা **২০১**

সারণি- ১৮ : গির্জার ধর্মীয় উপদেশবাণীর মধ্যে আচিক্ মান্দি ধর্মের দেব-দেবীর উপাসনাকে নিষিদ্ধ ঘোষণার এলাকা ভিত্তিক পর্যালোচনা **২০১**

সারণি- ১৯ : খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী হয়েও আচিক্ মান্দি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সামাজিক লিঙ্গ ভিত্তিক পর্যালোচনা **২০২**

সারণি- ২০ : খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী হয়েও আচিক্ মান্দি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের বয়স ভিত্তিক পর্যালোচনা **২০২**

সারণি- ২১ : খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী হয়েও আচিক্ মান্দি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের এলাকা ভিত্তিক পর্যালোচনা **২০৩**

সারণি- ২২ : আচিক্ মান্দি সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহে গির্জার পাদ্রিদের উপস্থিতির সামাজিক লিঙ্গ ভিত্তিক পর্যালোচনা **২০৩**

সারণি- ২৩ : আচিক্ মান্দি সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহে গির্জার পাদ্রিদের উপস্থিতির বয়স ভিত্তিক পর্যালোচনা **২০৩**

সারণি- ২৪ : আচিক্ মান্দি সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহে গির্জার পাদ্রিদের উপস্থিতির এলাকা ভিত্তিক পর্যালোচনা **২০৪**

সারণি- ২৫ : খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী হয়ে খ্রিষ্টধর্মের গির্জায় ধর্মীয় উপাসনায় সাপ্তাহিক সময় ব্যয়ের সামাজিক লিঙ্গ ভিত্তিক পর্যালোচনা **২০৪**

পৃষ্ঠা নং-

সারণি- ২৬ : খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী হয়ে খ্রিষ্টধর্মের গির্জায় ধর্মীয় উপাসনায় সাপ্তাহিক সময় ব্যয়ের রযস ভিত্তিক পর্যালোচনা ২০৫
সারণি- ২৭ : খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী হয়ে খ্রিষ্টধর্মের গির্জায় ধর্মীয় উপাসনায় সাপ্তাহিক সময় ব্যয়ের এলাকা ভিত্তিক পর্যালোচনা ২০৫
সারণি- ২৮ : সমাজে ধর্মের প্রয়োজনীয়তার সামাজিক লিঙ্গ ভিত্তিক পর্যালোচনা ২০৫
সারণি- ২৯ : সমাজে ধর্মের প্রয়োজনীয়তার বয়স ভিত্তিক পর্যালোচনা ২০৬
সারণি- ৩০ : সমাজে ধর্মের প্রয়োজনীয়তার এলাকা ভিত্তিক পর্যালোচনা ২০৬
সারণি- ৩১ : সামাজিক কর্মকাণ্ডে আচিক্ মান্দি ধর্মের নৈতিকতার প্রভাবের বন্টন ২০৭
সারণি- ৩২ : সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে খ্রিষ্টধর্মের স্বীকৃতির সামাজিক লিঙ্গ ভিত্তিক পর্যালোচনা ২০৭
সারণি- ৩৩ : সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে খ্রিষ্টধর্মের স্বীকৃতির বয়স ভিত্তিক পর্যালোচনা ২০৭
সারণি- ৩৪ : সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে খ্রিষ্টধর্মের স্বীকৃতির এলাকা ভিত্তিক পর্যালোচনা ২০৮
সারণি- ৩৫ : খ্রিষ্টধর্ম ও আচিক্ মান্দি ধর্মের মধ্যকার দ্বন্দ্বমূলক বিষয়ের গণসংখ্যা সন্নিবেশ ২০৮
সারণি- ৩৬ : খ্রিষ্টধর্ম ও আচিক্ মান্দি ধর্মের মধ্যকার দ্বন্দ্বমূলক বিষয়ের সামাজিক লিঙ্গ ভিত্তিক পর্যালোচনা ২০৯
সারণি- ৩৭ : খ্রিষ্টধর্ম ও আচিক্ মান্দি ধর্মের মধ্যকার দ্বন্দ্বমূলক বিষয়ের বয়স ভিত্তিক পর্যালোচনা ২০৯
সারণি- ৩৮ : খ্রিষ্টধর্ম ও আচিক্ মান্দি ধর্মের মধ্যকার দ্বন্দ্বমূলক বিষয়ের এলাকা ভিত্তিক পর্যালোচনা ২১০
সারণি- ৩৯ : উত্তরাধিকার স্থিতির গণসংখ্যা সন্নিবেশ ২১০
সারণি- ৪০ : খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী মাতা-পিতা এবং প্রপিতামহগণের সামাজিক লিঙ্গ ভিত্তিক পর্যালোচনা ২১১
সারণি- ৪১ : খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী মাতা-পিতা এবং প্রপিতামহগণের বয়স ভিত্তিক পর্যালোচনা ২১১
সারণি- ৪২ : খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী মাতা-পিতা এবং প্রপিতামহগণের এলাকা ভিত্তিক পর্যালোচনা ২১১
সারণি- ৪৩ : পরিবারবর্গের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে ধর্মান্তরিত হওয়ার সামাজিক লিঙ্গ ভিত্তিক পর্যালোচনা ২১২
সারণি- ৪৪ : পরিবারবর্গের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে ধর্মান্তরিত হওয়ার বয়স ভিত্তিক পর্যালোচনা ২১২
সারণি- ৪৫ : পরিবারবর্গের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে ধর্মান্তরিত হওয়ার এলাকা ভিত্তিক পর্যালোচনা ২১৩
সারণি- ৪৬ : ধর্মান্তরিত হবার সময়কাল গণসংখ্যা সন্নিবেশ ২১৩
সারণি- ৪৭ : ধর্মান্তরিত (যখন মাতা-পিতা এবং প্রপিতামহগণ খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী নয়) হবার সময়কালের সামাজিক লিঙ্গ ভিত্তিক পর্যালোচনা ২১৩
সারণি- ৪৮ : ধর্মান্তরিত (যখন মাতা-পিতা এবং প্রপিতামহগণ খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী নয়) হবার সময়কালের বয়স ভিত্তিক পর্যালোচনা ২১৪
সারণি- ৪৯ : ধর্মান্তরিত (যখন মাতা-পিতা এবং প্রপিতামহগণ খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী নয়) হবার সময়কালের এলাকা ভিত্তিক পর্যালোচনা ২১৪
সারণি- ৫০ : বিগত দশ বছরে ধর্মবিশ্বাসে পরিবর্তনের গণসংখ্যা সন্নিবেশ ২১৪
সারণি- ৫১ : পরিবারের অন্যান্য সদস্যবর্গ খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী ২১৫
সারণি- ৫২ : পরিবারবর্গের মধ্যে ধর্ম নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা (যখন পরিবারের অন্যান্য সদস্যবর্গ খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী নয়) ২১৫
সারণি- ৫৩ : খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী হয়ে খ্রিষ্টধর্মের গির্জায় ধর্মীয় উপাসনায় সাপ্তাহিক সময় ব্যয়ের গণসংখ্যা সন্নিবেশ ২১৫

পৃষ্ঠা নং-

সারণি- ৫৪ : আচার অনুষ্ঠান ও ধর্মীয় রীতি-নীতিতে আচিক্ মান্দিদের দেব-দেবীর উপাসনার গণসংখ্যা সন্নিবেশ ২১৫

সারণি- ৫৫: খ্রিষ্টধর্ম ও আচিক্ মান্দি ধর্মে দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের গণসংখ্যা সন্নিবেশ ২১৬

সারণি- ৫৬: আচিক্ মান্দি সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহে গির্জার পাদ্রীর পরিচয়ের গণসংখ্যা সন্নিবেশ ২১৬

সারণি- ৫৭: পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের খ্রিষ্টধর্মের অবস্থার গণসংখ্যা সন্নিবেশ ২১৬

সারণি- ৫৮: সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে খ্রিষ্টধর্ম অনুসরণ করার গণসংখ্যা সন্নিবেশ ২১৬

সারণি- ৫৯: সমাজে ধর্মের প্রয়োজনীয়তার গণসংখ্যা সন্নিবেশ ২১৭

সারণি- ৬০ : ধর্মীয় প্রকারভেদে আচিক্ মান্দি ধর্ম পালনে পাদ্রীদের নিষেধাজ্ঞার গণসংখ্যা সন্নিবেশ ২১৭

সারণি- ৬১ : ধর্মীয় প্রকারভেদে গির্জার ধর্মীয় উপদেশবাণীতে আচিক্ মান্দিদের দেব-দেবীর উপাসনাকে নিষিদ্ধতার গণসংখ্যা সন্নিবেশ ২১৭

সারণি- ৬২ : ধর্মীয় প্রকারভেদে খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী হয়েও আচিক্ মান্দি অনুষ্ঠানে যোগদানের গণসংখ্যা সন্নিবেশ ২১৭

সারণি- ৬৩ : আচিক্ মান্দি সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহে গির্জার পাদ্রিদের উপস্থিতির গণসংখ্যা সন্নিবেশ ২১৮

সারণি- ৬৪ : ধর্মীয় প্রকারভেদে পরিবারের অন্য সদস্যদের খ্রিষ্টধর্মের অবস্থার গণসংখ্যা সন্নিবেশ ২১৮

সারণি- ৬৫ : ধর্মীয় প্রকারভেদে পরিবারবর্গের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে ধর্মান্তরিত হবার গণসংখ্যা সন্নিবেশ ২১৮

সারণি- ৬৬ : খ্রিষ্টধর্ম ও আচিক্ মান্দির মধ্যে পারিবারিক এবং উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বের গণসংখ্যা সন্নিবেশ ২১৮

সারণি- ৬৭ : ধর্মীয় প্রকারভেদে খ্রিষ্টধর্ম ও আচিক্ মান্দি ধর্মের মধ্যকার দ্বন্দ্বমূলক বিষয়ের গণসংখ্যা সন্নিবেশ ২১৮

চিত্রলেখ -এর তালিকা

পৃষ্ঠা নং-

চিত্রলেখ	৮.১	:	সামাজিক লিঙ্গভেদে অংশগ্রহণকারীর শতকরা হার	১৩৫
চিত্রলেখ	৮.২	:	বয়সভেদে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	১৩৬
চিত্রলেখ	৮.৩	:	এলাকা ভিত্তিক অংশগ্রহণকারীর শতকরা হার	১৩৬
চিত্রলেখ	৮.৪	:	ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী আচিক্ মান্দিদের প্রকারভেদ	১৩৭
চিত্রলেখ	৮.৫	:	খ্রিষ্টধর্ম ও আচিক্ মান্দি ধর্মে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক	১৩৮
চিত্রলেখ	৮.৬	:	খ্রিষ্টধর্ম ও আচিক্ মান্দি ধর্মে বিদ্যমান দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের বিষয়বস্তু	১৩৮
চিত্রলেখ	৮.৭	:	ধর্মীয় উপাসনায় আচিক্ মান্দিদের ধর্মবিশ্বাস	১৩৯
চিত্রলেখ	৮.৮	:	ধর্মীয় প্রকারভেদে ধর্মীয় উপাসনায় আচিক্ মান্দিদের বিশ্বাস	১৪০
চিত্রলেখ	৮.৯	:	ধর্মীয় ধারণা ও নীতিতে আচিক্ মান্দিদের বিশ্বাস	১৪১
চিত্রলেখ	৮.১০	:	ধর্মীয় প্রকারভেদে ধর্মীয় ধারণা ও নীতিতে আচিক্ মান্দিদের বিশ্বাসের ধরণ	১৪২
চিত্রলেখ	৮.১১	:	সামাজিক লিঙ্গভেদে ধর্মীয় ধারণা ও নীতিতে আচিক্ মান্দিদের বিশ্বাসের ধরণ	১৪৩
চিত্রলেখ	৮.১২	:	বয়সভেদে ধর্মীয় ধারণা ও নীতিতে আচিক্ মান্দিদের বিশ্বাসের ধরণ	১৪৪
চিত্রলেখ	৮.১৩	:	এলাকা ভিত্তিক ধর্মীয় ধারণা ও নীতিতে আচিক্ মান্দিদের বিশ্বাসের ধরণ	১৪৫
চিত্রলেখ	৮.১৪	:	গত দশ বছরের মধ্যে ধর্মবিশ্বাসে পরিবর্তন	১৪৬
চিত্রলেখ	৮.১৫	:	খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী হয়ে গির্জায় উপাসনাকাল	১৪৭
চিত্রলেখ	৮.১৬	:	ধর্মীয় প্রকারভেদে খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী হয়ে গির্জায় উপাসনাকাল	১৪৭
চিত্রলেখ	৮.১৭	:	এলাকা ভিত্তিক খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী হয়ে গির্জায় উপাসনাকাল	১৪৮
চিত্রলেখ	৮.১৮	:	আচার অনুষ্ঠান ও ধর্মীয় রীতি-নীতিতে আচিক্ মান্দি	১৪৯
চিত্রলেখ	৮.১৯	:	ধর্মীয় প্রকারভেদে দেব-দেবীর উপাসনায় আচিক্ মান্দি	১৫০
চিত্রলেখ	৮.২০	:	ধর্মীয় প্রকারভেদে আচিক্ মান্দি ধর্ম পালনে পাদ্রীদের নিষেধাজ্ঞা	১৫০
চিত্রলেখ	৮.২১	:	ধর্মীয় প্রকারভেদে গির্জার ধর্মীয় উপদেশবাণীতে আচিক্ মান্দিদের দেব-দেবীর উপাসনাকে নিষিদ্ধতা	১৫১
চিত্রলেখ	৮.২২	:	ধর্মীয় প্রকারভেদে খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী হয়েও আচিক্ মান্দি অনুষ্ঠানে যোগদান	১৫২
চিত্রলেখ	৮.২৩	:	ধর্মীয় প্রকারভেদে আচিক্ মান্দি সামাজিক অনুষ্ঠানে গির্জার পাদ্রীদের উপস্থিতি	১৫২
চিত্রলেখ	৮.২৪	:	আচিক্ মান্দি সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহে গির্জার পাদ্রীর পরিচয়	১৫৩
চিত্রলেখ	৮.২৫	:	পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের খ্রিষ্টধর্মের অবস্থা	১৫৪

পৃষ্ঠা নং-

চিত্রলেখ	৮.২৬	:	ধর্মীয় প্রকারভেদে পরিবারের অন্য সদস্যদের খ্রিষ্টধর্মের অবস্থা	১৫৪
চিত্রলেখ	৮.২৭	:	পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ধর্মীয় বাগবিতন্ডা	১৫৫
চিত্রলেখ	৮.২৮	:	সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে খ্রিষ্টধর্ম	১৫৬
চিত্রলেখ	৮.২৯	:	সমাজে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা	১৫৬
চিত্রলেখ	৮.৩০	:	সামাজিক কর্মকাণ্ডে আচিক্ মান্দি নৈতিকতার উপর আস্থা	১৫৭
চিত্রলেখ	৮.৩১	:	নৈতিক মানদণ্ডে খ্রিষ্টধর্মের প্রভাব	১৫৮
চিত্রলেখ	৮.৩২	:	মাতা-পিতা ও প্রপিতামহগণের খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীতার অবস্থা	১৫৮
চিত্রলেখ	৮.৩৩	:	ধর্মীয় প্রকারভেদে মাতা-পিতা এবং প্রপিতামহের খ্রিষ্টধর্মের অবস্থা	১৫৯
চিত্রলেখ	৮.৩৪	:	ধর্মান্তরিত হবার সময়	১৬০
চিত্রলেখ	৮.৩৫	:	পরিবারবর্গের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে ধর্মান্তরিত	১৬০
চিত্রলেখ	৮.৩৬	:	ধর্মীয় প্রকারভেদে পরিবারবর্গের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে ধর্মান্তরিত	১৬১
চিত্রলেখ	৮.৩৭	:	খ্রিষ্টধর্ম ও আচিক্ মান্দির মধ্যে দ্বন্দ্ব	১৬১
চিত্রলেখ	৮.৩৮	:	ধর্মীয় প্রকারভেদে খ্রিষ্টধর্ম ও আচিক্ মান্দিদের মাঝে দ্বান্দ্বিকতা	১৬২

আলোকচিত্র -এর তালিকা

পৃষ্ঠা নং-

চিত্র	১	:	রাণীখং গির্জাঘর	২১৯
চিত্র	২	:	বিরিশিরি গির্জাঘর	২১৯
চিত্র	৩	:	ভালুকাপাড়া গির্জাঘর	২২০
চিত্র	৪	:	মরিয়মনগর গির্জাঘর	২২০
চিত্র	৫	:	ময়মনসিংহ গির্জাঘর	২২১
চিত্র	৬	:	জলছত্র গির্জাঘর	২২১
চিত্র	৭	:	বিড়ইডাকুনী গির্জাঘর	২২২
চিত্র	৮	:	ওয়ানগালা উৎসবে পাদ্রিদের অংশগ্রহণ	২২২
চিত্র	৯	:	উৎসবে একে অপরের সাথে আনন্দ ভাগাভাগি	২২৩
চিত্র	১০	:	ওয়ানগালা উৎসবে বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধিত্ব	২২৩
চিত্র	১১	:	ওয়ানগালা উৎসবের নাচ	২২৩

শব্দ সংক্ষেপ ও সংক্ষিপ্ত শব্দ

BMS	Baptist Missionary Society ব্যাপ্টিস্ট মিশনারি সোসাইটি
CHT	Chittagong Hill Tracts চিটাগাং হিল ট্রাক্টস (পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল)
CMS	Church Missionary Society চার্চ মিশনারি সোসাইটি
CSC	Congregatio a Sancta Cruce (The Congregation of Holy Cross) সি.এস.সি– কনগ্রেগ্যাচিও আ সানতা ক্রুচে (দ্য কনগ্রেগেশন অব হলি ক্রস)
EPC	Evangelical Presbyterian Church ইভানজেলিকাল প্রিসবিটারিয়ান চার্চ
ILO	International Labor Organization ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন (আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা)
LMS	London Missionary Society লন্ডন মিশনারি সোসাইটি
NGO	Non-Government Organization নন-গবর্ণমেন্ট অর্গানাইজেশন (বেসরকারী প্রতিষ্ঠান)
Rev.	Reverend রেভারেন্ড
RNDM	Religieuses de Notre Dame Missions রিলিজিয়াস ডি নটরডেম মিশনস
SMRA	Associates of Mary Queen of Apostles এসোসিয়েটস অব মেরি কুইন অব এপোসলস
WMMS	Wesleyan Methodist Missionary Society ওয়েসলিয়ান মেথোডিস্ট মিশনারি সোসাইটি
ঢাবি	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশের আচিক্ মান্দি নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর ধর্ম বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠানে সিনক্রেটিজম

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের আচিক্ মান্দি জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রায় দেড়শত বছর পূর্বে খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তর শুরু হয়। বর্তমানে তাদের অধিকাংশই খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী তবে একই সাথে তারা তাদের ঐতিহ্যবাহী ধর্মবিশ্বাসের কিছুটা অনুসরণ করছে এবং কোন কোন আচার অনুষ্ঠানও পালন করছে। তবে সময়ের বিবর্তনে এবং খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করায় তাদের আদি ধর্মের যেসব আচার অনুষ্ঠান তারা এখনও পালন করছে তা কিছুটা ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করেছে। বর্তমান গবেষণায় আচিক্ মান্দিদের এই সিনক্রেটিক প্রবণতাটি কীভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে তাই অনুসন্ধান করা হয়েছে। এই গবেষণাটির মূল লক্ষ্যই হচ্ছে এই সিনক্রেটিজমের সঠিক মাত্রা নির্ণয় করা। কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে এই সিনক্রেটিজম সর্বাধিক তা বিবেচনা করার জন্যই আচিক্ মান্দি জনগোষ্ঠীর কয়েকটি অংশকে বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

এই গবেষণাকর্মে যে সকল বিষয়াদি অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষিত হয়েছে তা নয়টি পরিচ্ছেদে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে গবেষণার অত্যাবশ্যকীয় বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়টি সিনক্রেটিজম সম্পর্কে অধ্যয়নের তাত্ত্বিক দিকের দিকনির্শেনা দেয় এবং তৃতীয় অধ্যায়ে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীসমূহের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করা হয়েছে। এরপরে চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে যথাক্রমে আচিক্ মান্দি নৃগোষ্ঠীর পরিচয় ও তাদের গোষ্ঠীতে খ্রিষ্টধর্ম বিশ্বাস প্রচারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে আচিক্ মান্দিদের ধর্মীয় বিকাশ ও সমাজের বিবর্তনের সাথে ধর্মীয় ক্ষেত্রে সমন্বয়ের যে প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে তা পর্যালোচনা করা হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ে আচিক্ মান্দি গোষ্ঠীর বৃহত্তর আবাসস্থলের বর্ণনা ও তাদের সিনক্রেটিস্টিক প্রবনতার বাস্তব চিত্র সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হয়েছে। অষ্টম অধ্যায়ে আচিক্ মান্দিদের ধর্মীয় বিকাশ ও সমাজের বিবর্তন সম্পর্কিত সংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্য উপাত্ত যথাযথ বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়েছে এবং পরিশেষে নবম অধ্যায়ে উপসংহার প্রদান করার মাধ্যমে গবেষণা অভিসন্দর্ভটি পরিপূর্ণতা পেয়েছে। নিম্নে প্রতিটি পরিচ্ছেদের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করা হল:

প্রথম অধ্যায়ে ভূমিকায় সর্বপ্রথমে বাংলাদেশী আচিক্ মান্দি বা গারোদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা হয়েছে। বিশেষ করে পাহাড়ী অঞ্চলের এবং সমতলভূমির গারোদের বর্ণনা, তাদের ইতিহাস, অস্তিত্বের সংকট, গারোদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য, গারো নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর ধর্ম ও খ্রিষ্টধর্ম, ধর্মের বিভাজন, গারোদের খ্রিষ্ট ধর্মীয় জীবনধারা ইত্যাদি সমুচিতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া গবেষণাকর্মটি নির্বাচন করার ন্যায্যতাসহ গবেষণার লক্ষ্য নির্ধারণ ও গবেষণা পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত পদ্ধতির উপর যথার্থ আলোকপাত করা হয়েছে। এই গবেষণাকর্মে সিনক্রেটিক প্রবণতাটি কীভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে তা অনুসন্ধান করা জন্য গুণগত পদ্ধতি, ঐতিহাসিক ও সেকেন্ডারি সোর্স থেকে গৃহিত তথ্যাদি এবং প্রশ্নমালার ভিত্তিতে উপাত্তসমূহ সংগ্রহের পাশাপাশি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য কেস স্টাডি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে গবেষণার তাত্ত্বিক দিকটি উদঘাটন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সিনক্রেটিজমের বুৎপত্তিগত ও ভাষাগত তাৎপর্য, সাংস্কৃতিক মিশ্রণের সাথে সিনক্রেটিজমের পার্থক্য এবং বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ও ধর্মে সিনক্রেটিজমের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্রের একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীসমূহের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশের নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, তাদের ধর্মবিশ্বাসের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, আদিবাসী ধর্ম ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক বর্ণনার মাধ্যমে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীসমূহের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলো স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে গারোদের অতীত ইতিহাস এবং ভারতবর্ষে আগমন, তাদের ঐতিহ্যবাহী ধর্ম, সমাজ ব্যবস্থা ও সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকসহ ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠানের তাৎপর্য এ অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে। আচিক্ মান্দি নৃগোষ্ঠীর পরিচয় ও ধর্মবিশ্বসের আলোচনার মাধ্যমে আচিক্ মান্দি ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠানের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আচিক্ মান্দির ইতিহাস, ঐতিহ্য, সমাজ ব্যবস্থা তাদের গোষ্ঠীতে সামাজিক মূল্যবোধের একটি অনন্যতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে সেটিও এই বীক্ষণের মাধ্যমে পরিস্ফুট হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে আচিক্ মান্দি গোষ্ঠীর খ্রিষ্টধর্ম বিশ্বাস নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে। ইংরেজ শাসনামলে ও ইংরেজ শাসন পরবর্তীকালে মিশনারি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে খ্রিষ্টধর্ম বিশ্বাসের যে বিস্তৃতি লাভ করেছিল এখানে তার বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া খ্রিষ্টধর্ম বিশ্বাসের বিস্তৃতির ফলে শিক্ষা

ব্যবস্থার প্রবর্তন ও তার যে প্রভাব আচিক্ মান্দি গোষ্ঠীর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়েছে তা এখানে প্রকাশ পেয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে ধর্মীয় বিকাশ ও সমাজের বিবর্তনের আলোচনার মাধ্যমে তাদের ধর্মবিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠানে সিনক্রেটিজমের মাত্রা নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সমীক্ষার মাধ্যমে তাদের বর্তমান ধর্মবিশ্বাসে সিনক্রেটিস্টিক উপাদানসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়া আচার অনুষ্ঠান, পরিবার, সমাজ ও উত্তরাধিকার প্রথার বিবর্তনের স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ে বাংলাদেশ ও ভারতে আচিক্ মান্দি গোষ্ঠীর বিভিন্ন বাসস্থানের বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। একই সাথে যেসব এলাকা থেকে গবেষণার জন্য প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে সেসব এলাকা, বিশেষ করে ঢাকার নর্দা-কালাচাঁদপুর এলাকা ও ময়মনসিংহের টংনাপাড়া গ্রামের আচিক্ মান্দি গোষ্ঠীর একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনাও প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া মান্দি জনগোষ্ঠীর বর্তমান ধর্মবিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান পর্যালোচনা করে ব্যাপ্টিজম ও রোমান ক্যাথলিক মূল ধর্ম থেকে যে পার্থক্যগুলো লক্ষ্য করা যায় সেগুলোকে দুইভাগে ভাগ করে– (ক) আধুনিক মান্দি গোষ্ঠীর খ্রিষ্ট ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের উপর আদি ধর্ম ও কৃষ্টির প্রভাব (খ) তাদের ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে বাংলাদেশের নাগরিক সভ্যতা তথা রাজধানী ঢাকার সামাজিক জীবনের প্রভাব, আলোচনা করা হয়েছে।

অষ্টম অধ্যায়ে বর্তমান সময়ে আচিক্ মান্দি গোষ্ঠীর মধ্যে ধর্মবিশ্বাসের যৌগিক রূপটি চিহ্নিতকরণ এবং বিবর্তনের স্বরূপ নির্ধারণের প্রয়োজনে অনুসন্ধানকৃত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আচিক্ মান্দি গোষ্ঠীর ধর্মীয় বিশ্বাসে ভিন্নতা, দেব-দেবীর উপাসনা, পাদ্রিগণের নিষেধাজ্ঞা, দেব-দেবীর উপাসনাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা, আচার-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ, সামাজিক প্রথাসমূহে খ্রিষ্ট ধর্মীয় যাজকদের অংশগ্রহণ, প্রার্থনার জন্য সাপ্তাহিক সময় ব্যয়, ধর্মের প্রয়োজনীয়তা, খ্রিষ্টধর্মের স্বীকৃতি ও ধর্মীয় দ্বন্দ্ব, মাতা-পিতা এবং প্রপিতামহগণের ধর্মীয় বিশ্বাস, পরিবারবর্গের সঙ্গে ধর্মান্তর ও ধর্মান্তরিতের সময়ব্যাপ্তি ইত্যাদি বিষয়সমূহ সংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্য উপাত্তের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়েছে।

পরিশেষে, নবম অধ্যায়ে আচিক্ মান্দি নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর ধর্মবিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানে সিনক্রেটিজম সম্পর্কিত বিভিন্ন পরিচ্ছেদে আলোচিত বিষয়সমূহের সিনক্রেটিস্টিক চিত্রটি পরিচ্ছন্ন ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

১. ভূমিকা
২. গবেষণা পটভূমি
৩. গবেষণা লক্ষ্য
৪. গবেষণা পদ্ধতি
৫. গবেষণাকর্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

দ্বিতীয় অধ্যায়

একটি তাত্ত্বিক সমীক্ষা

১. সিনক্রেটিজমের বুৎপত্তিগত ও ভাষাগত তাৎপর্য
২. সিনক্রেটিজম ও সাংস্কৃতিক মিশ্রণ
৩. বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ও ধর্মে সিনক্রেটিজমের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীসমূহের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য

১. বাংলাদেশের নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
২. নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীসমূহের ধর্মবিশ্বাস: তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ
৩. আদিবাসী ধর্ম ও সমাজ: পারস্পরিক সম্পর্ক

চতুর্থ অধ্যায়

আচিক্ মান্দি নৃগোষ্ঠীর পরিচয় ও ধর্মবিশ্বাস

১. আচিক্ মান্দি নৃগোষ্ঠীর পরিচয়
২. গারোদের অতীত ইতিহাস এবং ভারতবর্ষে আগমন
৩. ঐতিহ্যবাহী ধর্ম
৪. সমাজ ব্যবস্থা ও আচিক্ মান্দি সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক
৫. আচিক্ মান্দি: ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠানের তাৎপর্য

পঞ্চম অধ্যায়

আচিক্ মান্দি ও খ্রিষ্টধর্ম বিশ্বাস

১. ইংরেজ শাসনামলে মিশনারি কর্মকাণ্ড
২. ইংরেজ শাসন পরবর্তীকালে
   খ্রিষ্টধর্মের স্বরূপ
৩. শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন ও তার প্রভাব

ষষ্ঠ অধ্যায়

আচিক্ মান্দিদের ধর্মীয় বিকাশ ও সমাজের বিবর্তন: সিনক্রেটিজম

১. গারো সমাজ বিবর্তনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
২. আচিক্ মান্দি গোষ্ঠীর বর্তমান ধর্মবিশ্বাস: সিনক্রেটিস্টিক উপাদান চিহ্নিতকরণ
৩. আচিক্ মান্দিদের আচার অনুষ্ঠান বিবর্তনের স্বরূপ
৪. আচিক্ মান্দি পরিবার ও সমাজের বিবর্তন
৫. আচিক্ মান্দিদের সমাজ ব্যবস্থায় উত্তরাধিকার প্রথার বিবর্তন

সপ্তম অধ্যায়

আচিক্ মান্দি গোষ্ঠীর বৃহত্তর আবসস্থলের বর্ণনা ও তাদের সিনক্রেটিস্টিক প্রবনতা

১. বাংলাদেশে আচিক্ মান্দিদের বিভিন্ন বাসস্থানের ইতিহাস
২. ঢাকার নর্দা-কালাচাঁদপুর এলাকার মান্দি গোষ্ঠীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়
৩. ময়মনসিংহের টংনাপাড়া গ্রামের আচিক্ মান্দি গোষ্ঠীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়
৪. ব্যাপ্টিস্ট ও রোমান ক্যাথলিক মূল ধর্মের থেকে আধুনিক কালের মান্দিদের ধর্মের দ্বিবিধ ভিন্নতা

অষ্টম অধ্যায়

তথ্য উপাত্ত অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ

১. আচিক্ মান্দি গোষ্ঠীর বর্তমান ধর্মবিশ্বাসের পর্যালোচনা
২. আচিক্ মান্দিদের আচার অনুষ্ঠান বিবর্তনের স্বরূপের পর্যালোচনা
৩. আচিক্ মান্দি পরিবার ও সমাজের বিবর্তনের পর্যালোচনা
৪. আচিক্ মান্দিদের সমাজ ব্যবস্থায় উত্তরাধিকার প্রথার বিবর্তনের পর্যালোচনা

নবম অধ্যায়

উপসংহার

পরিশিষ্ট

১. নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি
২. প্রশ্নমালা
৩. সারণি
৪. আলোকচিত্র

১.১। ভূমিকা :

বাংলাদেশের উপজাতীয় আদিবাসী গোষ্ঠীসমূহের ধর্ম ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র নিয়ে আলোচনাসমূহ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বর্ণনামূলক হয়ে থাকে। অথচ ধর্মই কিন্তু এদের সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। এই উপজাতীয় সংস্কৃতির আলোচনা করতে গিয়ে ধর্মের যে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধিত হয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষা প্রায় দুর্লভ। এই সমীক্ষার প্রয়োজনীয়তা আরো বেশি অনুভূত হয় এইজন্য যে নৃবিজ্ঞানী গবেষণায় প্রায়শই এই পার্থক্যগুলোকে চিহ্নিত করা হয় না। বিশেষ করে আদিবাসী কোন একটি গোত্রকে সম্যক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে তার ধর্ম ও আচার-অনুষ্ঠানে যে পরিবর্তনসমূহ সাধিত হয়েছে তা যুক্তিসম্মত গবেষণার মাধ্যমে চিহ্নিতকরণ হয়নি বলে বলা চলে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন তাত্ত্বিক ও দার্শনিক এই বৈচিত্র তথা পরিবর্তনের ধারাকে যেভাবে বর্ণনা করেছেন তারও একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ থাকা প্রয়োজন। বলা আবশ্যক বাংলাদেশের আদিবাসী সংস্কৃতি ও তার ধর্মীয় রূপান্তরণ সাংস্কৃতিক বৈচিত্রের একটা অনন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে গণ্য হতে পারে।

গারো সম্পাদায়ের বাংলাদেশের অস্তিত্ব একটি প্রান্তিক গোষ্ঠীর সঙ্গে তুলনীয়। বর্তমানে এই প্রান্তিক গোষ্ঠীরও একটি সামান্য অংশ বলে গণ্য হয়। বাংলাদেশের প্রায় একশত সত্তর মিলিয়ন অধিবাসীর সকলেই বাঙালী ও বাংলাভাষী। তবে বাংলাদেশে অল্পকিছু অধিবাসী আছে যারা নিজেদের বাঙালী বলে মনে করে না এবং বাংলা তাদের মাতৃভাষাও নয়। তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য রয়েছে। তবে তারাও বাংলাদেশের নাগরিক।

এই অবাঙালী অধিবাসীদের বর্ণনা বাংলাদেশের বর্তমান ইতিহাসে প্রায় উপেক্ষিত। বিভিন্ন কারণেই বাংলাদেশের বৃহত্তর বাঙালী জনগোষ্ঠীর এই প্রান্তিক গোষ্ঠীসমূহ সম্পর্কে জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। এমনকি এই প্রান্তিক গোষ্ঠীসমূহ সম্পর্কে যা তারা জানে তাও অনেক ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ ও বিকৃত। নিজ দেশের অধিবাসীদের সম্পর্কে এই সীমিত ও বিকৃত জ্ঞান ভবিষ্যতে সাংস্কৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কুফল সৃষ্টি করতে পারে।

গারোরাও বাংলাদেশের বৃহত্তর বাংলাভাষী জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি বসবাসকারী একটি জনগোষ্ঠী, যাদের স্বকীয় সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও ভাষা রয়েছে। তাদের সম্পর্কেও বাংলাদেশের অধিকাংশ অধিবাসীর জ্ঞান সীমিত। অধিকাংশ গারো বাংলাদেশের মধ্য উত্তরাঞ্চলে ময়মনসিংহ

জেলায় ও আশে পাশের এলাকার বসবাস করে। এ অঞ্চলে বাংলাভাষী ছাড়াও আরো কিছু ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী দেখা যায়, যেমন- হদি, ডালু, বোনাজ এবং হাজং। এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, বাংলাদেশের মধ্য উত্তরাঞ্চলের ক্ষুদ্র নুতাত্ত্বিক গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে হিন্দুধর্মের একটি প্রভাব রয়েছে। কেবল গারোরাই এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। ময়মনসিংহ অঞ্চলের উপজাতিদের মধ্যে কেবল গারোরাই খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে। অন্য ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী, যেমন- হাজং বা হাদিদের খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করার মিশনারি প্রচেষ্টা সফল হয়নি। বর্তমান গারো সমাজে খ্রিষ্টধর্মের গুরুত্ব খুব বেশি। বর্তমানে নব্বই শতাংশের বেশী গারো খ্রিষ্টধর্মের অনুসারী। বাংলাদেশে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীগুলো সম্পর্কে সাধারণ মানুষের অনেক ভ্রান্ত ধারণার মূল কারণ হলো যথাযথ তথ্যের অভাব।

গারোদের সম্পর্কে প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে, যেটি জন ইলিয়ট নামে একজন ইংরেজ লিখেছিলেন। সে সময় থেকে শুরু করে ইউরোপীয় লেখকগণ গারোদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছেন। প্রকৃতপক্ষে গারোদের সম্পর্কে মানুষের প্রাথমিক ধারণা তৈরী হয়েছিল ইউরোপীয় পর্যবেক্ষকদের মাধ্যমে কিন্তু একথা মনে রাখা দরকার ঐসব তথ্য ব্রিটেনের তৎকালীন বৈজ্ঞানিক উন্নয়নের ধারণা দ্বারা প্রভাবিত। অনেক ব্রিটিশ শাসক ও গবেষকই মনে করতেন বিভিন্ন জাতি উন্নয়নের ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে অবস্থান করছে। তাঁদের মতানুয়ায়ী ব্রিটিশরা নিঃসন্দেহে 'অত্যন্ত সভ্য' জাতি। অন্যদিকে দক্ষিণ এশিয়ার জনগোষ্ঠী সমূহকে 'আদিম জনগোষ্ঠী' হিসেবেই দেখা হতো। সুতরাং সে সময়ের ব্রিটিশ লেখকদের বই ও প্রবন্ধগুলো এই সাধারণ ধারপার পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার করতে হবে।

একইসাথে আরেকটি বিষয়ও গুরুত্বপূর্ণ যে, 'উপজাতি' (Tribe) শব্দটিও এই ব্রিটিশ লেখকরাই প্রথম ব্যবহার করেছেন। তবে তৎকালীন সময়ে উপজাতি শব্দটির ব্যবহারে কিছুটা ভিন্নতা লক্ষ্যণীয়। কোন কোন সময় উপজাতি শব্দটি দ্বারা হিন্দুধর্মের বিভিন্ন বর্ণগুলোও (Hindu Castes) বোঝানো হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে 'উপজাতি' শব্দের ব্যবহার সংকুচিত হয়ে আমরা বর্তমানে যাদের 'উপজাতি' বা উপজাতীয় গোষ্ঠী বলে অভিহিত করি তাদের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হতে শুরু করে। একই সাথে একথাও আমাদের মনে রাখা আবশ্যক এই শব্দটির ব্যবহারের সাথে বহু সমস্যাও জড়িত। অনেক সমাজ বিজ্ঞানীই মতপ্রকাশ করেছেন যে, উপজাতি শব্দটির যথার্থ সংজ্ঞা

দেওয়া যায়না। কিন্তু সাধারণ মানুষ 'উপজাতি' শব্দটি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে থাকে, যদিও শব্দটির সঠিক অর্থ সম্পর্কে প্রায় কেউই সচেতন নয়।

উপজাতি শব্দটির ব্যবহার সমস্যার সৃষ্টি করেছে একারণে যে, ক্ষেত্রবিশেষে এর ব্যবহারের সাথে কিছু 'নেতিবাচক গুণাগুণ' জড়িত বলে মনে হয়। অনেক মানুষেরই ধারণা উপজাতি হল তারা যারা দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী থেকে কমবেশি বিচ্ছিন্ন, মনে করা হয় তারা আদিম জনগোষ্ঠী, অপেক্ষাকৃত কম উন্নত, সরল, প্রকৃতির সাথে বসবাসে অভ্যস্ত বা বুনো (Jungle People) । এধারণা আমাদের দেশেও লক্ষ্য করা যায়। এমনকি বর্তমানেও অনেকে মনে করেন, গারো এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীগুলো বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর চেয়ে সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এমনকি মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকেও অপেক্ষাকৃত কম উন্নত। স্বভাবতই এধরনের ধারণা ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর সদস্যদের সাথে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মানুষের আচার ব্যবহারেও প্রভাব ফেলে।

সাম্প্রতিক কালে 'আদিবাসী জনগোষ্ঠী' (Indigenous People) শব্দটি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। অনেক গারো এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সদস্যরা উপজাতি শব্দটির চেয়ে 'আদিবাসী' শব্দটি বেশী পছন্দ করেছেন। জাতিসংঘ ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দকে 'আদিবাসী বর্ষ' বলে ঘোষণা করেছিল। এই শব্দটি নিঃসন্দেহে ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর সদস্যদের অধিক মর্যাদা দিচ্ছে এবং সারাবিশ্বের আদিবাসীদের মধ্যে একটি যোগাযোগ তৈরীর সুযোগ সৃষ্টি করেছে। তবে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আদিবাসী শব্দটির ব্যবহার জটিল। আমেরিকা বা অষ্ট্রেলিয়ার ক্ষেত্রে যেমন তাদের আদিবাসী নির্ধারণ করা সহজ, আমাদের দেশে তা নয়। অধিকন্তু বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীগুলোর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তাদের অধিকাংশই ইতিহাসের কোন সময়ে কোন বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের বর্তমান ভূখন্ডে এসে বসবাস করছে।

১.১.১। বাংলাদেশী গারোদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় :

বাংলাদেশে বর্তমানে কতজন গারো বসবাস করছে তার সঠিক কোন পরিসংখ্যান নেই। ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের আদমশুমারী অনুসারে তখন তাদের জনসংখ্যা ছিল ৬৪,২৪০ জন কিন্তু সে সময়ে গারোরা নিজেরা তাদের সংখ্যা একলক্ষ বা তার চেয়ে বেশী বলে উল্লেখ করতো। তবে অধিকাংশ গারোই গারো পাহাড়ের আশেপাশের এলাকায় বসবাস করতো। এসময়ে ঢাকা থেকে প্রায় ১৫০

কিলোমিটার উত্তরে মধুপুর এলাকায় প্রায় ১৫,০০০ গারো বসবাস করতো। ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইলে অবস্থিত মধুপুর বনাঞ্চলে বসবাসকারী গারোরা বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে বসবাসকারী গারোদের থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন ছিল।

বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলেই এখন গরোরা বসবাস করছে বলে মনে করা হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ: ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে গারোরা সিলেট অঞ্চলের পানের বরজ ও চাবাগানে কাজ করতে শুরু করে। বর্তমানে সাত হাজারেরও বেশী গারো এসব অঞ্চলে বসবাস করছে। তবে এখানে তাদের সংখ্যা কত তা নিশ্চিত করে জানা যায়না। চা বাগানে বহু আগে থেকেই বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর লোক একসাথে বসবাস করছে। ব্রিটিশ শাসনের সময় থেকেই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এখানে শ্রমিক নিয়ে আসা হতো। তবে তাদের মধ্যে কখনই 'সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণ' লক্ষ্য করা যায়নি। বরং তারা একসাথে বসবাস করেও স্বাতন্ত্র রক্ষা করতে চেষ্টা করতো।

বেশ কিছু গারো সিলেটের খাসী পল্লীতে বসবাস করে এবং এখানকার পানের বরজের শ্রমিক হিসেবে কাজ করে। এই পানের বরজগুলোর মালিক খাসিরা। এখানকার খাসি ও গারোদের সকলেই প্রায় খ্রিষ্টান। যে কারণে তাদের মধ্যে সাধারণত সম্পর্ক ভালো এবং একধরনের একাত্মবোধ লক্ষ্য করা যায়।

১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে শুরু করে বিশেষ করে ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দে বহু গারো বাংলাদেশে বৃহৎ দুটি শহর ঢাকা ও চট্টগ্রামে বসবাস করতে শুরু করে। এদুটি শহরের মধ্যে ঢাকা গারোদের কাছে বেশী জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। অনেক গারো নারী, পুরুষই জীবিকার সন্ধানে গ্রাম ছেড়ে ঢাকায় চলে আসে। কেউ কেউ আবার গ্রামের জীবনের একঘেয়েমী ছেড়ে কেবল বৈচিত্রের সন্ধানে ঢাকায় চলে আসে। তবে অনেকেই আশানুরূপ বা যথার্থ কাজের সন্ধান না পেয়ে তারা যে জীবনমানের আশা করেছিল তার চেয়ে খারাপ অবস্থায়ই ঢাকায় থাকতে বাধ্য হয়েছে। কেউ কেউ আবার কাজের অভাবে গ্রামেও ফিরে গিয়েছে।

বর্তমানে কয়েক হাজার গারো ঢাকায় বসবাস করে। তাদের অনেকেই এখানে গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করে। প্রায়ই তারা এখানে রাঁধুনী, আয়া, ড্রাইভার বা দাড়োয়ান হিসেবে কাজ করে। বাকীরা গামেন্টস্ ফ্যাক্টরীতে কাজ করে এবং অনেক নারী বিউটি পার্লারে কাজ করে। এসব কর্মীদের

অনেকেই বনানী, গুলশান এবং বারিধারায় কাছাকাছি ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় বসবাস করে। সাধারণতঃ গারোরা একই এলকায় একসাথে থাকতে চেষ্টা করে। এসব কাজ ছাড়াও অনেক গারো ঢাকার বিভিন্ন এন.জি.ও-তে এবং চার্চের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করছে। তাদের অধিকাংশই ভালো কাজ করছে এবং ঢাকায় তারা তাদের পরিবার নিয়ে বসবাস করছে। অনেক গারো বিশেষ করে এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গারোরা তাদের সন্তানদের ভালোভাবে শিক্ষা দিতে সচেষ্ট এবং তারা এজন্য যথেষ্ট অর্থব্যয় করে থাকে।

ঢাকার মতো একটি বড় শহরে গারোরা অত্যন্ত ক্ষুদ্র একটি জনগোষ্ঠী এবং এখানে এদের সহজে চোখেও পড়েনা। কিন্তু তারা নিজেরা তাদের স্বগোষ্ঠীয় সদস্যদের অবস্থান সম্পর্কে খুব ভালোভাবেই সচেতন থাকে এবং সাধারণত একে অপরের সাথে ঘনিষ্ট যোগাযোগ রাখে। শহরের কেন্দ্রস্থলে তাদের 'নকমান্দি' (গারোদের মিলিত হবার স্থান) অবস্থিত। এখানে বহু গারো বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বা প্রয়োজনে একসাথে মিলিত হয়। গারোদের মধ্যে একধরনের শ্রেণীভেদ আছে বটে, তবে যখন কারো সাহায্যের প্রয়োজন হয় তখন তারা নিজের সামাজিক অবস্থানের কথা ভুলে একে অপরকে আন্তরিকভাবে সাহায্য করতে চেষ্টা করে।

১.১.২। পাহাড়ী অঞ্চলের এবং সমতলভূমির গারো :

বাংলাদেশের গারোদের সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে প্রসঙ্গক্রমে ভারতে বসবাসকারী গারোদের কথা উল্লেখ করতে হয়। বাংলাদেশের সীমানার পাশেই ভারতে গারোদের মুষ্টিমেয় জনগোষ্ঠী বসবাস করে। গারোদের সম্পর্কে লিখিত অধিকাংশ বই ও প্রবন্ধই প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় গারোদের সম্পর্কে লেখা হয়েছে। খুব কম গবেষকই বাংলাদেশের সমভূমিতে বসবাসকারী গারোদের উপর গবেষণা করেছে। সম্ভবত অনেক গবেষকই মনে করেছে তারা যদি একদল গারো সম্পর্কে জানতে পারে তাহলে তা সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। সমস্যা হচ্ছে এ দু'দল গারোর মধ্যে বেশকিছু পার্থক্য আছে। এই পার্থক্যগুলো লক্ষ্য না করলে নানা ভুল ধারণার সৃষ্টি হতে পারে। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে ভারতীয় পাহাড়ী অঞ্চল থেকে বাংলাদেশের অপক্ষাকৃত সমতলভুমিতে গারোরা বাধাহীনভাবে যাতায়াত করত। এর অর্থ এই নয় যে, দেশ বিভাজনের পর থেকেই দুই অঞ্চলের গারোদের মধ্যে ভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। গারোদের সম্পর্কে উপনিবেশিক যুগের তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের অনেক আগে থেকেই দুই অঞ্চলের গারোদের মধ্যে কিছু ভিন্নতা

ছিল। গারোরা নিজেরাও তাদেরকে সমতল অঞ্চলের বাসিন্দা এবং পাহাড়ী অঞ্চলের বাসিন্দা হিসেবে দু'ভাগে ভাগ করে থাকে। 'গারো' নামটি সম্ভবত তাদের গোষ্ঠীর বাইরের মানুষদের দ্বারা আরোপিত নাম। বাংলাদেশের গারোরা নিজেদের মান্দি (যার অর্থ মানুষ) বলে পরিচয় দেয় এবং গারো পাহাড়ী অঞ্চলের গারোরা পরিচয় দেবার সময় আচিক্ বা আচিক্ মান্দি (পাহাড়ী মানুষ) শব্দটি ব্যবহার করে। বর্তমান গবেষণায় এ কারণে গারো নামটিও উল্লেখ করা হয়েছে। কেবল 'গারো' নামটির মাধ্যমেই এই নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর সকলকে একসাথে বুঝানো হয়। অধিকন্তু তাদের গোষ্ঠীর বাইরের মানুষের কাছে তারা গারো নামেই পরিচতি। সুতরাং বাইরের মানুষের কাছে নিজেদের 'গারো' হিসেবে পরিচয় দেওয়া ছাড়া তাদের অন্য কোন উপায় নেই। তবে পাহাড়ী এবং সমতল অঞ্চলে বসবাকারী গারোদের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করাও গুরুত্বপূর্ণ। অনেকেই একটি ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন যে, সকল গারোই পাহাড়ের বাসিন্দা। এটি নিঃসন্দেহে একটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। বাংলাদেশের উত্তর মধ্যাঞ্চল একেবারেই সমতলভূমি। গারোরা এ অঞ্চলে বহুপূর্ব থেকেই বসবাস করছে। অধিকাংশ ভারতীয় গারো পাহাড়ী অঞ্চলে বসবাস করছে এবং বাংলাদেশী গারোরা সমভূমিতে বসবাস করছে– এই বিষয়টিই তাদের মধ্যে বহু পাথর্ক্য সৃষ্টি করেছে। দুই ধরনের প্রাকৃতিক পরিবেশে দুই ধরনের কৃষি ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। গারোরা বহুদিন ধরেই জুম চাষে অভ্যস্ত। এতদসত্ত্বেও গারোদের সম্পর্কে লিখিত প্রথম গবেষণা পুস্তকের লেখক মেজর এ প্লেফেয়ারাও উল্লেখ করেছিলেন যে, সমতলভূমির গারোরা বহুপূর্ব থেকেই হালচাষ বা লাঙ্গল চাষে অভ্যস্ত। অন্যদিকে পাহাড়ী গারোরা ছিল সম্পূর্ণভাবে জুম চাষের উপর নির্ভরশীল (Playfair, 1909 : 37-38)। এ সময়ের কোন কোন প্রবীণ গ্রামবাসী তাদের পূর্বপুরুষের জুমচাষ সম্পর্কে কিছু তথ্য মনে করতে পারেন। যেমন, গারোরা বনজঙ্গল পরিষ্কার করত এবং চাষাবাদের উদ্দেশ্যে একস্থান থেকে অন্যস্থানে যেত। তবে তারা বা তাদের পিতামাতারা কেউ কখনই জুমচাষ করেনি। অষ্টাদশ শতকের শেষের দিক থেকেই সমতল ভূমির গারো গ্রামবাসীরা তাদের বাঙ্গালী প্রতিবেশীদের মতো হালচাষ শুরু করে এবং সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে ধান চাষ শুরু করে (Playfair, 1909 : 35)। অন্যদিকে পাহাড়ী গারোরা জুমচাষের জন্য জঙ্গলের কিছু অংশ পরিষ্কার করতো ঝোপ-ঝাড় শুকানোর জন্য রেখে দিত এবং বর্ষাকাল আসার ঠিক আগে এসব শুষ্ক ঝোপ-ঝাড় আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে ফেলতো। এভাবে পরিষ্কার করা জমিতে দু'বছর পর্যন্ত শুষ্ক ধান চাষ করা সম্ভব হতো এবং তারপর তারা জুমচাষের জন্য অন্য একটি জমি প্রস্তুত করতো। দু'বছর জুমচাষের পর, আবার জমিটি চাষাবাদের উপযুক্ত হতে প্রায় একযুগ সময় লাগতো।

বিংশশতাব্দীতে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর হওয়ায় সরকার তাদের জুমচাষে নিরুৎসাহিত করছে এবং পাহাড়ী গারোদের কেউ কেউ সরকারের চাপে পড়ে হালচাষ শুরু করেছে। গারো সমাজে যখন সম্পূর্ণভাবে জুমচাষ প্রচলিত ছিল তখন তাদের ব্যক্তিমালিকাধীন ভূসম্পত্তি ছিল। সাধারণভাবে গোত্রই ছিল জমির মালিক এবং গোত্রের সকল সদস্যদেরই একখন্ড জমি চাষ করার অধিকার ছিল। কিন্তু সে জমিটি তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে গণ্য হতো না। পরিবর্তীতে হালচাষের মাধ্যমে ভিজা ধানের চাষাবাদ শুরুর পর থেকে জমি ব্যক্তিমালিকাধীনে যাওয়া শুরু হয় এবং ক্রমে ভূমি পারিবারিক সম্পত্তি হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হতে থাকে। এভাবে গারো সমাজের সমন্বিত ভূসম্পত্তি ক্রমে ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে পরিবর্তিত হতে থাকলে তা গারো সমাজের উপরও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। এর ফলে গারো সমাজে বড়রকমের শ্রেণীভেদের সুচনা হয়। সমতলভূমিতে ব্যক্তিমালিকাধীন ভূমি ব্যবস্থা এর অনেক আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। সমতল অঞ্চলের গারোরা তাদের নিজেদের জমির মালিক ছিল। বর্তমানে সকল গারোরই যে নিজস্ব জমি আছে তা নয়। তবে অধিকাংশ গারোই কৃষিজীবি। বর্তমানে গারোদের মধ্যে যেমন অনেক জমির মালিক এরকম ধনী ব্যক্তি রয়েছে, তেমন মধ্য ও ক্ষুদ্র কৃষিজীবি আছে, বর্গাদার বা ভাগচাষী আছে, বহু ভূমিহীন শ্রমজীবি আছে যারা অন্যের জমিতে চাষাবাদ করে কোনরকমে জীবিকা নির্বাহ করে।

বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে মধুপুরের অবস্থা কিছুটা ভিন্ন। এই এলাকাটি কিছুটা উচ্চ বনাঞ্চল সুতরাং এখানে চাষাবাদ প্রক্রিয়া ভিন্ন। এখানে শুষ্ক এবং ভিজা ধান চাষ হয় এবং সম্প্রতিকালে আনারস চাষ বেশ জনপ্রিয় হয়েছে। মধুপুরে জমিতে গারোদের মালিকানা সংক্রান্ত কিছু সমস্যা রয়েছে, মানবাধিকার কর্মীদের সহায়তায় সেখানে জমিতে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তারা বহু বছর ধরে চেষ্টা করে যাচ্ছে।

১.১.৩। গারো ইতিহাস এবং এর গুরুত্ব :

সম্প্রতিকালের গারোদের মনে যে বিষয়টি তীব্রভাবে একাত্মবোধ ও স্বকীয়তাবোধ সৃষ্টি করছে তা হচ্ছে তাদের অভিন্ন ইতিহাস ও উৎপত্তির ধারণা। সকল বাংলাদেশী গারোই তাদের উৎপত্তির ধারণা এবং এদেশে তাদের আগমন সম্পর্কে একটি কাহিনীর সাথে পরিচিত। এ কাহিনী অনুযায়ী গারোরা এক সময় তীব্বত থেকে এসে একটি পাহাড় এবং পাহাড়বেষ্টিত সমতলভূমিতে বসবাস শুরু করে, যে পাহাড়টি পরবর্তীকালে গারো পাহাড় নামকরণ করা হয়। তবে এ কাহিনী

সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায় না বা এর স্বপক্ষে কোন প্রমানও পাওয়া যায় না। এসব প্রচলিত কাহিনী কেবল উপকথা, নাকি এর পেছনে কোন সত্য ইতিহাস আছে তা জানা প্রায় অসম্ভব। সত্য বা মিথ্যা যাই হোক এই কাহিনীগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। বর্তমানের গারো প্রজন্ম বিশ্বাস করে তাদের সকলেরই একটি অভিন্ন উৎপত্তির ইতিহাস রয়েছে। তারা মনে করে গারোদের মধ্যে বিভিন্ন দল উপদল এবং একারণে ভিন্নতা সত্ত্বেও তারা সকলেই একই গোষ্ঠীর মানুষ। এই চেতনাই তাদের একাত্মবোধ সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। অনেকে মনে করতে পারে গারো ইতিহাস অনুসন্ধান অদৌ তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়, কেননা গারোরা তো সবসময়ই গারোই ছিল। আসলে গারো ইতিহাস অনুসন্ধানের যৌক্তিকতা এত সরলভাবে বিচার করা যাবে না। গারোদের সাম্প্রতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই বিষয়টি সুস্পষ্ট হবে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে তাদের নিজেদের ভাষ্য অনুযায়ীই তাদের গোষ্ঠীর যে চিত্র পাওয়া যায় তা থেকে মনে হয় পুরো গারো সমাজ ছিল কতগুলো দল বা উপদলের সমষ্টি, যাদের ভিন্ন ভিন্ন নাম ছিল এবং প্রত্যেকের নিজস্ব ভাষা ছিল। প্রশ্ন ওঠে, গারোদের উপর লেখা অধিকাংশ বই ও প্রবন্ধ থেকে এ চিত্রটি এতটা ভিন্ন কেন? এর উত্তর পূর্বে উল্লিখিত ঐতিহাসিক তথ্য-উপাত্তের সীমাবদ্ধতার আলোচনার মধ্যেই নিহিত। মিশনারি শিক্ষাব্যবস্থা প্রসারের পূর্বে গারোরা লিখতে এবং পড়তে জানতো না। ফলে তাদের কোন লিখিত ইতিহাস নেই। তাদের সাম্প্রতিক ইতিহাস দুটি ঐতিহাসিক সূত্রের উপর নির্ভরশীল: তাদের সম্পর্কে লিখিত ইতিহাস এবং প্রচলিত মৌখিক ইতিহাস। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লিখিত উৎস হলো ব্রিটিশ শাসকদের ঐতিহাসিক দলিল এবং মিশনারি রিপোর্ট। ইতোমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে এই উৎসগুলো সম্পূর্ণ বস্তুগত নয় বা ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা প্রভাবিত। উপরন্তু, এসব ঐতিহাসিক রচনায় কেবল সে বিষয়গুলোই স্থান পেয়েছে যা শাসকবর্গ অনুসন্ধান করতে আগ্রহী ছিল এবং যেগুলো সম্পর্কে তথ্য লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন মনে করেছিল। ব্রিটিশ শাসক বা খ্রিষ্ট ধর্মীয় মিশনারিরা-কেউই গারোদের মধ্যে ভিন্নতাগুলো লক্ষ্য করার প্রয়োজন মনে করেনি। তারা কেবল গারোদের একটি ভিন্ন জনগোষ্ঠী বলে বিবেচনা করেছে। একইভাবে অনেক গবেষক গারোদের একটি বিশেষ দল বা অংশ পর্যবেক্ষণ করে তা সার্বিকীকরণ করে সকল গারোদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত প্রদান করেছে।

গারোদের সাম্প্রতিক ইতিহাস জানার আরেকটি উপায় আছে তা হচ্ছে প্রবীণ গারোদের কাছ থেকে তাদের জীবন কাহিনী শোনা অথবা যেসব কাহিনী তারা তাদের পিতা-মাতা বা দাদা-দাদী বা নানা-নানীর কাছ থেকে শুনেছে তা জানা। ইতিহাসবিদ বা গবেষকরা এই পদ্ধতিকে বলে থাকেন

'মৌখিক ইতিহাস'। এ পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা আছে যেমন- মানুষের স্মৃতি-বিভ্রম ঘটতে পারে বা অনেককিছুই ভুলভাবে মনে করতে পারে। তদুপরি বাংলাদেশের সাধারণ গ্রামবাসীর মতো গ্রামবাসী গারোরাও অধিকাংশ সময় নিজেদের বয়স জানে না। একারণে তাদের বর্ণিত ইতিহাসের সময়কাল নির্ধারণ অসুবিধাজনক মনে হতে পারে। এসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, মৌখিক ইতিহাস (Oral History) গারোদের ইতিহাস সংগ্রহের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উৎস। তাদের নিজেদের মুখে নিজেদের ইতিহাস বর্ণনার ক্ষেত্রে আমরা যেমন বহিরাগতদের পর্যবেক্ষণের থেকে একটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি দেখতে পাই, তেমনি গারোরাও এর মাধ্যমে তাদের ইতিহাস সংগ্রহের একটি সুযোগ পায়, যে মৌখিক ইতিহাস সংগ্রহের গুরুত্ব অতীতে তারা একেবারেই উপলব্ধি করেনি। প্রকৃতপক্ষে বিংশ শতাব্দীর গারো ইতিহাস অনেকটাই এই মৌখিক ইতিহাসের উপর নির্ভরশীল।

'আমরা একদল অন্যদলের চেয়ে ভিন্ন ছিলাম, কিন্তু আমরা সকলেই গারো'- প্রবীণ গারোদের বর্ণনা বিশ্লেষণ করলে এ বিষয়টিই স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। সুতরাং বলা যায়, কয়েক দশক আগে পর্যন্ত বাংলার গারোদের মধ্যে যে ছোট বড় বিভিন্ন দল রয়েছে তারা একে অন্যের থেকে কিছুটা দূরত্ব ও স্বকীয়তা বজায় রেখে চলতে চেষ্টা করতো। তাদের প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে যেমন- চীবক, আবেং, বাবুল, দুয়াল, সমন, ব্রাক, কচু, অত্তং এবং মেগাম। তাদের ধর্মীয় রীতিনীতি, ভিন্ন খাদ্যাভ্যাস, কাপড়বোনার কৌশল প্রভৃতি থেকে মানুষ তাদের আলাদা আলাদা দল বলে চিনতে পারতো। ভিন্ন ভাষা ও বাচনভঙ্গিও তাদের পার্থক্য নির্দেশ করার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেক দলেরই তাদের নিজস্ব 'কুশুক' (নিজস্ব ভাষা ও বাচনভঙ্গি) ছিল। কিছু কিছু কুশুকের একটির সাথে অন্যটির অনেক মিল ছিল আবার কিছু কুশুক একেবারেই ভিন্ন। এদের কোন কোন দল কাছাকাছি আবার কোন কোন দল অন্যদের থেকে অনেক দূরে বসবাস করতো। সম্ভবত বিভিন্ন দলের মধ্যে যোগাযোগ ভৌগলিক দূরত্ব দ্বারাই নির্ধারিত হয়েছিল। উল্লেখ্য তখনকার দিনে যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল অনুন্নত, সুতরাং কয়েক মাইল দূরত্ব অতিক্রম করাও ছিল কষ্টসাধ্য। যাতায়াত ব্যবস্থার অপ্রতুলতার কারণে হয়তো দূরবর্তী দলগুলোর সাথে সম্পর্ক কম ছিল। দেখা যায়, কাছাকাছি বসবাস করা দলগুলোর একে অন্যের সাথে ভালো সম্পর্ক ছিল। তারা একসাথে ধর্মীয় উৎসব এবং অন্যান্য উৎসবাদি পালন করতো। বিভিন্ন দলের মধ্যে বিবাহেরও প্রচলন ছিল, যদিও কোন কোন দলের সদস্যকে বিবাহ করা ছিল একেবারেই নিষিদ্ধ। অনেক সময় একদল অন্যদলকে ভয় পেত এবং অনেক ক্ষেত্রে তাদের সম্পর্কে কিছু ভয়ঙ্কর ধারণাও তারা পোষণ করতো। যেমন- চীবক দলের

সদস্যদের ধারণা ছিল সমন দলের লোকদের নানা ভেষজ কৌশল জানা আছে, যার মাধ্যমে তারা যে কাউকে বিষপ্রয়োগ করতে পারে। গারোদের বিভিন্ন দলের মধ্যে এরকম বৈচিত্র সত্ত্বেও আজকের গারোদের বক্তব্যে একটি বিষয় স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, তারা মনে করেন, বিভিন্ন দল-উপদলে যতই ভিন্নতা থাকুক তারা সকলেই গারো। প্রায় পয়ষট্টি বছর বয়স্ক হালুয়াঘাট থানার একজন কৃষকের বক্তব্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি মনে করেন ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে গারো জনগোষ্ঠীর জীবনে একটি বিরাট পরিবর্তন আসে। তখন বহু গারো ভারতে চলে যেতে বাধ্য হয় এবং তাদের এলাকায় বেশকিছু বাঙালী মুসলিম বাস করতে শুরু করে। এ সময় থেকেই তারা তাদের দলগত ভিন্নতা ভুলে একাত্মবোধ করতে শুরু করে। তারা অনুভব করে ভিন্নতা থাকলেও তারা সকলেই গারো গোষ্ঠীরই সদস্য। এই কৃষকের বক্তব্য এলেন বল (Bal, 2007 : 100) তার গবেষণা পুস্তকে নিম্নোক্তভাবে উল্লেখ করেছেন:

> *"মান্দিদের মধ্যে আত্তং এবং মেগাম ছিল। তাদের ভাষা ভিন্ন হলেও, তারা সকলেই ছিল মান্দি। আমরা কেবল আমাদের কাছাকাছি বসবাসরত দলগুলোর সাথে সম্পর্ক রাখতাম। আত্তং এবং মেগামরা আমাদের থেকে অনেক দূরে বসবাস করতো। সেজন্য আমরা তাদের সঙ্গে কোনরকম যোগাযোগ রাখতে পারতাম না। আমরা কেবল দুয়াল, চীবক, ব্রাকদের সাথে সম্পর্ক রাখতে পারতাম, যারা আমাদের কাছাকাছি বসবাস করতো। তাদের ভাষা ছিল ভিন্ন, কিন্তু এতটা ভিন্ন ছিলনা যে আমরা বুঝতে পারতাম না। যেমন- আমরা বলি 'মি চাঝোক মা: [তুমি কি ভাত খেয়েছো?] চীবকরা বলে, 'মাই চীঝোক মো'। কিন্তু সেসময়ে আমরা কেউই অন্য গোষ্ঠীতে বিবাহ করতে পারতাম না"।*

কেতু নামক হালুয়াঘাট থানার ঐ কৃষক আরো বলেন, কেন তারা অন্য দলে বিবাহ করতে পারতেন না তা তিনি জানেন না, তবে হয়তো এর কারণ ছিল এই যে, তারা ছিল অন্যরকম মানুষ, তাদের ভাষা ছিল ভিন্ন, তাদের খাদ্যভাসও ছিল ভিন্ন।

মোমেন্দ্রা রিছিল নামে একজন গারো ব্যবসায়ী মনে করেন, খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তর তাদের মধ্যে এই পরিবর্তন এনেছে। এখন তারা অনুভব কওে, পার্থক্য থাকলেও তারা সকলেই গারো। দলগত ভিন্নতা সম্পর্কে তার মনোভাব এলেন বল (Bal, 2007 : 104) এভাবে উদ্ধৃত করেছেন:

> *"গারোদের মধ্যে অনেক দল ছিল, যেমন, দুয়াল, চীবক, কচু, সমন, ব্রাক, অত্তং, মেগাম, রুগা, গারা, বাবুল। এই দলগুলোর মধ্যে কোন সামাজিক সম্পর্ক ছিলনা, অন্তর্বিবাহ ছিল অসম্ভব। বাবুলরা কেবল বাবুলদের সাথেই সম্পর্ক রাখতো, চীবকরা কেবল চীবকদের সঙ্গে। এক দল অন্য দলের সমালোচনা করতো। এখন আমরা সকলে খ্রিষ্টান। সে জন্যই আমরা আমাদের দলগত পার্থক্য ভুলে গিয়েছি"।*

আজকে একজন গারোর প্রথম পরিচয়, সে একজন গারো। দলগত পার্থক্য সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা গুলো এখন নেই বললেই চলে। অঞ্চলিক দল বা ভাষাগত দল বলে ভিন্নতা সৃষ্টির প্রবণতা লোপ পেয়েছে। এমনকি গারো নৃগোষ্ঠীর কোন কোন নবীন সদস্য জানেও না তারা কোন দলের সদস্য। এই পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে মিশনারিদের মাধ্যমে তাদের মধ্যে শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন। যখন গারোরা তাদের শিশুদের স্কুলে পাঠানো শুরু করে। তখন গারোদের বিভিন্ন দলের মধ্যে সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়। মিশনারিরা গারোদের আবেং দলের মধ্যে প্রথম খ্রিষ্টধর্মের প্রচার শুরু করে। হয়তো এ কারণে চীবক বা আত্তং নয় বরং আবেং দলের ভাষা বাংলাদেশী গারোদের গোষ্ঠীগত ভাষা হয়ে উঠেছে। সম্ভবতঃ তাদের কাছেই মিশনারিগণ গারো ভাষা শিখেছে এবং তাদের অঞ্চল থেকেই গারোদের সব অঞ্চলে খ্রিষ্ট ধর্মীয় বাণী প্রচার শুরু করে (Bal, Takami and Sangren, 1999 : 1-13)।

গারো ইতিহাস আলোচনার গুরুত্ব প্রসঙ্গে বাংলাপিডিয়ার গারোদের বর্ণনা (Islam, 2000) উদ্ধৃত করে তা বিশ্লেষণ করা যেতে পারে[১]। এই বর্ণনাটি আসলে দক্ষিণ-এশিয়ার উপজাতিগুলোর ক্ষেত্রে সাধারণ ভাবে প্রযোজ্য। এ অঞ্চলের অনেক নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীই যাদের উপজাতি বলে গণ্য করা হয়, তাদের রাষ্ট্রীয় প্রকাশনা বা ব্যক্তিগত প্রকাশনা, একাডেমিক বর্ণনায় একইভাবে উপস্থাপন করতে দেখা যায়। উপজাতি সম্পর্কে লিখিত অধিকাংশ প্রকাশনাতেই একই চিত্র পাওয়া যায়, যখন থেকে ব্রিটিশ শাসকরা ভারতীয় নাগরিকদের বর্ণ, জাতি, ধর্ম, অঞ্চলভেদে বিভিন্ন অংশে ভাগ করার দুঃসাধ্য এবং প্রায় অসম্ভব কার্যক্রম শুরু করে (Bal, 2007 : 1-2)।

[১] বাংলা পিডিয়ায় গারোদের নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে: "Their faces are round, hair and eyes black, foreheads extended to eye area, eye shows deep, eyes small, noses flat and jaws high. Breads rarely grow on their cheeks and they almost have no hair on their body. The natural habitats of the Garo people are the hills, hillocks, deep forests and places near fountains, springs, and other water bodies. Animals, reptiles, and birds are their closest neighbours… MIRZA NATHAN, a Mughal army commander, remarked that Garos eat everything except iron. There are some exaggerations in this statement but in fact, they eat all animals except cats, which is their totem. They live in an isolated world and within their own geographic, economic, and cultural boundaries and follow their own customary norms.

আজকের বাংলাদেশী গারোরা বাংলাদেশের বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর পাশাপাশি বসবাস করেও তাদের স্বকীয়তা বজায় রাখছে। তারা বাংলাদেশী হলেও তাদের নিজস্ব ইতিহাস, ঐতিহ্য ও ভাষা রয়েছে। বাস্তবে অবশ্য গারো সমাজ আমাদের মতই একটি মিশ্র জনগোষ্ঠী যাদের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণি, ভিন্ন ভিন্ন বিপরীতধর্মী দলের মানুষ রয়েছে (Hall, 1991 : 57)।

বাংলাদেশের মধুপুর অঞ্চলের গারোরা অপেক্ষাকৃত বিচ্ছিন্ন একটি জনগোষ্ঠী এবং তাদের সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে কোন কোন গবেষক তাদের এলাকাকে 'গারো দ্বীপ' বলে অভিহিত করেছেন। তবে কোন গোষ্ঠীকে একটি দ্বীপ হিসেবে ধরে নিলেও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি ও অবস্থার প্রাসঙ্গিক আলোচনা ছাড়া ঐ গোষ্ঠীর সঠিক পর্যালোচনা সম্ভব নয় (Baumann, : 145-146)।

অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিকভাবে দক্ষিণ-পূর্ব ভারত এবং এর সীমান্তবর্তী অঞ্চলের গারো এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর অবস্থা পশ্চিম এবং মধ্য ভারতের আদিবাসীদের চেয়ে অনেকটাই ভিন্ন ছিল। ব্রিটিশ উপেনিবেশিক শাসকদের বনায়ন ও কৃষিব্যবস্থার উন্নয়নের সামন্তরাল নীতির ফলে পশ্চিম এবং মধ্য ভারতের অধিকাংশ আদিবাসী প্রজা, ভূমিহীন কৃষক বা ভূমিহীন শ্রমিকে পরিণত হয়। একই সাথে যারা আদিবাসী নয় তারাই হয় ভূমির মালিক, সুদের কারবারি বা কাঠের ব্যবসায়ী (Ambasta, 1998 : 14-15; Devalle, 1992 : 130)।

দক্ষিণপূর্ব ভারতে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ এবং দক্ষিণপূর্ব অংশের তথাকথিত উপজাতিরা কিন্তু একইভাবে উপনিবেশিক শাসকদের অধীনস্ত শ্রমিক শ্রেণিতে পরিণত হয়নি। তারমানে এই নয় এ অঞ্চলের উপজাতিদের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব ভালো ছিল। তাদের এবং তাদের বাঙালী প্রতিবেশীদের অবস্থা প্রায় একই রকম ছিল। বর্তমানেও দক্ষিণ ময়মনসিংহ অঞ্চলের গারো কৃষক ও বাঙালী কৃষকদের অবস্থার বিশেষ কোন পার্থক্য নেই (Bal, 2007 : 11-13)।

১.১.৪। গারোদের অস্তিত্বের সংকট: গারোদের দেশ :

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনামলে গারো পাহাড় এবং বাংলার সমতল অঞ্চল আসাম ও বাংলার প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থার অধীনে ছিল (Provinces of Assam and Bengal)। গারো পাহাড়ের পরই কয়েক কিলোমিটার বিস্তৃত সমতল অঞ্চল। পাহাড়ী অঞ্চল এবং সমতল অঞ্চলের অধিবাসীরা স্বাধীনভাবে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে যাতায়াত করতো। কেননা তখন হিন্দুস্থান বা

পাকিস্তান বলে দু'টো ভিন্ন রাষ্ট্র ছিলনা। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসনের কাছ থেকে মুক্তি পাওয়ার সাথে সাথে ভারত এবং পাকিস্তানের জন্ম হয়। পূর্ব বঙ্গ পরিণত হয় পূর্ব পাকিস্তানে এর ফলে বহু হিন্দুধর্মালম্বী পূর্ব বঙ্গ থেকে পশ্চিম বঙ্গে এবং বহু মুসলিম পশ্চিম বঙ্গ থেকে পূর্ব বঙ্গে চলে আসে। গারোরা হিন্দু বা মুসলিম না হলেও দেশভাগের প্রভাব তাদের উপরও পড়েছে। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো গারো পাহাড় সংলগ্ন সীমান্তবর্তী অঞ্চলে তখন ব্যাপকভাবে মানুষকে দেশান্তরিত হতে দেখা যায়নি বা বড় কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এ অঞ্চলে দেখা যায়নি। ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এ অঞ্চলের মানুষ কোন পাসপোর্ট বা ভিসা ছাড়া নির্বিঘ্নে সীমান্তের একদিক থেকে অন্যদিকে যাতায়াত করতো।

বর্তমানে বাংলাদেশের গারোরা বাংলাদেশকেই তাদের নিজেদের দেশ বলে মনে করে। তারা বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং জন্ম থেকে এখানেই বসবাস করছে। তবে এই চেতনাটি তুলনামূলকভাবে নতুন। দেশভাগের পর কয়েক যুগ পর্যন্ত কোনটি তাদের দেশ এ সম্পর্কে তারা নিশ্চিত ছিলনা (Bal, 2007 : 178-179)। ক্রমে গারোরা তাদের ভবিষ্যত সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হতে শুরু করে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অধ্যুষিত পূর্ব পাকিস্তান তাদের জন্য নিরাপদ বাসস্থান হবে কিনা এ নিয়ে তারা সংশয়গ্রস্ত ছিল। তাদের দেশ কোনটি- এ নিয়ে দ্বিধান্বিত হবার একটি বড় কারণ ছিল তাদের নিরাপত্তাবোধের অভাব। তাদের অনেকেই প্রকৃতপক্ষে সীমান্ত পার হয়ে ভারতে গিয়ে বসবাস শুরু করে। কালক্রমে তারা এদেশে একটি অতি ক্ষুদ্র সংখ্যালঘিষ্ঠ গোষ্ঠীতে পরিণত হয়। ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ভারত থেকে দেশান্তরিত মুসলমান উদ্বাস্তুদের সাথে তাদের বিরোধ শুরু হয়। ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে পূর্ব পাকিস্তানে প্রায় আট লাখ (৮০০,০০০) ভারতীয় মুসলিম পশ্চিমবঙ্গ থেকে এবং এবছর ডিসেম্বর প্রায় ৫ লাখ (৫৪০,০০০) মুসলিম রিফুইজি পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা এবং আসাম থেকে বিতারিত হয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে ময়মনসিংহ অঞ্চলের ভয়াবহ দাঙায় বহুসংখ্যক গারো উদ্বাস্তু হয়ে ভারতে আশ্রয় নেয়। এই গারোদের অনেকেই পরবর্তীকালে আর পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে আসেনি (Bal, 2007 : 178)।

১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশে স্বাধীনতা লাভ এদেশের গারোদের মনে নতুন আশার সঞ্চার করে। গারোদের মধ্যে অনেকে স্বাধীনতা সংগ্রামেও যোগদান করেছিল (Burling, 1997 : 70)। কিছু গারো স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ও ভারতে উদ্ধাস্তু হয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। স্বাধীন বাংলাদেশে

এদেশের গারোরা আগের থেকে ভালো ভবিষ্যৎ জীবনের আশা করেছিল। তবে তাদের জন্য দুঃখের বিষয় এই যে এখনও বাংলাদেশ সাধারণত কেবল বাঙালী জাতির দেশ হিসেবেই বিবেচিত হয়, যে দেশটি প্রকৃতপক্ষে বহু সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর দেশ বা 'মাল্টি-এথনিক নেশন' (Multi-ethnic Nation) ।

১.১.৫। বাংলাদেশী গারোদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য :

একজন বাংলাদেশী গারোর আবয়ব ও অনুভূতির কিছু স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে যা তাকে বাংলাদেশের অন্যান্য বাসিন্দাদের থেকে পৃথকভাবে চিনতে সাহায্য করে। একজন গারোর স্থিরচিত্র দেখেও আমরা তার পৃথক বৈশিষ্ট্য সহজেই বুঝতে পারি। কিন্তু একটি স্থিরচিত্র বা একজন গারোর সাধারণ বর্ণনার মাধ্যমে বাংলাদেশের গারো জীবন ও অনুভূতির সম্পূর্ণ চিত্র ফুটে ওঠেনা। আজকের গারো সমাজের একজন সদস্যের উল্লেখযোগ্য একটি বৈশিষ্ট্য তার প্রবল স্বকীয়তাবোধ, অল্প কিছুদিন আগেও একজন গারো নিজের পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করতো। তারা জানতো মানুষ তাদের আদিম, অনুন্নত উপজাতি বলে মনে করে। আজকের গারোদের চিত্র ভিন্ন। তারা গারো হিসেবে গর্বিত, বিশেষকরে নবীন, শিক্ষিত গারো সমাজ। গারো বলে তারা আর নিজেদের লুকিয়ে রাখতে চায়না। গারোদের বিভিন্ন উৎসবের দিনে ঢাকার রাস্তায় গারো তরুণীদের দ্বিধাহীনভাবে 'দকবান্দি' (গারো নারীদের বিশেষ পোশাক) পরে বের হতে দেখা যায়। গারোরা স্বাচ্ছন্দে এখন ঢাকায় ও তাদের গ্রামের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে।

বর্তমানের গারোদের কাছে গারো গোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে এই যে চেতনা তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। বাঙালীদের চেয়ে ভিন্নতাবোধের তাদের অনেকগুলো কারণ রয়েছে। অনেক গারোকেই তাদের চেহারা থেকেই সহজেই বাঙালীদের থেকে আলাদা করা যায়। অনেক গারোকেই দক্ষিণ এশিয়ার অধিবাসীদের চেয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, যেমন থাইল্যান্ড, বা ফিলিপাইনের অধিবাসীদের মত দেখতে মনে হয়। তবে কোন কোন গারোকে বাঙালী বলেও ভুল হতে পারে, আবার কোন কোন বাঙালীকে গারো বলে ভুল হতে পারে। সুতরাং কেবল চেহারা বা আবয়ব থেকে সাধারণভাবে সব গারোকে বাঙালীদের থেকে পৃথক করা সম্ভব নয় (Bal, et al., 1999 : 13-15)।

১.১.৬। গারো নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী এবং খ্রিষ্টধর্ম :

পুরো বিংশ শতাব্দীতেই গারো নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী তাদের স্বাতন্ত্র্যবোধ রক্ষা করতে পেরেছে। এক্ষেত্রে খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তারা যদি হিন্দুধর্ম বা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতো তাহলে হয়তো গোষ্ঠী হিসেবে তাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা কঠিন হতো। বাংলাদেশের খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীরা একটি সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায় হলেও খ্রিষ্টধর্ম একটি বিশ্বধর্ম এবং গারোদের আগের ধর্মের চেয়ে খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তর তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। তদুপরি, খ্রিষ্টধর্ম গারো গোষ্ঠীকে বৃহৎ খ্রিষ্ট ধর্মীয় সমাজের অন্তর্ভূক্ত করেছে। বর্তমানে গারোদের নব্বই শতাংশেরও বেশি সদস্য খ্রিষ্টান, গারোরা দক্ষিণ এশিয়ার মিশনারি সাফল্যের একটি বড় দৃষ্টান্ত হিসেবে গণ্য হতে পারে। উনবিংশ শতকে গারো এলাকায় মিশনারি প্রচার শুরুর পর থেকে গারোরা ধীরে ধীরে প্রায় সকলেই খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে।

অল্পকিছু প্রবীণ গারো এখনও সাংসারেক ধর্মের অনুসারী। তবে কয়েক যুগ আগের তুলনায় এখন সাংসারেক ধর্মের বাহ্যিক চিহ্নগুলো অপেক্ষাকৃত কম দেখা যায়। সাংসারেকরা বিশ্বাস করে জগতে বহু মাইতে আছে। মাইতেকে সাধরণত 'অশরিরী শক্তি' বলে মনে করা হয়, তবে কিছু কিছু মাইতে এত শক্তিশালী যে তাদের দেব-দেবীর সাথে তুলনা করা যায়। মানুষকে দংশন করার মাধ্যমে এসব মাইতে অসুখ-বিসুখের সৃষ্টি করতে পারে। এসব মাইতের কারণে অসুস্থ ব্যক্তিকে আরোগ্যলাভের জন্য পশুবলি দেবার উপায় জানা আছে খামাল বা পুরহিতের। বছরের বিভিন্ন সময়ে নির্দিষ্ট কিছু ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হয় এবং গ্রামীণ এসব অনুষ্ঠানের একটি প্রধান পর্ব হলো, মিতের উদ্দেশ্যে পশু-পাখি উৎসর্গ করা। গারোদের সবচেয়ে বড় উৎসব, ওয়ানগালা উৎসব পালন করা হয় শীতের শুরুতে, যখন ক্ষেতের ফসল তোলা হয়। বাংলাদেশে প্রকৃত সাংসারেক অনুষ্ঠান প্রায় দেখাই যায়না। আজকের দিনে গারোরা ওয়ানগালা উৎসব একটু ভিন্নভাবে পালন করে, যেখানে খ্রিষ্ট ধর্মীয় প্রার্থনাসভা প্রধান ভূমিকা পালন করে। বর্তমানকালে অনেক গারো মনে করেন খ্রিষ্টধর্ম তাদের জন্য অনেক নতুন সুযোগ-সুবিধা এনে দিয়েছে। অন্যরা বিশ্বাস করে, মিশনারিদের কারণে গারোরা তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিকে হারিয়ে ফেলছে। কিন্তু গারোদের ভিন্ন পরিচয় রক্ষা করতে খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তর যে সাহায্য করেছে এবিষয়ে প্রায় সকলেই ঐক্যমত্য প্রকাশ করে। তার অর্থ এই নয় যে, গারোদের খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করা খুব সহজ ছিল বা সহসাই তারা ধর্মান্তরিত হয়েছে। আজও গারোদের মধ্যে কোন কোন প্রবীণ ব্যক্তি সাংসারেক ধর্মের অনুসারী রয়ে গিয়েছে। কোন কোন বৃহৎ

পরিবারে দেখা যায় মাতামহ-মাতামহী এখনও সাংসারেক ধর্মের অনুসারী এবং তাদের সন্তান-সন্ততি ও নাতি-নাতনি সকলেই খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী।

গারো এলাকায় আগত প্রথম মিশনারিগণ এবং প্রথমদিকে খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত গারোদের প্রায়শই সংসারেক গারোদের বিরোধীতার মোকাবেলা করতে হতো তবে অনেক সময়েই সাংসারেক এবং খ্রিষ্টান গারোদের শান্তিপূর্ণভাবে একসাথে বসবাস করতে দেখা গেছে। তখন খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত গারোরা কেবল সাংসারেক ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠানাদি থেকে দূরে থাকতো। অতীতে কোন কোন সময়ে দু'একজন গারো ব্যক্তিগতভাবে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করতো, কিন্তু প্রায়ই দেখা যেতো পুরো গ্রামের সকলেই একসাথে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করতো। গ্রাম প্রধান বা নকমা খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেই সাধারণত: এ ধরনের ধর্মান্তর ঘটতো। যখন ব্যক্তিগতভাবে কোন গারো খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করতো তখন হয়তো মিশনারিরা তাদের এ বিষয়ে আশ্বস্ত করতে সক্ষম হতো যে, খ্রিষ্টধর্মই সত্য ধর্ম অথবা এ বিশ্বাস থেকেই ব্যক্তি অনেক সময় খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করতো যে, এই নতুন ধর্মে দীক্ষাগ্রহণের পর তাদের জীবনমান উন্নত হবে। বস্তত, এই মিশনারিরাই গারো এলাকায় শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে, চিকিৎসাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছে, গভীর নলকূপ বসিয়েছে এবং তাদের আর্থিক সাহায্য করেছে। গারোরা যে কেবল অভাবের তাড়নায় খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে বা তারা খ্রিষ্ট ধর্মীয় মিশনারিদের সহজ শিকার- একথা সরলভাবে বলা চলে না। প্রকৃতপক্ষে গারোরা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ধর্মান্তরিত হয়েছিল (Hefner, 1993 : 3-46)। পুরো বিংশ শতাব্দীতে তারা বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন কারণে ধর্মান্তরিত হয়েছে। প্রবীণ গারোরা এখনও অনেকসময় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, এখন খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করার সময় এসেছে (Bal, 2007 : 137-138, 141-142)।

১.১.৭। ধর্ম এক বিভাজন অনেক :

খ্রিষ্টধর্ম আধুনিককালের গারোদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে গণ্য হতে পারে, যা নিঃসন্দেহে গারোদের তাদের প্রতিবেশীদের থেকে পৃথক রেখেছে। এভাবে এই ধর্ম গারোদের একাত্মতা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বিপরীতভাবে খ্রিষ্টধর্মের ভিন্ন ভিন্ন শাখা গারোদের মধ্যে নতুন ধরনের বিভাজন সৃষ্টি করেছে। বর্তমানকালে বিভিন্ন চার্চের মধ্যে দ্বন্দের কারণে চাপা উত্তেজনা অনেকটাই কমে এসেছে। বিশেষ করে নবীন গারোরা বিভিন্ন চার্চের পার্থক্য সম্পর্কে উদ্বিগ্ন নয়। তবে অল্প কিছুদিন আগে পর্যন্ত খ্রিষ্টধর্মের বিভিন্ন শাখার বিরোধ অত্যন্ত সংকটজনক পরিস্থিতির

সৃষ্টি করতো এর পেছনে অবশ্য প্রধান কারণ ছিল বিভিন্ন চার্চের নেতৃস্থানীয় পুরোহিতদের মধ্যে মতবিরোধ। অনেক সাধারন ধর্মানুসারী বিভিন্ন চার্চের পার্থক্য সম্পর্কে সামান্যই চিন্তা করতো। অনেক সময়ই দেখা যেতো বিরোধের মূল কারণ মদ্যপানের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত। ব্যাপটিস্ট (Baptists) গারোরা মদ্যপান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল, যেখানে ক্যাথলিক গারোরা পূর্বের মতই পঁচুই বা চুঁ (ভাত থেকে তৈরি মদ) পান করতে পারতো।

গারো এলাকায় প্রথম আগমন ঘটেছিল ব্যাপটিস্ট মিশনারি কর্মীদের। ১৮৯২ খ্রিষ্টাব্দে দূর্গাপুরের কাছে বিরিশিরিতে তারা একটি চার্চ স্থাপন করে। পরবর্তীকালে ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে বিরিশিরির কয়েক মাইল দূরেই ক্যাথরিকরা তাদের প্রথম চার্চ স্থাপন করে। এ সম্পর্কে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। শোনা যায়, কোন কারণে কয়েকজন ব্যাপটিস্ট গারো ব্যাপটিস্ট মিশনারিদের উপর ক্ষুদ্ধ হয়। তারা ঢাকায় ক্যাথলিক বিশপের সাথে দেখা করে তাদর এলাকায় ক্যাথলিক মিশনারিদের প্রেরণ করতে অনুরোধ করে। ব্যাপটিস্টদের জন্য অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, পরবর্তীকালে ক্যাথলিক চার্চ বাংলাদেশের গারোদের বৃহত্তম চার্চে পরিণত হয় (৬৭ শতাংশ), ব্যাপ্টিস্টরা হয় দ্বিতীয় বৃহত্তম চার্চ (২৯ শতাংশ অনুসারী)। অন্যান্য যে খ্রিষ্ট ধর্মীয় চার্চগুলো গারোদের মধ্য ধর্ম প্রচারে নিয়োজিত আছে তাদের মধ্যে রয়েছে এ্যাংলিকান চার্চ, যারা হালুয়াঘাটে তাদের মিশন স্থাপন করে, সেভেন ডে এ্যাডভেনটিষ্ট এবং দা নিউ এপোষ্টোলিক চার্চ। এ চার্চগুলোর অনুসারীর সংখ্যা অবশ্য খুবই কম।

১.১.৮। গারোদের খ্রিষ্ট ধর্মীয় জীবনধারা :

আধুনিককালের গারোদের জীবনে খ্রিষ্টধর্ম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা পালন করছে। একটি বিষয় লক্ষণীয় যে সাংসারেক গরোরাও মনে করে যে খ্রিষ্টধর্ম গারো সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এ কারণে সাংসারেকদের প্রায়ই ধর্মান্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে দেখা যায়। দ্বিতীয়ত: গারোদের ব্যবহারিক জীবনের সাথে খ্রিষ্টধর্ম অতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। কারিতাস (Caritas) বা ওয়ার্ল্ড ভিশনের (World Vision) মত খ্রিষ্টান এন.জি.ও. (NGO) গারোদের সব গ্রামে কাজ করছে। এসব এন.জি.ও. গারোদের চাকুরী দিচ্ছে, শিশুদের মিশনারি স্কুলে পড়াশুনা করতে সাহায্য করছে এবং দাফতরিকভাবে তারা সকলেই খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী। গারোরা তাদের অপেক্ষাকৃত উচ্চ শিক্ষাহার নিয়ে অত্যন্ত গর্বিত। গারোরা এখন তাদের ছেলে মেয়েদের সুন্দর ভবিষ্যৎ জীবন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে শিক্ষালাভ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে। ধর্মান্তরকে অনেকসময়ই একটি একমুখী

প্রক্রিয়া বলে ব্যাখা করা হয়। বিদেশী মিশনারিগণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনে প্রবেশ করে এবং তাদের পক্ষে ধনী বিদেশীদের দেওয়া সুবিধাদি ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব হয় না। তথাকথিত উপজাতী গোষ্ঠীর সদস্যদের মন সহজে জয় করা যায় বলে মনে করা হয়, যেহেতু তারা সুদজীবীদের সহজ শিকার হতো এবং দেশের মূল জনগোষ্ঠীর চেয়ে সহজ-সরল ছিল। কিন্তু বাস্তবে পুরো বিষয়টি অনেক বেশি জটিল। একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, গারোদের বিশ্বাস অর্থের বিনিময়ে কেনা হয়নি বা তাদের জোরপূর্বক ধর্মান্তরে বাধ্য করা হয়নি। গারোরা নিজেরা খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী হিসেবে গর্ববোধ করে এবং খ্রিষ্টধর্মকে তারা তাদের গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য বলে মনে করে। তারা এটিও উপলব্ধি করে, খ্রিষ্টধর্ম তাদের বাংলাদেশের বাইরে বৃহত্তর বিশ্বের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে দিয়েছে। খ্রিষ্টসমাজের সদস্য হওয়া তাদের মধ্যে একধরনের নিরাপত্তাবোধের জন্ম দিয়েছে।

আজকের গারোদের জীবনধারার আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল ক্রিসমাস, যা তাদের প্রকৃত উৎসব। ক্রিসমাস বা বড়দিন এখন তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাৎসরিক উৎসবে পরিণত হয়েছে, যা বড় করে পালিত হয়। মূল অনুষ্ঠানের কয়েকদিন, এমনকি কয়েক সপ্তাহ আগে থেকেই গারো এলাকায় ক্রিসমাসের প্রস্তুতি ও আয়োজন চলতে থাকে। ক্রিসমাসের আগের দিনে শত শত গারোদের ঢাকার মহাখালী বাস স্টেশনে দেখা যায়, যেখান থেকে বাস টাঙ্গাইল বা মনমনসিংহে যাত্রা করে। বড় দিনটি গারোরা সাধারণতঃ নিজেদের গ্রামেই উদ্‌যাপন করতে চায়।

গত কয়েক বছর ধরে আরেকটি অনুষ্ঠান বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে তা হল 'প্রাক-বড়দিন' (Pre-Chrismas), যে অনুষ্ঠানটি আসলে শহরবাসী গারোরা পালন করতে শুরু করেছে। যেহেতু শহরে বসবাসকারী গারোরা ক্রিসমাস পালন করতে গ্রামে যায়, সেহেতু ক্রিসমাসের কয়েক সপ্তাহ আগে তারা তাদের শহরের বন্ধুদের সাথে ক্রিসমাস পালন করার জন্য একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। বর্তমানে 'প্রাক-বড়দিন উৎসব' (Pre-Chrismas Parties) গ্রামেও জনপিয়তা লাভ করছে। চার্চ এবং অন্যান্য খ্রিষ্টান প্রতিষ্ঠান বিশেষ প্রি-ক্রিসমাস ভোজ ও অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। এসব অনুষ্ঠানের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং বন্ধু পরিচিত জনকে ভোজে আপ্যায়ন করার রীতি এখন তাদের সমাজে অত্যান্ত জনপ্রিয়।

গত এক শতকে পূর্ব-বাংলা, পূর্ব পাকিস্তান এবং বর্তমান বাংলাদেশে একই সাথে নানা সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে। গারো সমাজও এই উন্নয়নের বাইরে

যাকেনি। দৃষ্টান্তস্বরূপ, পূর্বের আলোচনায় দেখা গিয়েছে, ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের দেশভাগ গারো সমাজকে কিভাবে দু'দেশে বিভক্ত করেছে এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয় কিভাবে পূর্ব- পাকিস্তানে বসবাসকারী গারোদেও মনে নতুন আশার সঞ্চার করেছে। উনবিংশ শতকের গারোদেও চেয়ে সাম্প্রতিককালের গারোরা অনেক দিকেই ভিন্ন। তবে, সম্ভবত তারা তাদেও গোষ্ঠীর স্বকীয়তা সম্পর্কে সাম্প্রতিককালের মতো কখনই সচেতন ছিল না।

বাংলাদেশের গারোরা নিজেদেও 'মান্দি' বলে পরিচয় দেয়, তাদেও ভাষা আবেং, তারা খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী এবং তারা মাতৃসুত্রীয় ধারায় নামের সাথে উপাধী গস্থহণ করে। গারো হিসেবে ভিন্ন হতে পেওে তারা গর্বিত। তারা বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আজকের অবস্থায় পৌঁছেছে এবং আগামী একশ বছওে তাদেও হয়তো আরো অনেক পরিবর্তন হবে। তবে এখন তাদেও জন্য যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল এশটি নৃত্তাত্ত্বিক গোষ্ঠী হিসেবে তাদেও যে ভিন্ন বৈশিষ্ট্য আছে তা মেনে নেওয়া এবং একইসাথে বাংলাদেশে কেবল এশটি নয় বরং বহু সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী আছে সেটিও উপলব্ধি করা। এ প্রসঙ্গে এলেন বল তার গবেষণা প্রবন্ধে একজন গারো কৃষকের বক্তব্য উদ্ধৃত কওে বলেন, 'অনেকরকম ফুলের সমন্বয়ে এশটি বাগান বেশি সুন্দও হয়ে ওঠে' (Bal, et al., 1999 : 21-25)।

১.১.৯। গারো এবং মান্দি :

এই অধ্যায়ের পাহাড়ী অঞ্চলের এবং সমতলভূমির গারোদেও সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে, গারো নামটি দ্বারা তারা তাদের গোষ্ঠীর বাইরের লোকদের কাছে পরিচিত কিন্তু নিজেরা তাদের পরিচয় দেবার ক্ষেত্রে কখনই গারো নামটি ব্যবহার করে না। তবে গত শতাব্দীতেও গারোরা নামটি তারা আপত্তিকর বলে মনে করতো না। ভারতে গারোদের এলাকার প্রাতিষ্ঠানিক নামও "গারো পাহাড়"। যেহেতু অতীতে গারোদের সম্পর্কে সকল নৃতাত্ত্বিক বর্ণনায় তাদেরকে 'গারো' নামেই উল্লেখ করা হয়েছে সেহেতু বর্তমানকালের অনেক গবেষকই মনে করেছেন নতুন শব্দের ব্যবহার করে তাদের সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্তের ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি করা অপ্রয়োজনীয়। তবে সাম্প্রতিক কালে গারোদের অনেকেই 'গারো' নামে তাদের সম্বোধন করা পছন্দ করেনা। বাংলাদেশের গারোরা তাদের নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর নাম হিসেবে 'মান্দি' শব্দটি ব্যবহারের পক্ষপাতী। পৃথিবীর অনেক আদিবাসী বা নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর নামের মতই মান্দি শব্দের অর্থও 'মানুষ'। মান্দি শব্দটির ব্যবহার এখন যথার্থ মনে হলেও এক্ষেত্রে কিছু অসুবিধা রয়েছে। বাংলাদেশের গারোরা

নিজেদের নাম 'মান্দি' উচ্চারণ করলেও বাংলাদেশের সীমান্তের উত্তরাঞ্চলের গারোরা শব্দটি উচ্চারণ করে 'মান্দে' হিসেবে। উপরন্তু পাহাড়ী অঞ্চলের গারোরা নিজেদের পরিচয় দেয় "আচিক্" নামে যার অর্থ "পাহাড়ী মানুষ"। তবে বাংলাদেশের মত সমতলভূমির বাসিন্দাদের "আচিক্" নামে ডাকা যথার্থ নয়। অর্থাৎ গারো ছাড়া কোন একক শব্দ নেই যার দ্বারা গারো নৃতাত্তিক গোষ্ঠী বলে যারা পরিচিত তাদের সকলকে একসাথে বুঝানো যায়।

সুতরাং বৃহত্তর গারো সমাজকে একসাথে বুঝানোর জন্য গারো শব্দের বিকল্প খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। বাংলাদেশ ও ভারতের গারোরা সকলেই একই নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর সদস্য বলে নিজেদের মনে করে এবং তারা নিজেদের বৃহত্তর গারো সমাজের সদস্য বলে পরিচয় দিতেও দ্বিধাবোধ করেনা।

বাংলাদেশে যে এক লক্ষ মান্দি বা গারো জনগোষ্ঠী বাস করে তারা গারো পাহাড়ের দক্ষিণাংশে কয়েক কিলোমিটার বিস্তৃত এলাকায় বাস করে। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভের পর যখন ভারত ও পাকিস্তান নামে দেশভাগ করা হয় তখন গারো এলাকায় ইচ্ছামাফিক সীমান্তরেখা তৈরী করা হয়। অনেক কৃষককেই তাদের বাড়ি থেকে ফসলের জমিতে যাবার জন্য প্রতিদিন এই আন্তজার্তিক সীমান্তরেখা অতিক্রম করে যেতে হতো। দেশভাগের পর দেখা গেল অনেকেরই ভাই-বোন যারা পাশাপাশি গ্রামে বাস করতো তারা এখন দু'টি ভিন্ন দেশের নাগরিক। প্রথমদিকে এটি তাদের দৈনন্দিন জীবনে তেমন ব্যবহারিক পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারেনি। সীমান্ত অঞ্চল তেমনভাবে পাহারা দেওয়া হতো না, এবং মানুষ জন সহজেই একদিক থেকে অন্যদিকে যেতে পারতো। কিন্তু ক্রমে পরিস্থিতির পরিবর্তন হলো দুই ধরনের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার অভিজ্ঞতা গারো জনগোষ্ঠীকে ধীরে ধীরে দু'ভাগে বিভক্ত করতে থাকে। বাংলাদেশের মান্দিদের মনেও ক্রমে বাংলাদেশের অধিবাসী হিসেবে চেতনাবোধ তৈরী হতে থাকে।

মান্দিরা বর্তমান বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার এক শতাংশের দশ ভাগের এক ভাগেরও কম। সংখ্যায় একশ মিলিয়নেরও বেশি জনসংখ্যা অধ্যুষিত বাংলাদেশে তারা একটি অত্যন্ত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী। নিঃসন্দেহে গারোদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় বাঙালীদের প্রভাব অপরিসীম, অন্যদিকে বাঙালীদের উপর গারোদের কোন প্রভাব নেই বললেই চলে। যেখানে মান্দিদের প্রতিটি ক্ষেত্রেই বাঙালীদের সাথে যোগাযোগ রাখতে হয় সেখানে অধিকাংশ বাঙালীর কাছে মান্দিরা অদৃশ্য। মান্দিদের উপর অবশ্যই বাঙালী সংস্কৃতির গভীর প্রভাব পড়ছে, অন্যদিকে বাঙালীদের প্রভাবিত করার

কোন সুযোগ নেই মান্দিদের। তবে ইতিহাস পর্যালোচনা করলে যেমন দেখা যায় ভারতীয় উপমহাদেশের সভ্যতা এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সভ্যতার মধ্যে সাংস্কৃতিক লেন-দেন কখনই একপেশে ছিলনা, তেমনি সীমান্তবর্তী এলাকার অধিবাসী মান্দিদের অতীতও এই ইতিহাসেরই অংশ (Burling 1997 : 3-4)।

১.২। গবেষণা পটভূমি :

এ অভিসন্দর্ভের মূল লক্ষ্য হচ্ছে, বাংলাদেশের আদিবাসী সমাজের মধ্যে খ্রিষ্টধর্মের প্রভাবে আদিবাসীদের খ্রিষ্ট ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ও বিশ্বাসের পার্থক্যসমূহকে নিরূপণ করা। বাংলাদেশের গারো অঞ্চলের আদিবাসীদের মধ্যে প্রায় দেড়শত বছর যাবৎ খ্রিষ্টধর্ম প্রসার লাভ করছে। বর্তমানে প্রায় শতকরা পঁচানব্বই ভাগ আদিবাসীই এই খ্রিষ্টধর্মের অন্তর্ভূক্ত। খ্রিষ্টধর্ম এই আদিবাসীদের মধ্যে যেভাবে পালন করা হয় তা স্বভাবতই একটু ভিন্ন ধরণের। বস্তুতঃ এই সংমিশ্রণকে ধর্ম তত্ত্ব ও সমাজ বিজ্ঞানের পরিভাষায় সিনক্রেটিজেম বলে অভিহত করা হয়। বর্তমান গবেষণায় আদিবাসী এই গোষ্ঠীর মধ্যে সিনক্রেটিজমের প্রবণতাটি কীভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এই প্রভাব সর্বাধিক তা বিবেচনা করার জন্যেই গারো সম্প্রদায়ের কয়েকটি অংশকে বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

গারোরা নামে নিজেদেরকে গারো বলে পরিচয় দিতে অনিচ্ছুক। কারণ তাদের ধারণা গারো নামটি শ্লেষাত্মক এবং উদ্দেশ্যমূলক ভাবে বিদেশীরা এই নামটি তাদের দিয়েছে। গারো নামটি কীভাবে এসেছিলো তা সঠিক ভাবে নির্ণয় করা যাচ্ছে না। তবে কয়েকটি মত এখানে প্রাধান্য পেয়েছে– প্রথমত: গারো পাহাড়ের দক্ষিণ প্রান্তে এদের অবস্থান বলে বাঙালিদের সঙ্গে তাদের পরিচয় এইভাবে এবং সেখান থেকে এই নামটি এসেছে বলে ধারণা করা হয়। কারো কারো মতে, বাংলাদেশের সীমানার কাছাকাছি এই গারোদেরই একটি দল গারা-গান চিং বসতি স্থাপন করেছিল বলে এই নামকরণ হয়েছে। আরেকটি মত হলো, ব্রিটিশ শাসনামলে সীমান্তবর্তী হিন্দু জমিদারগণ পাহাড়ে বসবাসকারী গারোদের বশ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তখনি তাদেরকে ঘারুয়া (জেদি বা একরোখা) বলে চিহ্নিত করেছে। কালক্রমে ঘারুয়া শব্দটি গারোতে রুপান্তরিত হয়। গারোরা নিজেদেরকে আচিক্ মান্দি বলে পরিচয় দিয়ে থাকে। আচিক্ মান্দির প্রকৃত অর্থ হলো পাহাড়ের মানুষ। তবে এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। বাংলাদেশে গারোরা তাদেরকে সংক্ষেপে মান্দি বলে

অভিহিত করে। গারোদের বৃহদাংশ ভারতে অবস্থান করছে তবে বাংলাদেশে ময়মনসিংহ, জামালপুর, শেরপুর, নেত্রকোণা, ও টাঙ্গাইল জেলার কিছু এলাকায় এবং সিলেট জেলার কতিপয় অংশে গারোদের বসবাস রয়েছে। বাংলাদেশে গারোদের প্রকৃত জনসংখ্যা কত তার কোন সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া যায়নি। কেননা বিগত আদিমশুমারী সমূহে বাংলাদেশে আদিবাসীদের আলাদা করে গণনা করা হয়নি। বাংলাদেশের এদের জনসংখ্যা সম্পর্কে জানতে হলে, খ্রিষ্টধর্মের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে তথ্য পাওয়া যায়। এসব সুত্র থেকে জানা যায়, বাংলাদেশে গারোদের সংখ্যা শোয়া লাখের উপরে।

বাংলাদেশে গারো অধ্যুষিত অঞ্চলে (ময়মনসিংহ, জামালপুর, শেরপুর, নেত্রকোনা, টাঙ্গাইল ও সুনামগঞ্জ) ভুপ্রাকৃতিক গঠনটি প্রায়শই সমতল হয়। তবে টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর, ময়মনসিংহ জেলার ফুলবাড়িয়া ও ভালুকা থানার কিছু অংশে উচ্চ মালভূমি সদৃশ্য অঞ্চল পাওয়া যায়। এই অঞ্চলগুলো আবার গাজারি বন দ্বারা সমাকীর্ণ। এখানকার জলবায়ু বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো নাতিশীতোষ্ণ। বাংলাদেশের উত্তরে আন্তর্জাতিক সীমানা বরাবর গারোদের এলাকাগুলো বেশিরভাগই সমভুমি এবং কোথাও কোথাও ছোট খাটো উপত্যকা দেখা যায়। বাংলাদেশের এই আদিবাসী গোষ্ঠীটির সঙ্গে ভারতে অবস্থিত আচিক্ মান্দি সম্প্রদায়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে এবং খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার ক্ষেত্রেও তাদের প্রচুর সামঞ্জস্য রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বর্তমান অভিসন্দর্ভে সিনক্রেটিক প্রবণতা সম্পর্কে বাংলাদেশে আচিক্ মান্দি সম্প্রদায়ের উপর আলোচনা বহুলাংশে সেই ভারতীয় অংশের অনুরূপ।

১.৩। গবেষণার লক্ষ্য :

বাংলাদেশে আদিবাসী গোষ্ঠীসমূহের উপর পর্যাপ্ত গবেষণা হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের বেশ কয়েকটি আদিবাসী গোষ্ঠীর উপর বহুসংখ্যক প্রামাণ্য গ্রন্থ রয়েছে। গারোদের উপর যে কয়েকটি আলোচনা পাওয়া যায় সেখানে ধর্মান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়া এবং ধর্মীয় সংমিশ্রণের প্রকরণ সম্পর্কে খুব একটা তথ্য পাওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে সাধারণভাবে এ সমস্যাটিকে ইতোপূর্বে কখনো চিহ্নিত করা হয়নি; যার ফলে আদিবাসী এই গোষ্ঠীর প্রকৃত পরিচয়টিও অস্পষ্ট থেকে গেছে। খ্রিষ্টধর্ম প্রসারের আগে এ অঞ্চলের অধিবাসিরা যে ধর্মটি পালন করতেন তাকে সাংসারিক ধর্ম বলে অভিহত করা হয়। গারোদের এই আদি ধর্মকে অনেকে জড়োপাসনা বলে আখ্যায়িত করেছে (Animisn/animatism)। বাস্তবে কিন্তু এটি আদৌ তা নয়। বরঞ্চ পৃথিবীর

অন্যান্য প্রধান ধর্মমতের মতোই গারোদের আদি ধর্ম আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের ভিত্তিমুলে প্রতিষ্ঠিত (Jangcham, 2010 : 73)।

সাংসারিক ধর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, অতি প্রাকৃত শক্তির বস্তুগত ধারণা সৃষ্টি। এর মূল উদ্দেশ্য হলো অশুভ শক্তি (Evil Spirit) এর সন্তুষ্টি বিধান। তাদের ধারণায় এ শক্তি বিভিন্ন রকম রোগ, শোক, দুঃখ এবং নানা ধরণের বিপর্যয় সৃষ্টি করে থাকে। এ সমস্ত থেকে পরিত্রাণের উপায় এ অপশক্তির সন্তুষ্টি বিধান। প্লেফেয়ার (Playfair) -এর একটি উক্তি এখানে বিশেষ ভাবে পরিধানযোগ্য। "অন্যান্য যাবতীয় জড়োপোশনা ধর্মের মতোই গারোদের বিশ্বাসে অকল্যাণমূলক ও কল্যাণমূলক দুই ধরণের spirit ই প্রকৃতিতে বিদ্যমান। কোনো কোনো sprit বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে থাকে আবার কিছু সংখ্যক spirit প্রাকৃতিক ঘটনাবলীকে নিয়ন্ত্রণ করে; এবং মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যুঅবধি যাবতীয় ঘটনাবলী এ শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই শক্তির রোগ নিরসনের জন্য বিভিন্ন রকম উপাসনার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়" (Playfair, 1909 : 80)। সাম্প্রতিক কালে সাংসারিক ধর্মের যে চিত্রটি প্রকাশ পাচ্ছে তা খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী আচিক্ মান্দিদের মধ্যেও পরোক্ষভাবে পরিলক্ষিত হয়। আচিক্ মান্দিদের সামাজিক জীবনে বিভিন্ন রকম আচার-অনুষ্ঠান রয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় অনুষ্ঠানটি হচ্ছে ঝুম চাষের ফসল তোলার সময় আয়োজিত উৎসব যা ওয়ানগালা উৎসব নামে পরিচিত। এই উৎসব অনুষ্ঠানে যে সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হয় তার মধ্যে অধিকাংশই সাংসারিক ধর্মে থেকে আর্হিত।

এখানে উল্লেখিত আচিক্ মান্দিদের আদি ধর্মের সৃষ্টি তত্ত্ব পবিত্র বাইবেলে বর্ণিত সৃষ্টি তত্ত্বের সঙ্গে সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করা যায়। আবার একই সঙ্গে তাদের বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি সম্পর্কিত কোন কোন বক্তব্য যথা- বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সীমাহীন, জলময় ও ঘোরতমসাচ্ছন্ন ছিলো; সেখান থেকেই গ্রহমণ্ডলীর ও পৃথিবীর সৃষ্টি হয় এবং সর্বশেষ মানবজাতিকে প্রধান দেবতা যাকে তারা তাতারা রাবুগা বলে অভিহিত করেছে এবং তার দ্বারা মানবজাতি সৃষ্টি হয়েছে। খ্রিষ্টধর্মের প্রসার ও অতিদ্রুত সমগ্র আচিক্ মান্দি গোষ্ঠীর মধ্যে এর ব্যাপকতার অন্যতম কারণ হিসেবে সাংসারিক ধর্মের এই সামঞ্জস্যতা বহুলাংশে কার্যকর হয়েছে বলে অনুমান করা সম্ভব। তবে বর্তমান গবেষণায় এই সংমিশ্রণের প্রকৃত চিত্রটি উদঘাটনের জন্য পাঁচটি মাত্রায় পর্যালোচনা প্রয়োজন।

প্রথমত: বাংলাদেশের নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও তাদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহের পর্যালোচনা এই গবেষণার জন্য অপরিহার্য। এই নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীসমূহের ধর্মবিশ্বাসের পারস্পরিক সম্পর্ক আছে কিনা এটাও দেখা আবশ্যক। বিশেষ করে, এই ধর্মবিশ্বাস সমূহ কীভাবে বিভিন্ন অঞ্চলে বৃহৎ ধর্ম গোষ্ঠীর সাথে যুক্ত হয়েছে তার এখানে একটি বিশদ বিবরণ অপরিহার্য। যেমন- গারোদের মধ্যে খ্রিষ্টধর্মের সঙ্গে আদিবাসী সাংসারিক ধর্মের একটি যোগসুত্র খুঁজে পাওয়া যায়, তেমনি পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলেও বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম নানা বিচিত্র রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। সিনক্রেটিজমের প্রকৃত চিত্রটি উদঘাটনের জন্য এই অধ্যায়টির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত: সিনক্রেটিজম প্রত্যয়টির তাৎপর্য কী এবং সিনক্রেটিজমের বিভিন্ন ধরণের প্রয়োগ এই গবেষণার জন্য অপরিহায্য। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় প্রতিটি ধর্মের মধ্যেই সিনক্রেটিক প্রবণতা রয়েছে বলা যায়। বিশেষ করে খ্রিষ্টধর্মের ক্যাথলিক গির্জার উদারনৈতিক কর্মকাণ্ডের ফলে সিনক্রেটিজম একটি প্রধান বিচারার্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে (Ref Pop)। আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে খ্রিষ্টধর্মের এহেন সিনক্রেটিক প্রবণতার আলোচনা বিভিন্ন গবেষকরা করেছেন তার কিছু কিছু ব্যাখ্যা আমাদের দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রদান করা হয়েছে।

তৃতীয়ত: আচিক্ মান্দি কারা এবং তাদের ঐতিহ্যবাহী ধর্মের সম্মুখ চিত্রটি তুলে ধরা প্রয়োজন। বস্তুত তাদের সমাজ ব্যবস্থা ও সংস্কৃতির মধ্যে যে যে উপাদান এই সাংস্কৃতিক মিশ্রণের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে তা বিশদবর্ণনা এই গবেষণার লক্ষ্য। প্রসঙ্গত গারো সম্প্রদায়ের বিভিন্ন অবস্থানে ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত ক্রিয়া কলাপ দেখা যায় সেখানে খ্রিষ্টধর্মের কী প্রভাব রয়েছে বা খ্রিষ্টধর্মের গুরুরা এগুলোকে কীভাবে দেখছেন তার একটি পুর্ণাঙ্গ চিত্র এই গবেষণার জন্য খুবই প্রাসঙ্গিক।

চতুর্থত: ইংরেজ শাসনামলে মিশনারি কর্মকাণ্ড খ্রিষ্টধর্মের প্রসারে কীভাবে বিভিন্ন অঞ্চলে তার ধর্ম বিস্তার করেছে তারই একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ অত্যাবশ্যকীয়। এর মধ্যে প্রধান বিষয়টি হচ্ছে, শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন ও ব্যাপক ভাবে নিরক্ষরতা দূরীকরণ। গারো অঞ্চলে কেন এবং কীভাবে এই শিক্ষা ব্যবস্থা এতো দ্রুত বিস্তৃতি লাভ করেছিল তা বর্তমান গবেষণায় উদঘাটনের চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, ব্রিটিশ আমলে বর্তমান বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে ক্যাথলিক

গোষ্ঠী ব্যাপকভাবে ধর্মপ্রচার করেছিলো। কিন্তু অন্যান্য সব অঞ্চল থেকে ধর্মপ্রচারের এই সফলতা গারো অঞ্চলে সর্বাধিক একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। বর্তমান গবেষণায় এর উপর বিশেষভাবে দৃষ্টি প্রদান করা হয়েছে।

সর্বশেষ মাত্রাটি হচ্ছে আচিক্ মান্দির ধর্মীয় বিকাশে সামাজিক পরিবর্তন নির্ধারণ অর্থাৎ আচিক্ মান্দি গোষ্ঠীর ধর্মবিশ্বাসে সিনক্রেটিক উপাদানসমূহকে চিহ্নিত করা প্রয়োজন। অন্যকথায়, খ্রিষ্টধর্মের প্রভাবে আচিক্ মান্দির পরিবার ও সামাজিক বিবর্তন কতটুকু ঘটেছে, আচিক্ মান্দি সমাজব্যবস্থায় উত্তরাধীকার প্রথার কী পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং আচিক্ মান্দিদের ধর্মবিশ্বাসের কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচেছ কী না তা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

১.৪। গবেষণা পদ্ধতি :

সিনক্রেটিজমের অনুশীলন তথা গবেষণাকে দু'টি মাত্রায় বিবেচনা করা যায়। প্রথমত: এর মাধ্যমে সমকালীন সমাজ বা গোষ্ঠীর মধ্যে ধর্মীয় প্রবণতার তীব্রতা হ্রাস এবং দ্বিতীয়ত: গতানুগতিক গির্জা বা উপাসনালয়ের সঙ্গে এর বিভিন্নমুখী পার্থক্য থাকার কারণে ধর্মীয় বহুমাত্রিকতার (Religious pluralism) সৃষ্টি। এই উভয় মাত্রার ভিত্তিতে সিনক্রেটিক উপদানসমূহ নির্ধারণের জন্য ধর্মের যে উপাদানসমূহ ব্যবহার করা প্রয়োজন তা হচ্ছে প্রথমত: বিশ্বাস বা অতীন্দ্রিয় অস্তিত্বের ধারনা। দ্বিতীয়টি হচ্ছে: ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান যা সাধারণত গির্জা ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে পরিলক্ষিত হয়। তৃতীয়ত: নৈতিকতা বা সামাজিকতা সম্পর্কিত বিধি-বিধান যা অনেক ক্ষেত্রেই গতানুগতিক ধারার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে থাকে; এবং চতুর্থত আধ্যাত্মিক কর্মকাণ্ড ব্যাখ্যা যা মূল ধর্মের সঙ্গে আঞ্চলিক ধর্মের যোগাযোগ সৃষ্টি করে থাকে।

আচিক্ মান্দি বা গারো সম্প্রদায়ের এই সিনক্রেটিক প্রবণতা বিশ্লেষণের জন্য বিভিন্ন গির্জার ভিত্তিতে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করার একটি প্রচেষ্টাও বর্তমান অভিসন্দর্ভের অন্যতম বিষয়। এই তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে উপরোক্ত চারটি উপাদানের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বর্তমান গবেষণায় তিনটি মাত্রায় তথ্য সংগ্রহের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে; প্রথমত: নৃবিজ্ঞানী পদ্ধতি অনুযায়ী আচিক্ মান্দি সম্প্রদায়ের সামাজিক তথা ধর্মীয় যাবতীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে। এ সংগ্রহের ক্ষেত্রে সরেজমিনে তথ্য সংগ্রহের বাইরেও অতীতের গবেষণা সমূহের উপরেও গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দের প্লেফেয়ার (Playfair) -এর গবেষণা থেকে শুরু করে অদ্যাবধি যত গবেষণা হয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিটেরেচার রিভিউ এর মধ্যে দেয়া হয়েছে। লক্ষণীয় এই সব গবেষণার প্রধানতম বিষয়কে নৃতাত্ত্বিক তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে খুবই মূল্যবান বলে মনে হয়েছে। পক্ষান্তরে সরেজমিনে গবেষণায় আচিক্ মান্দি গোষ্ঠীর পরিচয়, তাদের দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যসমূহের বর্ণনা, অঞ্চল ভিত্তিক পার্থক্যসমূহকে চিহ্নিত করা এবং অতীত ইতিহাসের চিত্র তুলে ধরার জন্যে ঐতিহাসিক পদ্ধতি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। দ্বিতীয়ত: খ্রিষ্টধর্মের প্রসার ও প্রচারে গির্জার ভূমিকা তথা ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাব বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন রয়েছে। এক্ষেত্রে যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে তাকে ঐতিহাসিক বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি বলে অভিহিত করা চলে। উল্লেখ্য, খ্রিষ্টধর্ম প্রচারকদের প্রকাশিত পর্যাপ্ত লেখা পাওয়া যায়, যা থেকে মোটামুটি খ্রিষ্টধর্ম কীভাবে এই আদিবাসী সমাজে বিস্তৃতি লাভ করলো তা সম্যকভাবে অবগত হওয়া যায়। তবে, এই সব আলোচনায় ইতিবাচক দিকেরই প্রাধান্য থাকে বলেই প্রকৃত সিনক্রেটিক প্রবণতার কোন চিত্র তেমনটি পাওয়া যায়না। অপরপক্ষে, কিছু সংখ্যক লেখা ও গবেষণার মধ্যে এর সমালোচনাও পাওয়া যায়। এ গবেষণায় উভয়দিকেরই গুরুত্ব প্রদানপূর্বক বাস্তব চিত্রটি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এই বাস্তব চিত্র তুলে ধরার প্রয়োজনে ধর্মীয় সিনক্রেটিক প্রবণতা উদঘাটনের জন্য দীর্ঘ প্রশ্নমালা তৈরি করা হয়েছে। এই প্রশ্নমালা তিনটি ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে সংগৃহিত হয়েছে। প্রথম পর্যায়টি হচ্ছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নরত গারোদের মধ্যে এই প্রশ্ন ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ; দ্বিতীয় ঢাকা শহরের উপকণ্ঠে বসবাসকারী কর্মরত বহুসংখ্যক নর-নারীর কাছে এই প্রশ্নমালার ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহ এবং তৃতীয়ত আচিক্ মান্দি গোষ্ঠীর একটি নির্দিষ্ট গ্রামের জনসমষ্টির তথ্য সংগ্রহ। এই তিনটি ভিন্ন পর্যায়ের তথ্যকে তুলনামূলক আলোচনার ফলে সংখ্যাতাত্ত্বিক একাধিক উপসংহারে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে প্রশ্নমালা ভিত্তিক পদ্ধতিটি সিনক্রেটিক বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ চিত্রটি তুলে ধরতে পারে বলে আমাদের বিশ্বাস।

বিশেষ করে, বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান এই দুয়ের পার্থক্যকে প্রশ্নমালার মাধ্যমে যথাযথভাবে উদঘাটনের ব্যবস্থা গ্রহণ অতীব প্রয়োজনীয় বলে মনে করা হয়েছে বলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিভিন্নমুখী প্রশ্নমালার মাধ্যমে রেসপন্ডেন্টের স্ব-বিরোধীতাকে উদ্ঘাটনের একটি প্রয়াস এই প্রশ্নমালার মধ্যে রয়েছে। তবে যে ক্ষেত্রে এই সিনক্রেটিক প্রবণতা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় তাকে পরিচ্ছন্নভাবে প্রকাশ করাই এই প্রশ্নমালার উদ্দেশ্য।

ব্যক্তি বা পরিবারের ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান অনুশীলনের ক্ষেত্রে যে প্রশ্নসমূহ যথাযথ বলে মনে করা হয়েছে তা গির্জার যাজকবৃন্দের ও পাদ্রীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। অতএব, দুই ধরণের প্রশ্নমালা প্রণয়ন করা হয়েছে; তবে এই দ্বিতীয় ধরণের প্রশ্নমালা বহুলাংশে অকাঠামোগত (Unstructured) ছিল যা শুধুমাত্র গির্জার জন্য প্রযোজ্য। এক্ষেত্রে প্রশ্নমালাকে গুরুত্ব না দিয়ে কেসস্টাডি পদ্ধতিকেই অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে (Hamel, Dufour and Fortin, 1993 : 45)।

বর্তমান অভিসন্দর্ভে গুণগত পদ্ধতির ভিত্তিতে বেশকিছু আলোচনা হয়েছে। গুণগত পদ্ধতি বর্ণনামূলক এবং প্রপঞ্চসমূহের ব্যাখ্যামূলক পর্যালোচনা করে থাকে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থারও বর্ণনা করা হয়ে থাকে। এই গুণগত পদ্ধতির একটি স্পষ্টিকরণেরও ভূমিকা রয়েছে অর্থাৎ অন্যকথায় এই পদ্ধতির মাধ্যমে পরিসংখ্যানমূলক তথ্যাদিরও ব্যাখ্যা দেয়া হয়। আমাদের এই গবেষণায় যেহেতু যথেষ্ট পরিমাণ পরিসংখ্যানমূলক তথ্যাদি রয়েছে অতএব এর গুণগত অবস্থানকে ব্যাখ্যা করার জন্যে গুণগত পদ্ধতির প্রয়োজন। বর্তমান গবেষণায় গুণগত পদ্ধতির কয়েকটি ধারাকে ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রথমত: ঐতিহাসিক ও সেকেন্ডারি সোর্স থেকে গৃহিত তথ্যাদি সংগৃহিত হয়েছে এবং তার ভিত্তিতে গারো তথা আচিক্ মান্দি সম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত তথ্য জানার চেষ্টা করা হয়েছে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের উপর আলোকপাত করার জন্যে বিভিন্ন পুস্তকাদি, গবেষণা তথ্য, আদমশুমারি, জার্নাল ও আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থাদির সহায়তা নেয়া হয়েছে।

দ্বিতীয়ত: এগনোগ্রাফিক তথ্য সংগ্রহের জন্যেই এই সকল ডকুমেন্টস এর সহায়তা নেয়া হয়েছে। গবেষণার উদ্দেশ্যকে ব্যাখ্যার করার জন্য গুণগত পদ্ধতির অন্যতম প্রকরণ বিশ্লেষণমূলক এগনোগ্রাফিক সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছে। বিশ্লেষণাত্মক এগনোগ্রাফিক সম্পর্কে Lofland (1996 : 30) বলেন, "এটি বিশেষ বিশেষ এলাকার জনসমষ্টি সম্পর্কে গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও নীবিড় পর্যালোচনা সুযোগ সৃষ্টি করে বা সামাজিক অবস্থানকে সম্যকভাবে তুলে ধরার সহায়ক হয়[২]।"

[২] It "presents analysis that is devoloped in the sense of being conceptullay eleborated, descriptively detailed and concept-deta interpreted"

তৃতীয়ত: প্রশ্নমালার ভিত্তিতে উপাত্তসমূহ সংগ্রহের পাশাপাশি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের চেষ্টা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে কেস স্টাডি পদ্ধতি[৩] ব্যবহার করা হয়েছে (McMillan et al., 2000 : 309)। বিশেষ করে গির্জার পাদ্রিদের মতামত সংগ্রহের জন্য (Unstructured Questionaire) ব্যবহার করা হয়েছে। অবশ্য এখানে বলা প্রয়োজন যে কেস স্টাডি পদ্ধতি ব্যপক ভাবে ব্যবহার করা হয়নি কেবল মাত্র কয়েক জন ধর্মযাজকের কাছ থেকে এ পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। লিখিত বিবরণ পরিশিষ্টে সংযোজিত হয়েছে। তবে এর আরেকটি উদ্দেশ্য পরিসংখ্যান পদ্ধতির মাধ্যমে যে তথ্য সংগৃহিত হয়েছে তা কতটুকু প্রণিধানযোগ্য তা বিচার করা।

পরিসংখ্যান পদ্ধতির দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। সামাজিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পরিসংখ্যান পদ্ধতির ব্যাপক প্রয়োগ হয়ে থাকে। বর্তমান গবেষণায় পরিসংখ্যান পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হয়েছে। কারণ, সিনক্রেটিক প্রবণতার মাধ্যমে উত্তরাধীকার সম্পর্কিত সামাজিক প্রথার পরিবর্তন, বৈবাহিক ও পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ক্ষমতার ভারসাম্যতায় বিবর্তন এবং বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে মূল খ্রিষ্টধর্ম থেকে পৃথকীকরণের চিত্রটি তুলে ধরা আবশ্যক। বর্তমান গবেষণায় প্রশ্নমালার ভিত্তিতে ব্যক্তির তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এই প্রশ্নসমূহ টেস্টিং ও প্রিটেস্টিং এর মাধ্যমে পরিশীলিত, পরিমার্জিত ও পূর্ণাঙ্গ রূপ প্রদান করা হয়েছে। প্রশ্নমালার নমুনা পরিশিষ্টে সংযোজিত হয়েছে।

গবেষণা পরিচালনাকালীন সময়ে তথ্য ও উপাত্ত বিশেষত প্রাথমিক তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের স্বার্থে সঠিক নমুনায়ন কৌশল নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গবেষকের কী ধরণের তথ্য প্রয়োজন এবং এসব তথ্য কাদের কাছ থেকে পাওয়া যেতে পারে তা গবেষককেই নিধার্রণ করতে হয়। এই গবেষণার নমুনা সংগ্রহের ক্ষেত্রেও গবেষক তার নিজস্ব বিচার-বিবেচনার ভিত্তিতে গারো জনগোষ্ঠীর সদস্যদের নির্বাচন করেছে যাদের কাছ থেকে সঠিক তথ্য পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই গবেষণায় গবেষকের সুবিধার্থে নমুনা সংগ্রহের/ বাছাইয়ের জন্য 'Convinience Sampling' কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে। নমুনাসমূহ বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি হিসেবে উক্ত বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর চিন্তা-চেতনা ও আচার সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করতে গবেষককে সাহায্য করে। গবেষণায় সাধারণত

[৩] A case study may be a program, an event or an activity bounded by time and place. It examines a case in detail by using multiple data technique from variety of sources.

একটি বৃহৎ গোষ্ঠীর থেকে একটি সীমিত সংখ্যক নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে উক্ত গোষ্ঠীর সম্পর্কে অর্থবহ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

আচিক্ মান্দিদের সিনক্রেটিজম প্রবণতা পর্যালোচনার জন্য অংশগ্রহণকারী হিসেবে মোট ১০০ জন উত্তরদাতাকে নমুনা হিসেবে নেয়া হয় যারা গবেষণার প্রশ্নমালার বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বাংলাদেশের তিনটি এলাকা (ময়মনসিংহের টাঙ্গনাপাড়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রী, এবং ঢাকার কালাচাঁদপুর) থেকে প্রায় সম অনুপাতে আচিক্ মান্দিদের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে (পরিশিষ্ট: সারণি- ০৩)। উত্তরদাতাদের সাক্ষাৎ গ্রহণের পূর্বে তাদেরকে এই গবেষণার উদ্দেশ্য বুঝিয়ে তাদের পরিচয় গোপন রাখা হবে এই শর্তে গবেষণা কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য যথাযথভাবে সম্মতিও নেয়া হয়েছে।

বর্তমান গবেষণার জন্য মাধ্যমিক ও প্রাথমিক উভয় উৎস হতে সংগৃহীত তথ্য উপযুক্ত পরিসংখ্যান পদ্ধতি অনুসরণ পূর্বক নিরীক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উপাত্ত সংহের পর প্রশ্নপত্র সমূহ প্রয়োজনীয় গণনা/ পরিমাপন সম্পাদনার জন্য সাংকেতীকরণের (Coding) মাধ্যমে কম্পিউটারে উপাত্ত প্রবেশ করিয়ে SPSS সফট্ওয়ার ব্যবহার করে উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই গবেষণাকর্মে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণের জন্য পরিসংখ্যানের যথাযথ পদ্ধতি যেমন: গণসংখ্যা নিবেশণ, শতকরা হার, দণ্ডচিত্র, পাইচার্ট, ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া পর্যবেক্ষিত ফলাফলের সাথে প্রত্যাশিত ফলাফলের পার্থক্য অর্থবহ ও তাৎপর্যপূর্ণ কিনা তা জানার জন্য কাই-স্কয়ার (Chi-Squire) বিশ্লেষণও করা হয়েছে (Kothari, 2004 : 233-250)। কেননা কাই-স্কয়ার পরীক্ষা একটি সংখ্যাতাত্ত্বিক পরীক্ষা– বৃহৎ নমুনা পদ্ধতি কিম্বা দ্বিপদী বা বহুপদী বিন্যাসের প্রত্যাশিত ফলাফলের সাথে পর্যবেক্ষিত ফলাফলের পার্থক্য অর্থবহ ও তাৎপর্যপূর্ণ কিনা তা জানার জন্য এই পরিসংখ্যানিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

সংগৃহীত তথ্য ও উপাত্তের বিশ্লেষণের ফলাফল পঞ্চম অধ্যায় থেকে শুরু করে ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে পরিবেশিত ও বিশ্লেষিত হয়েছে। অষ্টম অধ্যায়ে এর উপর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত তথ্যের তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এর ফলে প্রকৃত সিনক্রেটিক প্রবণতার সম্যক চিত্রটি পরিবেশিত হয়েছে বলে আশা করা যায়।

১.৫। গবেষণার কর্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

গারো সম্প্রদায় দীর্ঘদিন ঐতিহ্যগতভাবে যে সাংসারেক ধর্মটি পালন করে আসছে সে ধর্মের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আধ্যাত্মিকতা[৪]।

বর্তমানে গারোদের অধিকাংশই খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী। মূলতঃ ক্যাথলিক এবং ব্যাপ্টিস্ট এ দু'টো খ্রিষ্টিয় সম্প্রদায়ের মধ্যে তারা অন্তর্ভূক্ত। আধুনিক কালের বাংলাদেশের গারোদের মধ্যে অধিকাংশই ক্যাথলিক। আজকের গারোদের জীবনে যে বিষয়টি সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রভাব বিস্তার করছে তা হচ্ছে খ্রিষ্টধর্ম। খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়া সত্ত্বেও তারা তাদের কিছু মৌলিক ঐতিহ্য এবং সামাজিক রীতি ধরে রেখেছে, যেমন- তাদের ঐতিহ্যবাহী সামাজিক রীতিনীতি ও আইন এবং গোত্রপ্রথার প্রতিষ্ঠানিক নিয়মনীতির অনুসরণ। তাদের ঐতিহ্যবাহী উৎসব-পার্বন, নাচ-গান সবই এখন খ্রিষ্টধর্ম ও সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত। এমনকি ওয়ানগালা উৎসবও খ্রিষ্টধর্মে গারোদের ব্যাপকভাবে ধর্মান্তরের ফলে আগের তাৎপর্য হারিয়েছে। আমেরিকান ব্যাপটিস্ট সোসাইটি উনবিংশ শতকের প্রারম্ভে যখন গারো পাহাড়ে তাদের মিশন প্রতিষ্ঠা করে তখন থেকে তাদের ধর্মান্তর প্রক্রিয়া শুরু হয়। বর্তমানে অল্পকিছু গারো ছাড়া প্রায় সকলেই খ্রিষ্টান। খ্রিষ্টধর্মের প্রভাবে তাদের সমাজ জীবনের অনেক কিছু পরিবর্তন হয়েছে আবার অনেক সামাজিক মূল্যবোধ তারা আগের মতই অনুসরণ করছে। গারোরা তাদের সামাজিক জীবন ও লোকাচারকে কেবলমাত্র ব্যক্তিজীবনের অঙ্গ হিসেবেই মনে করে না, বরং এটিকে অলংঘনীয় জীবন বিধান হিসেবে মনে করে থাকে। সামাজিক মূল্যবোধ ও লোকাচারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ গারো সমাজের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। গারো নৃগোষ্ঠীর একজন সদস্য তার দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় এবং আচার-ব্যবহারে সম্পূর্ণভাবে গারো সমাজের নিকট দায়বদ্ধ থাকে বলে মনে করা হয়। ব্যক্তি হিসেবে একজন গারো তার ভালো কাজের জন্য সমাজের প্রশংসা পেতে পারে আবার খারাপ কাজের জন্য কৈফিয়তও প্রদান করতে হতে পারে। গারো সমাজের মাহারী ব্যক্তির মন্দ আচরণ সংশোধনের মাধ্যমে সামাজিক দায়িত্ব পালন করে।

[৪] প্লেফেয়ারের বর্ণনা অনুযায়ী: "Like all animistic religions, that of the Garos consists of the belief in a multitude of beneficent and malevolent spirits. To some is attributed the creation of the world, to others the control of natural phenomena; and the destinies of man from birth to death are governed by a host of divinities whose anger must be appeased by sacrifice, and whose good offices must be entreated in like manners" (Playfair, 1909 : 88).

গারোদের সামাজিক অনুভূতি অত্যন্ত গভীর। তারা তাদের সামাজিক জীবন ও লোকাচারকে কেবলমাত্র ব্যক্তি জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবেই মনে করেনা, বরং এটিকে অলংঘনীয় জীবন বিধান হিসেবে মনে করে থাকে। এই সামাজিক জীবনবোধ ও লোকাচারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের কারণেই অন্যান্য সমাজের সঙ্গে গারো সমাজের বিস্তর ব্যবধান। একজন গারো ব্যক্তিগতভাবে নিজেকে স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্ত্বার অধিকারী হিসেবে দাবী করতে পারেনা। সে পিতা হিসেবেই হোক বা মাতা হিসেবেই হোক, স্বামী হিসেবেই হোক অথবা স্ত্রী হিসেবেই হোক, পুত্র হিসেবেই হোক কিংবা কন্যা হিসেবেই হোক, সে তার দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় এবং আচার-আচরণে সার্বিকভাবে সমাজের নিকট দায়বদ্ধ। সে তার দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় সৎকাজের জন্য সমাজের নিকট হতে যেরূপ আনুকুল্য পেতে পারে, ঠিক তদ্রুপ মন্দ কাজের জন্য সমাজের নিকট কৈফিয়ত প্রদানের পাত্রও বটে এবং এক্ষেত্রে দেশের প্রচলিত আইন কানুনের সঙ্গেও কোনরকম আপোষের অবকাশ নেই।

গারোদের মধ্যে ব্যক্তির আচরণ ও স্বভাব-চরিত্রের ভিত্তিতে সামাজিক অলিখিত একটি শ্রেণিবিন্যাস ঘটে থাকে। সাধারণতঃ এই শ্রেণিগত পার্থক্য নানাবিধ বিশেষণের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়ে থাকে। এই বিশেষণগুলি গারো ভাষায় ব্যবহৃত হয়। যেমন- 'সন্তল' মানে নির্বিরোধী মানুষ অর্থাৎ এদের মাথা ঠাণ্ডা এবং এরা সহসা কারোর ক্ষতি করেনা। এরা সহযোগিতাপূর্ণ জীবনযাপনে আগ্রহী। আরেক ধরণের ব্যক্তি রয়েছে যাদেরকে 'ক্লাচাকগিজাগিপা' বলে অভিহত করা হয়, এরা অসহিষ্ণু। অন্যের মতামত শুনতে চায় না এবং অনেকটাই স্বেচ্ছাচারী জীবনযাপন করে থাকে। আবার 'আরাত গিফা' আরেক শ্রেণির মানুষ রয়েছে যারা কর্মবিমুখ এবং অন্যদের উপর নির্ভর করতে পছন্দ করে। এ ছাড়া আরও কিছু বিশেষণের প্রচলন রয়েছে যথা- চরিত্রহীন (খিসাং নাম্‌গিজাগিফা) বা চোর অথবা পরদব্য অপহরণকারী (জাক নাম্‌গিজাগিফা) (Jangcham, 2010 : 48-49)।

গারোদের উপিরউক্ত সামাজিক জীবনের বর্ণনা নৃতাত্ত্বিক গবেষণার সমৃদ্ধ উপাদান হিসেবে গণ্য। বস্তুতঃ সিনক্রেটিজমের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র আলোচনা প্রসঙ্গে এই বিষয়গুলো খুবই সহায়ক উপাদান হিসেবে গণ্য হয়। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীসমূহের মধ্যে গারোদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলো এতোই স্পষ্ট যে এখানে খ্রিষ্টধর্ম প্রসারের অন্যতম কারণ হিসেবেও এই বৈশিষ্ট্যগুলোর উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। বলা প্রয়োজন আচিক্ মান্দি গোষ্ঠীর ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠানের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখা যায় বাংলাদেশের অন্যান্য নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর তুলনায়

তাদের দীর্ঘ ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা সামাজিক মূল্যবোধের একটি অনন্যতা সৃষ্টি করেছে। এ বিষয়ে চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আচিক্ মান্দি গোষ্ঠীর মধ্যে খ্রিষ্টধর্মের বিশ্বাস মূলত: ইংরেজ শাসনামলে মিশনারি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বিস্তৃতি লাভ করেছিল। ইংরেজ শাসনামলে বিভিন্ন গির্জার মাধ্যমে যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছিল তা খ্রিষ্টধর্মকে এখানে অত্যন্ত জনপ্রিয় করে তুলেছিল সত্য, কিন্তু একই সঙ্গে খ্রিষ্টধর্মের আদিরূপের কিছুটা পরিবর্তন সাধন করেছিল। এতদঞ্চলে শিক্ষা ব্যবস্থায় যে ধারা প্রবর্তিত ছিল তার সঙ্গে সঙ্গতি রাখার প্রয়োজনেই গির্জা শিক্ষা ব্যবস্থায় এহেন সিনক্রেটিক প্রবণতাসমূহের প্রশ্রয় দিয়েছিল বলা চলে।

বর্তমান সময় আচিক্ মান্দি গোষ্ঠীর মধ্যে ধর্মবিশ্বাস একটি যৌগিক রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। এ যৌগিক রূপটি চিহ্নিতকরণ এবং আচার-অনুষ্ঠানের বিবর্তনের স্বরূপ নির্ধারণের প্রয়োজনে প্রশ্নমালার ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এই তথ্যের মধ্যে উত্তরাধিকার প্রথার বিবর্তন, গির্জার উপাসনা ধারার মধ্যে ভিন্নতা, সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে গির্জার পাদ্রিদের অংশগ্রহণ ও পারিবারিক তথা লিঙ্গ ভিত্তিক কর্তৃত্বের পরিবর্তন সংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্য উপাত্তের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়েছে।

উপরোক্ত প্রতিটি বিষয়েরই বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং সিনক্রেটিক চিত্রটি পরিচ্ছন্ন ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বাংলাদেশের নাগরিক সভ্যতা তথা বৃহত্তর রাজধানী ঢাকার সামাজিক জীবনের প্রভাবে যে পরিবর্তনসমূহ সাধিত হয়েছে তারও সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই গবেষণার অন্তর্ভূক্ত। মোটকথা, রোমান ক্যাথলিক মূল ধর্মের থেকে যে ভিন্নতা খুবই স্পষ্টভাবে দেখা যায় তা নিছক সাংসারিক ধর্মের আদিরূপের সঙ্গে যুক্ত কিনা তা বলা দুষ্কর। তবে নাগরিক জীবনের যে পরিবর্তন ঢাকায় অবস্থিত গারো সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় তা কতটুকু ধর্মীয় কারণে ঘটেছে এবং কতটুকু নাগরিকতার কারণে দেখা যাচ্ছে সেই বিচার বিশ্লেষণও এই গবেষণার অন্যতম বিষয়বস্তু।

২.১। সিনক্রেটিজমের বুৎপত্তিগত ও ভাষাগত তাৎপর্য :

সিনক্রেটিজম প্রত্যয়টি বিশ্বধর্মতত্ত্বে খুব একটা গুরুত্ব পায়নি। অথচ পৃথিবীর সকল ধর্মেই এর প্রভাব বর্তমান। সনাতন ধর্ম কী বা তার তাৎপর্য কতটুকু ধর্মতত্ত্ব (Theology) সে-বিষয় প্রচুর গবেষণা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে মাত্রারিক্ত বিতর্কেরও সৃষ্টি হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে বির্তকসমূহ ধর্মীয় সংঘাত সৃষ্টি করেছে। তুলনামূলক ধর্ম এই বিষয়টিকে বস্তুনিষ্ঠ বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়োজনে বিভিন্ন অঞ্চল বা গোষ্ঠী কীভাবে ধর্মের আদিরূপকে পরিবর্তন করেছে তা সিনক্রেটিক প্রত্যয়টির মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারে বলে মনে করা হয়। বর্তমান গবেষণায় এই প্রত্যয়টির তাৎপর্য প্রকাশ করার একটি প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে এবং ব্যবহারিক দিকের সঙ্গে এর সম্পৃক্ততাকে পরিচ্ছন্নরূপে প্রকাশ করার প্রয়োজনীয়তাও উল্লেখ করা হয়েছে। সিনক্রেটিজমের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় গবেষকগণ বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলে এর প্রভাব ও বিস্তৃতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন ধারার বর্ণনা করেছেন। এই ধারাগুলো সর্বক্ষেত্রেই যে এককভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে তা নয়, তবে তাত্ত্বিকেরা ক্ষেত্র বিশেষে কোন কোন মাত্রার বিশেষ গুরুত্ব প্রদানের কারণে সংজ্ঞারও বিভিন্নতা ঘটেছে। আমাদের আলোচনায় এই ভিন্ন ভিন্ন মাত্রাকে যেভাবে আমরা চিহ্নিত করতে পেরেছি তা হলো প্রথমত: সমন্বয়বাদী চেতনা, দ্বিতীয়ত: নেতিবাচক মনোভাব, তৃতীয়ত: সমতা ভিত্তিক সংমিশ্রণ, চতুর্থত: সাংস্কৃতিক অন্যন্যতা এবং পঞ্চমত: ঔপনিবেশিক সাংস্কৃতিক আগ্রাসন।

মানব সভ্যতার বিভিন্ন পর্যায়ে নানাবিধ ধর্মের উৎপত্তি ও বিকাশ সমাজের যেমন উন্নতি সাধন করেছে, তেমনি বিভেদও সৃষ্টি করেছে প্রচুর। কোন একটি নতুন ধর্মের আবির্ভাব শুধু পুরাতনের মাঝে দ্বন্দেরই সৃষ্টি করে না, অনেক সময় তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নতুন আঙ্গিকে প্রকাশ পায়। এবং সেক্ষেত্রে সমন্বিত রূপটি কখনো আঞ্চলিক আবার কখনো গোষ্ঠীগত ধারায় আত্মপ্রকাশ করে। এই সমন্বিত রূপটিকে ইংরেজিতে সিনক্রেটিজম (Syncretism) নামে তাত্ত্বিকেরা অভিহিত করেছেন। তবে সিনক্রেটিজম (Syncretism) শুধু ধর্মীয় পরিবর্তনের ক্ষেত্রেই যে ব্যবহৃত হচ্ছে তা নয়, ভাষা-বিজ্ঞানেও এর ব্যাপক ব্যবহার লক্ষণীয় (Berman, Brown, and Corbett, 2005 : 13)।

বাংলা পরিভাষায় সিনক্রেটিজমকে (Syncretism) কখনো কখনো সমন্বিত রূপ, আবার কখনো সংমিশ্রণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে প্রকৃতপক্ষে এর কোন সঠিক পরিভাষা অদ্যাবধি

নিরূপিত হয়নি। এ কারণেই আমরা ইংরেজি Syncretism শব্দটিই ব্যবহার করছি। তদুপরি Syncretism-এর বুৎপত্তিগত তাৎপর্য তথা ব্যবহারিক বৈচিত্র্যের কারণে এই প্রত্যয়টিকে ইংরেজিতে ব্যবহার করাটাই সঙ্গত বলে প্রতীয়মান হয়। Syncretism-এর ব্যবহার তুলনামূলক ধর্মের ক্ষেত্রে কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। বরঞ্চ অতি প্রাচীন কাল থেকে ধর্মের পারস্পরিক সম্পর্ক এই প্রত্যয়টি ব্যবহারের যৌক্তিকতাকে প্রতিপন্ন করে। বিভিন্ন ধর্মীয় ঐতিহ্য আবহমান কাল থেকে সংমিশ্রণের মাধ্যমে নতুন নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে এবং এখনো করে চলেছে। বস্তুত প্রত্যয়টির ব্যবহারে তাত্ত্বিকদের মধ্যে যে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয় তার মূল কারণ এই প্রত্যয়টির নিজস্ব ইতিহাস এবং বিভিন্ন সময় এর প্রয়োগ কিংবা অপপ্রয়োগ।

এই যথার্থ প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর পার্থক্য ও সামঞ্জস্য তুলে ধরতে গিয়ে হারস্কোভিট্স (Herskovits, 1941 : XXII) এই প্রত্যয়টিকে একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হাতিয়ার বলে মনে করেছেন এবং এর ভিত্তিতে মার্কিন মুল্লুকে কালো জনগোষ্ঠীর মধ্যে খ্রিষ্টধর্মের ও সংস্কৃতির প্রকৃত ও বিকৃত রূপকে বিশ্লেষণের একটি সচল অনুশীলনের পথ প্রদর্শন করেছেন। অপরপক্ষে ব্রিজিট মেয়ার (Brigit Mayer) তাঁর একটি প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে সমন্বয়ক ভূমিকা উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া যায় না বরঞ্চ স্থানীয় সংস্কৃতিই এই ধরনের একটি সঙ্কর সংস্কৃতি সৃষ্টি করে যা সিনক্রেটিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে অনেক বেশি কার্যকর (Mayer, 2005 : 45)। ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে বলা হয়ে থাকে প্রাচীন গ্রীসের ক্রিট দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গে এর সম্পৃক্ততা রয়েছে। গ্রীক-ক্রিটিয় বিভিন্ন গোত্রের পারস্পরিক হৃদ্যতা প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করে এই প্রত্যয়টির সৃষ্টি হয় বলে অনেকে মনে করেন।

অবশ্য অনেকে আবার ইংরেজি শব্দ Ideosyncracy বা অদ্ভূত ব্যক্তিত্ব সম্পন্নের সঙ্গে এর সম্পর্ক রয়েছে বলে মনে করেন। কেননা এই শব্দটিও গ্রীক ভাষা থেকে এসেছে। বোধ হয় এ কারণে সিনক্রেটিজম মর্যাদাহানিকর (Pejorative) অর্থে কখনো কখনো ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্লুটার্ক (৪৫-১২৫ খ্রিষ্টাব্দ) অবশ্য সিনক্রেটিজমকে ভ্রাতৃত্বমূলক সহমর্মিতা বলে যে উল্লেখ করেছেন তা ক্রিটবাসীদের ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত। তবে প্লুটার্কের এই ইতিবাচক ধারণাটি পরবর্তীকালে খুব বেশি একটা আলোচনায় আসেনি। একমাত্র রেনেসাঁ যুগে এসে এরাসমাস (১৪৬৯-১৫৩৬) খ্রিষ্টধর্মের সঙ্গে প্রাচীন দার্শনিক প্লেটো এবং অ্যারিস্টটলের ভাবধারার সংমিশ্রণকে এই বিশেষ মাত্রায় বিচার

করেছেন। তাঁর মতে, এর ফলে খ্রিষ্টধর্ম বরঞ্চ সমৃদ্ধই হয়েছে বিশেষভাবে, এই কারণে যে ধ্রুপদি চিন্তাধারা ধর্মীয় তত্ত্বকে আরো বলিষ্ঠরূপে প্রকাশ করার সুযোগ সৃষ্টি করেছে (Screech, 1980 : 30)। পরবর্তী সময়ে খ্রিষ্টিয় ষষ্টদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ও সপ্তদশ শতাব্দীতে এই প্রত্যয়টির ইতিবাচক দিকটির বিপর্যয় ঘটে।

এই সময়টিতে ইউরোপে প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে নানা ধরণের চিন্তাধারার বিকাশের ফলে বেশ কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী গির্জার আবির্ভাব ঘটেছিল। এরই মধ্যে কতিপয় প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মযাজক ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বীদের সমন্বয় সাধনেরও চেষ্টা করেছিলেন যা তীব্র প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছিল। এই বিতর্ককে সিনক্রেটিস্টিক বিতর্ক নামে আখ্যায়িত করা হয় এবং এটাকে মোটামুটিভাবে পরিহারযোগ্য ও নেতিবাচক প্রত্যয় হিসাবেই চিহ্নিত করা হয়। তবে কোন কোন তাত্ত্বিক আবার এটাকে একটি বিবর্তনমূলক সংস্কৃতি হিসেবে ব্যবহার করেছেন এবং খ্রিষ্টিয় একেশ্বরবাদকে এই মাত্রায় বিচার করে খ্রিষ্টধর্মের পূর্ববর্তী অবস্থানকে বিচার-বিশ্লেষণ করার একটি উপায় বলে তারা মনে করেছিলেন। অন্যকথায়, তাঁদের মূল প্রণোদনা ছিল সুদূর ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহের বিচার এবং দূরবর্তী ভৌগোলিক এলাকার ধর্মসমূহের নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ (Bryson, 1992 : 125)।

তুলনামূলক ধর্মের অনুশীলনের সিনক্রেটিজম প্রত্যয়টির ব্যবহার নানাবিধ বিতর্কের সৃষ্টি করেছে এবং একই সঙ্গে ধর্মের প্রপঞ্চবাদীরা (Phenomenologists) এটাকে সকল ধর্মেরই বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁদের মতে, নিষ্কলুষ (Pure) ধর্ম একটি অতিকথা মাত্র। তবে একথা অবশ্যই বলা চলে, যে কোনো ধর্মের স্বীকৃত মৌল বিশ্বাসকে যদি শাশ্বত বলে ধরা হয় তবে সেক্ষেত্রে এর পরিবর্তন বা সংযোজনকে বিকৃত রূপ বলে বা বিচ্যুতি বলে অভিহিত করা স্বাভাবিক। সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে, পৃথিবীর তাবৎ ধর্মই কোন না কোন ভাবে সিনক্রেটিক উপাদান গ্রহণ করেছে বা করতে বাধ্য হয়েছে (Veanderleen, 1938 : 609)।

নৃবিজ্ঞানে অবশ্য সিনক্রেটিজম প্রত্যয়টি বহুলাংশে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির সৃষ্টি করেছে। বিশেষ করে মার্কিন মুল্লুকে বিভিন্ন দেশ ও জাতি থেকে আগত প্রবাসীদের মহামিলনের ক্ষেত্রে ধর্মীয় তথা সংস্কৃতিগত একটি আত্তীকৃত অবস্থান (Melting Pot) সৃষ্টির মাধ্যমে নৃবিজ্ঞান মতাদর্শগত সমন্বয় সাধনে সক্ষম হয়েছিল। এক্ষেত্রে হেস্কোভিলো নামক একজন নৃবিজ্ঞানী যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য

উপস্থাপন করেছেন। তিনি সিনক্রেটিজমকে সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণের (Acculturation) অর্থাৎ বিভিন্ন সংস্কৃতির পারস্পরিক আদান-প্রদানের একটি বিশ্লেষণের উপায় হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তাঁর ভাষায়, "সিনক্রেটিজম প্রত্যয়টির ব্যবহার আমাকে বিশেষভাবে সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং তত্ত্ব নির্মাণে প্রভূত সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। একথা বর্তমানে স্পষ্ট যে, সাংস্কৃতিক পরিবর্তন যদি বিভিন্ন সংস্কৃতির পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় তবে সেটা বিভিন্ন ধর্মের সংস্কৃতি থাকে না এবং একটি নতুন বিন্যস্তরূপে তা' আবির্ভূত হয়। সেক্ষেত্রে যে বিষয়টি সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বলে প্রতীয়মান হয় তা হলো কতটুকু সমন্বয় সাধন ঘটেছে এবং এই সাংস্কৃতিক মিশ্রণ প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতা কী রকমভাবে অর্জিত হয়েছে" (Vanderleen, 1938 : 5)।

২.২। সিনক্রেটিজম ও সাংস্কৃতিক মিশ্রণ :

এখানে নৃবিজ্ঞানের এই সাংস্কৃতিক মিশ্রণ (Acculturation) প্রত্যয়টির সঙ্গে সিনক্রেটিজিমের তুলনামূলক বিশ্লেষণ বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। বস্তুত সাংস্কৃতিক মিশ্রণ (Acculturation) একটি প্রক্রিয়া, যা ক্রমান্বয়ে সংমিশ্রণের মাধ্যমে একটি বিশেষ উদ্দেশ্যের দিকে ধাবিত হয়। স্বভাবতই সেখানে উন্নত সংস্কৃতির আগ্রাসনে ক্রমান্বয়ে গতানুগতিক সংস্কৃতি তার স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলে। ধর্মের ক্ষেত্রেও এই প্রবণতা হয়তো কার্যকর হতে পারে তবে তাকে সিনক্রেটিজম বলা সঙ্গত নয়। হারস্কোভিট্স এই মতই পোষণ করেন যখন তিনি বলেন যে, সিনক্রেটিজমের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং স্বকীয়তাকে অক্ষুণ্ন রেখে যে বিশেষায়িত বিন্যাস পরিলক্ষিত হয় তার স্বরূপ উদ্ঘাটন।

প্রকৃত পক্ষে সিনক্রেটিজম প্রত্যয়টি যে বিতর্কের উদ্ভব ঘটিয়েছে তা মূলত খ্রিষ্টধর্মের বিশ্বব্যাপী প্রসারের একটি বিশেষ প্রতিক্রিয়ার অংশ। ইউরোপে খ্রিষ্টধর্মের সংস্কারমূলক মতবাদের প্রচার ও প্রসারের অনুষঙ্গ হিসেবেই আধুনিক সিনক্রেটিজমের সূত্রপাত ঘটেছিল। ১৬১৫ খ্রিষ্টাব্দে জার্মানীর হাইডেলবার্গের প্রখ্যাত ধর্মযাজক ডেভিড পেরিয়াস সমগ্র খ্রিষ্টিয় সম্প্রদায়কে খ্রিষ্টান বিরোধীদের প্রতিহত করার মানসে ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট উভয় সম্প্রদায়ের কাছে পবিত্র সিনক্রেটিজমের (Pious Syncretism) আহ্বান জানান। কিন্তু প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মাবলম্বীদের কোন অংশই এই আহ্বানে সাড়া দেয়নি। বরঞ্চ বেশির ভাগই এর কঠোর সমালোচনায় মুখর ছিলেন। এমনকি যারা একটু-আধটু সমর্থন করেছিলেন তাদেরকেও প্রতিহত করতে তাঁরা কার্পন্য করেননি

(Herbermann, 1913 : 21)। খ্রিষ্টধর্মের প্রচার ও প্রসারের একটি নতুন ধারা রেনেসাঁ পরবর্তীকালে এবং সংস্কার ও সংস্কারবিরোধী আন্দোলনের অব্যবহিত পরে (Reformation and Counter- reformation Movements) সম্পূর্ণ নতুন মাত্রায় বেগবান হয়েছে। ইউরোপীয়দের দ্বারা এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাতিন আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন এই প্রক্রিয়াকে নানাভাবে উজ্জীবিত করেছে। যেভাবে খ্রিষ্টধর্মের বিভিন্ন শাখা ঔপনিবেশিক শক্তির সহায়তায় ধর্মপ্রচার করে চলেছিল তাতে ধারণা করা হচ্ছিল যে, অচিরেই সমগ্র ঔপনিবেশিক এলাকায় প্রধান ধর্ম হিসেবে খ্রিষ্টধর্ম আবির্ভূত হবে।

বাস্তবে অবশ্য এতটা হয়নি, তার কারণ বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষ করে এশীয় ভূখণ্ডে গতানুগতিক ধর্মের প্রভাব ও প্রতিপত্তি এতই দৃঢ় ছিল যে খ্রিষ্টধর্ম কোনক্রমে প্রধান ধর্ম হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার সুযোগ পায়নি। পক্ষান্তরে, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকায় এর প্রসার যথেষ্ট পরিমাণে পরিলক্ষিত এবং সিনক্রেটিক প্রবণতা সে ক্ষেত্রে খুব স্পষ্ট। অন্য কথায়, পূর্ব-ঐতিহ্যসম্পন্ন অঞ্চলে খ্রিষ্টিয় মিশনারিদের অনুপ্রবেশ যতটা দুঃসাধ্য ছিল, আদিবাসী গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে ততটা দুঃসাধ্য ছিল না। ধর্মপ্রচার স্বভাবতই এ ক্ষেত্রে আদি-ধর্মের সঙ্গে সিনক্রেটিক উপাদান দ্বারা সমৃদ্ধ হতে পারে। প্রকৃত পক্ষে, বিশ্লেষণধর্মী অনুশীলনের ফলে এই সমন্বিত রূপের বিবিধ উপাদান এবং ব্যবহারিক রূপের পার্থক্য নিরূপণের মাধ্যমে সিনক্রেটিজম প্রত্যয়টির তাৎপর্য উপলব্ধি করা যায়।

ব্রিজিট মেয়ার (Brigit Mayer) একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধে আফ্রিকা মহাদেশে সিনক্রেটিজম প্রত্যয়টি ব্যবহারে প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেছেন। তবে সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণ (Acculturation) প্রক্রিয়ার সঙ্গে এর যোগাযোগকে তিনি বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর মতে, সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণ মতবাদের অনুষঙ্গ হিসেবে এই প্রত্যয়টি ব্যবহৃত হতে পারে কেননা এই প্রত্যয়টি শুধু ধর্মের পারস্পরিক সম্পর্ককে একরৈখিক মাত্রায় বিচার করে থাকে। এই রেখার একপ্রান্তে পাশ্চাত্য ধর্ম অর্থাৎ খ্রিষ্টধর্মের আধুনিক রূপ এবং অপর প্রান্তে রয়েছে গতানুগতিক জীবন ধারা তথা ধর্মবিশ্বাস। অষ্টাদশ শতাব্দীর থেকেই প্রটেস্ট্যান্ট ও ক্যাথলিক ধর্মপ্রচারকবৃন্দ ঔপনিবেশিক শাসকদের সহায়তায় তাঁদের প্রচার কার্য চালিয়েছিলেন। ধর্মপ্রচারের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক পার্থক্য যেভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাতে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, খ্রিষ্টিয় মিশনারিদের প্রচার কার্যে কলা-কৌশলেরও কিছুটা ভিন্নতা আনা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। যেমন গতানুগতিক ধর্ম ব্রিটিশ-ভারতে যে দৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত

করে ফেলেছিল তাতে করে খ্রিষ্টধর্ম প্রচার শুধু দুঃসাধ্যই ছিল না, ক্ষেত্র বিশেষে তা বিদ্রোহেরও সুত্রপাত ঘটিয়েছিল। এ ধরনের পরিস্থিতিতে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারকগণ শিক্ষা, স্বাস্থ্য বা এধরনের অন্যান্য জনহিতকর কাজে অধিকতর গুরুত্ব দেয়া শুরু করেছিলেন। এর ফলে তুলনামূলকভাবে পশ্চাৎপদ অঞ্চলসমূহে বিশেষ করে আদিবাসী গোত্রগুলোর মধ্যে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের ব্যাপকতা পরিলক্ষিত হয়।

এক্ষেত্রে আফ্রিকা মহাদেশের খ্রিষ্টধর্মের উভয় শাখারই বিস্তৃতি ঘটেছে বিচিত্র প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে। ব্রিজিট মেয়ার তার প্রবন্ধে আফ্রিকার একটি গোষ্ঠীর ধর্মান্তরের কিছু চিত্র তুলে ধরেছেন, যার ভিত্তিতে তিনি সিনক্রেটিজমের প্রকৃত তাৎপর্য ব্যাখ্যার প্রয়াস পেয়েছেন। প্রচার মাধ্যমের ভিত্তিতে মিশনারিদের কর্মকাণ্ডকে তিনি তিনটি ভিন্ন মাত্রায় বিচার করেছেন। প্রথমত: কমিউনিকেশন (Communication) বা মতবিনিময় যে ভাষায় সম্ভব হয় সেটাই প্রাথমিকভাবে সমন্বয়ের পদক্ষেপ রূপে গণ্য হতে পারে। সেখানে অবশ্যই উঁচু-নিচু বা দাতা-গ্রহীতার ভূমিকা বর্তমান। দ্বিতীয়ত: খ্রিষ্টিয় মিশনারিরা রাজপ্রতিনিধি হিসাবে গণ্য হন বলেই 'নেটিভদের' নিজস্ব ভাবধারার প্রভাব বা ধর্মবিশ্বাসের উপাদানসমূহ গৌণরূপ পরিগ্রহ করে। তৃতীয়ত : কমিউনিকেশন বা কথোপকথন এমনই একটি বিষয় যে প্রধান বক্তাকেও শ্রোতাদের কাছে বোধগম্য হওয়ার জন্য কিছু কিছু ছাড় দিতে হয়। এই ছাড় দেয়াটাকে Vernacularism বা দেশী ভাষায় রূপান্তর বলে অভিহিত করা যায় এবং এর মাধ্যমে ধর্মের সিনক্রেটিক মাত্রা ক্রমান্বয়ে পরিস্ফুট হয়ে উঠে (Mayer, 2005 : 45)।

খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষার মাধ্যমে এই মিশনারিরাও ভাষাগত দিক থেকে কিছু ভিন্নতর অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হন এবং তা ধর্মীয় আচার-আচরণেও কিছুটা পার্থক্য আনয়ন করে। বাস্তব গবেষণার অপ্রতুলতার কারণে এ চিত্রটি বহুলাংশে অপরিচ্ছন্ন থেকে যায়। এর ফলে গবেষকরা কেবল ধর্মান্তরিত গোষ্ঠী বা গোত্রেরই প্রাধান্য দিয়ে থাকেন এবং সেখানে মূল ধর্মের কতটুকু বিবর্তন বা বিকৃতি ঘটেছে তা তাঁরা দেখতে চেষ্টা করেন না। এমনকি একটা বিশেষ প্রভাব ধর্মপ্রচারকদের উপরেও পরিস্ফুট হয় যা গবেষণায় প্রায়শই উল্লেখ করা হয় না। ভাষাগত এই বিষয়টি বায়ারম্যান ও তাঁর সহযোগীবৃন্দ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন ও প্রয়োগের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করেছেন। বিশেষ করে ভাষাতত্ত্বে এর প্রয়োগ সর্বাধিক প্রণিধানযোগ্য বলে তিনি মত প্রকাশ করেছেন (Berman et al., 2005 : 4)।

ঊনবিংশ শতাব্দী থেকেই এই বিষয়টি নিয়ে তাত্ত্বিকদের গবেষণায় নানাবিধ উপসর্গ-বিষয়ক বৈশিষ্ট্যের দিক ফুটে উঠেছে; যেমনটি পট (Pott) ১৮৩৬ খ্রিষ্টাব্দে এবং কার্টিশ (Curtius) ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে বলেছেন। ভাষাতত্ত্বে এই মিশ্রণের প্রভাবকে তারা অন্তর্নিহিত কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করেছেন[১]।

কার্যকরণ প্রক্রিয়ায় এই বিভাজনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে ভাষাবিদগণ মনে করে থাকেন। তাই এটাকে মূলগত ক্রিয়াকলাপের স্পস্ট মাত্রায় বিচারের প্রয়োজনীয়তার কথা তাঁরা উল্লেখ করেছেন। পক্ষান্তরে, ধর্মের ক্ষেত্রে এই মিশ্রণের প্রভাবে সামাজিক ক্রিয়াকলাপের পার্থক্য তেমন কোন মৌলিক পরিবর্তন আনে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না এটা বিশ্বাসের সঙ্গে সংঘাতপূর্ণ হয়। বিভিন্ন গোত্র ও ধর্মগোষ্ঠী সম্পর্কিত গবেষণায় এটা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

Shaw and Stewart (2005 : 9) একটি উল্লেখযোগ্য আলোচনায় বলেন[২] যে, সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণের সঙ্গে ধর্মীয় সিনক্রেটিজমকে একই মাত্রায় বিচার করাকে গ্রহণযোগ্য মনে করেন না, তার মূল কারণ, সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণ কোন বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তবে অধুনা বিভিন্ন দেশে যে ধর্মীয় সিনক্রেটিক প্রকরণসূহ পরিলক্ষিত হয় তা সর্বত্র বিশ্বাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, সমকালীন জাপানের ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে নানাবিধ উপাদান পরিলক্ষিত হয়। এই উপাদানসমূহের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে খ্রিষ্টান ও বৌদ্ধ ধর্মের কতিপয় আচার-অনুষ্ঠান। কিন্তু মূল ধর্ম অর্থাৎ সিনতো ধর্মের প্রভাব ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। এতদসত্ত্বেও এই সংমিশ্রণকে সিনক্রেটিক বলে কখনোই অভিহিত করা হয়নি। এ প্রসঙ্গে কাজী নূরুল ইসলামের একটি প্রবন্ধের কিছু অংশের উদ্ধৃতি দেয়া যেতে পারে (Islam and Islam, 2002 : 113) ।

[১] "... Where it used to mean the diachronic collapse of originally distinct inflectional forms or through the merger of underlying function" (Berman et al., 2005 : 4).

[২] "...The term Syncretism should be limited to the domain of religious or ritual phenomena where elements of two different historical traditions interact of combine... while... Syncretism is (be) reserved for describing interactions in the sphere of religion, we must admit that it is only a provisional demarcation. Where religious observance is inseparable from other social practices, we lose the ability to differentiate syncretism from other sorts of cultural bricolage and hybridization."

"জাপানের মূল ধর্ম শিনতো ধর্ম। এই ধর্মকে বিচিত্র পোশাক পরা পুতুলের সাথে তুলনা করা যায়। জাপানে যখন বৌদ্ধ ধর্ম এলো এ ধর্ম তখন বৌদ্ধধর্মের শিক্ষা গ্রহণ করে বৌদ্ধ পোশাক পরলো। আবার যখন বিশেষ নৈতিকতার প্রয়োজন দেখা দিল তখন ঐ পোশাকের উপরই কনফুসিয়দের পোশাক চাপিয়ে দিল নির্দ্বিধায়, নিঃসংকোচে। জাপানে ঋষিতুল্য সম্রাট শতকু সপ্তম শতাব্দীর শুরুতে শিনতো ধর্ম, কনফুসিয় ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারীদের ভিতরকার সংঘাত নিরসনের লক্ষ্যে বলেছিলেন যে, ধর্ম যদি গাছ হয় তবে তার শিকড় ও কাণ্ড হলো শিনতো, শাখা-প্রশাখা হলো কনফুসিয়াসের শিক্ষা আর পাতা ও ফুল-ফল হলো গৌতম বুদ্ধের মধ্যপন্থা যা জাপানীদেরকে চূড়ান্ত লক্ষ্যে দিকে নিয়ে যায়। সমকালীন জাপানিদের ধর্মীয় আচারণ বিশ্লেষণ কররে দেখা যায় যে, প্রায় চৌদ্দশত বছর পরেও শতকুর প্রভাব আজও জাপানে বিদ্যমান। তবে শতকুর বিখ্যাত বাণীর সাথে আর কয়েকটি কথা সংযোজনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। তাহলো- পাতার বৈচিত্র্য ও ফুলের সৌরভ হলো খ্রিষ্টিয়। সমকালীন জাপানিরা যে হারে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মোহে পড়েছে এবং যেভাবে খ্রিষ্টান মিশনারীরা কঠোর পরিশ্রম করে চলেছে তাতে মনে হয় আর একশত বছর পরে আরও কিছু সংযোজনের প্রয়োজন হবে। তখন সম্ভবত বলতে হবে : জাপানিদের ধর্ম নামক গাছটির শিকড় ও কাণ্ড শিনতো, শাখা-প্রশাখা কনফুসীয়, পাতা ও ফুল-ফল বৌদ্ধ এবং ফুলের সুবাস আর ফলের বীজ খ্রিষ্টিয়।"

Koepping (2001 : 142) এ প্রসঙ্গে একটু ভিন্ন ধারায় জাপানি সংস্কৃতিকে বর্ণনা করেছেন; তিনি সিনক্রেটিজম-এর সঙ্গে আধুনিক জাপানি ঐতিহ্যের অনন্যতা বর্ণনা করেছেন[৩]। অনন্যতা সম্পর্কে জাপানবাসীদের বিশেষ মাত্রায় সচেতনতাকে নিহোনজিনরং বলে তারা গর্ব করে থাকে। ফলে তাদের সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণকেও তারা প্রায়শই অস্বীকার করে। কার্যত তারা সিনক্রেটিজমকে কখনই স্বীকার করতে পারেনি। উল্লেখ্য যে, জাপানি সংস্কৃতিতে ভিন্ন সংস্কৃতি ও ধর্মীয় আচরণের প্রতি সহনশীলতার ব্যাপক নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু তারা এই সমন্বিত রূপকে ভিন্নতর মূল্যবোধ বলে অভিহিত করে।

[৩] "The almost obsessive concern with the uniqueness of their culture, which finds its present-day expression in the newly coined term Nihonijinron (theories of Japaneseness), used in inside as well as outside discourse on Japanese culture."

Koepping (2001) -এর বক্তব্য[৪] থেকে এটা স্পষ্ট, জাপানের ক্ষেত্রে উচ্চ পর্যায়ের এমনকি সর্বসাধারণের মধ্যে সহনশীলতার যে নিদর্শন পাওয়া যায়, তা অবিকৃতভাবে কোনো বিদেশী মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত করে না। অপরপক্ষে আধুনিক চিন্তাবিদেরা মনে করেন সিনক্রেটিজম সহনশীল মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ। জাপানের ক্ষেত্রে এই সহনশীলতাটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন মূল্যবোধ সমন্বিত ধর্ম যথা-শিনতোবাদ, বৌদ্ধ ধর্ম এবং কনফুসীয় ধর্ম তাদের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবস্থান করেছে। কিন্তু খ্রিষ্টধর্মের প্রতি এর দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। কারণ ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক উপদল এই ধর্মীয় চেতনাকে রাজনৈতিক আধিপত্যের প্রয়োজনে ব্যবহার করেছিল (Koepping, 2001: 155)[৫]।

এখানে স্বভাবতই প্রশ্ন এসে যায়, অন্যান্য ধর্মসমূহ কেন এখানে ধর্মীয় সিনক্রেটিজম তৈরি করেনি? কারণ হিসেবে বলা যায়, অন্যান্য ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান সাংস্কৃতিক বিচ্ছুরণের প্রতিফলন বলেই এটাকে নৃবিজ্ঞানী পরিভাষায় acculturation বলে অভিহিত করা যায়। ধর্মের প্রধান উপাদানসমূহের মধ্যে বিশ্বাসের গুরুত্বই সর্বাধিক। দ্বিতীয় উপাদান অর্থাৎ আচার-অনুষ্ঠান স্বভাবতই সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু এই সংস্কৃতি সবসময় ধর্মের বাধ্যবাধকতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। যে সব ক্ষেত্রেই এই নিয়ন্ত্রণ সুস্পষ্ট এবং ধর্মীয় অনুশাসনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কেবলমাত্র সেক্ষেত্রে এই সিনক্রেটিক বাস্তবটি পরিলক্ষিত হয়। বিশ্বের প্রতিটি ধর্মই নৈতিকতাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে যা সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রধান বাহন বলে গণ্য হয়। তাই সিনক্রেটিক বাস্তবতা অনুধাবনে এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। বস্তুত এই অনুশাসনই ধর্মের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এর উপর বহুলাংশে নির্ভর করে সিনক্রেটিজম বিশ্বাসের সঙ্গে অপর দুটো উপাদান অর্থাৎ আচার-অনুষ্ঠান এবং নৈতিকতার সঙ্গে সমন্বিত হওয়া।

[৪] "What is of interest in this context is not so much to show that the new religious movements may be little but a reaction against the disorganizing effects of elite-directed modernization, but rather than their understanding of syncretism is not the same and that an insistence on uniqueness and a grounding of one's collective identity can be understood in diverse ways. The examples also show that the whole notion, still prevalent in modern Japan, that Japanese culture is unique because it is tolerant of different value systems has to be scrutinized."

[৫] "While there can be no doubt that centuries later the three value systems of Shinto, Buddhism and Confucianism coexisted by ruling different spheres of life, the initial reaction was quite the opposite, for diverse political factions used religions as weapons in the contest for supremacy."

ধর্মের ক্ষেত্রে সিনক্রেটিক প্রবণতা বিশ্লেষণের জন্য ধর্মের সামাজিক দিকসমূহের সম্যক বিশ্লেষণ প্রয়োজন। McGurie এ প্রসঙ্গে চারটি ভিন্ন মাত্রার কথা উল্লেখ করেছেন। এই মাত্রাগুলো হলো যথাক্রমে বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান, ধর্মীয় অভিজ্ঞতা কৌম বা সংহতি (McGurie, 1997 : 20)। যে বিষয়গুলো McGurie-র বিশ্লেষণে প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজমান তা হচ্ছে ধর্মীয় মূল্যবোধ বা নৈতিকতা এবং আধ্যাত্মিকতা। বস্তুত এই দিকসমূহের গুরুত্ব সিনক্রেটিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে অনুধাবনের প্রয়োজন এই কারণে যে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তা অপরিহার্য বলে অনুভূত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, বাংলাদেশের ধর্মীয় সিনক্রেটিজম সম্পর্কিত অসীম রায়ের একটি মূল্যবান গবেষণা ভিন্নতর এই উপাদানের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। অসীম রায়ের গবেষণা পুস্তক *'The Islamic Syncretistic Tradition in Bengal'* এই বিশেষ এলাকায় গুরুত্বপূর্ণ প্রামাণ্য গ্রন্থ বলে গণ্য হয়। মূলত, তিনি এই অঞ্চলে আধ্যাত্মবাদের প্রভাব ও বিকাশের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ও ইসলামিক ভাবধারায় সমন্বিত ধর্মীয় আধ্যাত্মিক বিষয়ের উপর গুরুত্ব প্রদান করেছেন।

অসীম রায় তার এই গবেষণা পুস্তকে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত পুথি-সাহিত্য ও প্রবাদসমূহের অসংখ্য উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদের মুল্যবান পুথি সংগ্রহ থেকে অসংখ্য প্রবাদ এবং কাহিনীর ব্যাখ্যা-বর্ণনা দিয়ে তিনি বঙ্গীয়-ইসলামিক ভাবধারার মধ্যে সিনক্রেটিক প্রবণতাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন (Roy, 1983 : 8-10)। একই সঙ্গে তিনি বাংলাদেশে তথা উপমহাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অসংখ্য ইসলাম ধর্মপ্রচারকের প্রচারকর্মের ঘটনাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। বস্তুত: তিনি এই অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রসারের পিছনে এই ধর্মপ্রচারক বা পীরদের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে সমন্বয়বাদীদের চিত্র তুলে ধরেছেন। ফলে এ ক্ষেত্রে এতদ্বেশীয় অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে ইসলাম ধর্মের অধ্যাত্মবাদের সংমিশ্রণকে তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। এক কথায় বলা যায়, অসীম রায় সিনক্রেটিজম-এর নির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা প্রদান করেননি বা প্রদান করার চেষ্টা করেননি, যার ফলে ক্ষেত্রবিশেষে তার পর্যালোচনায় সিনক্রেটিজম-এর সঙ্গে acculturation-র পার্থক্য নির্ণয় করা দুরূহ হয়ে যায়। অসীম রায় যে সিনক্রেটিক ধারণাটি তার গবেষণায় উল্লেখ করেছেন তা প্রকৃত পক্ষে হিন্দু-মুসলমান উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য; কেননা সত্য পীর বা বাউল বিশ্বাস উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কম-বেশি প্রতিভাত হয়। তাই সমাজবিজ্ঞানী দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে, অসীম রায়ের সিনক্রেটিজিমের ব্যাখ্যাটি সমতাভিত্তিক। তবে তার গবেষণার

শিরোনামের সীমাবদ্ধতার কারণে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে এই প্রভাবটি কতখানি তা দেখা সম্ভব হয়নি।

সিনক্রেটিজম ধারণাটি নৃবিজ্ঞানের সঙ্গে অনেকটি সাংঘর্ষিকও বটে। নৃবিজ্ঞানের আলোচনায় সিনক্রেটিজম-এর সমান্তরালে বিভিন্ন ভাষাভাষীদের সংমিশ্রণ (Creolizing)-কে গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। এ কারণে নৃবিজ্ঞানীর অনুশীলন সিনক্রেটিক বিশ্লেষণের অনুকুল নয়। এ প্রসঙ্গে Shaw and Stuart (2005 : 20) -এর বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য[৬]।

নৃবিজ্ঞানের ধারণার সঙ্গে সমাজবিজ্ঞানের ধারণার একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। সমাজবিজ্ঞান যেখানে ধর্মকে একটি মৌলিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিচার করেছে এবং প্রতিটি সামাজিক ক্রিয়াকর্মে এর ভূমিকাকে সুনির্দিষ্ট কতগুলো উপাদানের ভিত্তিতে বিচার বিশ্লেষণ করেছে, সেখানে নৃ-বিজ্ঞান ধর্মের শুধু ব্যবহারিক বা আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কিত বিষয়কে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে।

সিনক্রেটিজমের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার প্রধান দিকসমূহ নির্দেশনায় এর ব্যুৎপত্তিগত ও ব্যবহারিক দিকসমূহ পর্যালোচনা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি ধর্মের ব্যাখ্যা-বর্ণনার ক্ষেত্রে এর উপযোগিতা নির্ণয় করাও সমধিক বাঞ্ছনীয়। এ কথা অনস্বীকার্য যে প্রতিটি ধর্মই কোন না কোন সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বিকশিত হয় এবং সেই পরিমণ্ডল ধর্মের আদিরূপকে বিভিন্নভাবে বৈচিত্র্যময় করে তোলে। সাংস্কৃতিক বিকাশকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে সমাজবিজ্ঞানীরা প্রায়শই ধর্মীয় সমাজবিজ্ঞানের এক বা একাধিক উপাদানের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ধ্রুপদী তাত্ত্বিকদের মধ্যে এই প্রবণতাটি বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। যেমন মার্ক্স আচার-অনুষ্ঠানের উপর, ওয়েবার নৈতিকতা ও ধর্মবিশ্বাসের উপর এবং ডুর্খীম সম্প্রদায়বদ্ধতার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।

বর্তমানে ধর্মের সমাজবিজ্ঞানে যে গবেষণাসমূহ গুরুত্ব অর্জন করেছে সেখানে এই সবকটি উপাদানই কোনো না কোনো ভাবে প্রাধান্য পাচ্ছে। এক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি উপাদানের বিষয় গবেষকরা উল্লেখ করেছেন- তার মধ্যে বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান, নৈতিক মূল্যবোধ ও আধ্যাত্মবাদ

[৬] "Anthropology itself is both a syncretizing and creolizing discourse (as the translation and/or invention of culture) and a discourse about syncretism... 'Invention of culture' writings have demonstrated the strong political significance of syncretism and hybridization in their emphasis on the challenge that such reconstruction poses to essentialized colonial representations at Western modernist forms of consciousness in general."

সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। সিনক্রেটিক উপাদানের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ধর্মের এই দিকসমূহের পৃথক পৃথক অনুশীলন প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। বলা প্রয়োজন, বর্তমানেও গবেষকদের দৃষ্টিকোণ, প্রবণতা এবং মতাদর্শের কারণে কোনো না কোনো বিষয় অধিক গুরুত্ব পায়। সিনক্রেটিক বিশ্লেষণে এই উপাদানসমূহের সমমাত্রায় গুরুত্ব দেওয়া খুবই প্রয়োজন। কারণ কোন একটি মাত্রার অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়ার ফলে সামগ্রিক বিশ্লেষণের বিপর্যয় ঘটার সমূহ সম্ভবনা থাকে।

২.৩। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ও ধর্মে সিনক্রেটিজমের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র :

সিনক্রেটিজম সম্পর্কে যথার্থ ধারণা লাভ করার জন্য দুটি ভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের যে অঞ্চলে সমাবেশ ঘটে সে স্থান পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করা দরকার। সঠিকভাবে অনুসন্ধান করলে আমরা দেখতে সক্ষম হবো যে ধরনের মিশ্রণকে 'সিনক্রেটিজম' বলে অভিহিত করা যায় তা ধর্মীয় বাণীর অনুবাদের প্রক্রিয়ার ব্যবহারিক ফলাফল হতে পারে বা নতুন সাংস্কৃতিক পরিবেশে অমঙ্গল বা শয়তানের স্বরূপ ব্যাখ্যার ফলাফল হতে পারে। এ দু'টিরই দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই ঈউ প্রোটেস্টান্ট ধর্মে (Local Ewe Protestantism) এবং প্রোটেস্টান্ট ধর্মের আফ্রিকার রূপ প্রদানে (Africanized)। 'আফরিকানাইজেশন' (Africanized) বলতে এখানে আফ্রিকার ঐতিহ্যবাহী ধারণা ও খ্রিষ্ট ধর্মীয় তত্ত্বের সমন্বয়কে বুঝানো হয়েছে (A Theologically Devised Synthesis of Traditional and Christian Elements) পশ্চিম আফ্রিকার একটি নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী বা ভাষাগোষ্ঠী ঈউ নামে পরিচিত। ঈউ গোষ্ঠীর সদস্যরা টগো এবং দক্ষিণ-পূর্ব ঘানায় বসবাস করে এবং ঈউ ভাষাটি মূলতঃ নাইজার-কঙ্গো ভাষা (Niger-Congo Language)। ব্রিজিত মেয়ার ঈউ গোষ্ঠীর মধ্যে ইভানজেলিকাল প্রেসবাইটেরিয়ান চার্চের (Evangelical Presbyterian Church or EPC) মিশনারি প্রচারের ক্ষেত্রে খ্রিষ্ট ধর্মীয় ধারণা নতুন সাংস্কৃতিক পরিবেশে যথার্থভাবে বুঝাতে গিয়ে সিনক্রেটিজমের উদ্ভব হয়েছে কিনা সেটিই উদঘাটন করতে চেষ্টা করেছেন। মিশনারিদের সাথে আফ্রিকার স্থানীয় বাসিন্দাদের কথোপকথন বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করেছেন। প্রথমত, ঈউ গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে যখন মিশনারি কর্মীরা খ্রিষ্ট ধর্মীয় ধারণা ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করে তখন মূলতঃ মিশনারি কর্মীদের ধারণা ঈউ গোষ্ঠীর সদস্যকে বুঝাতে হয় এবং এই বুঝানো বা বোধগম্য করার মাধ্যম হল তাদের কথোপকথন। দ্বিতীয়ত, মিশন অনুবাদের উপর নির্ভরশীল। মিশনারিদের বক্তব্য বোধগম্য করার জন্য তাদের প্রচলিত শব্দগুলোর

ব্যবহার করা হয় সেগুলো এমন কিছু ধারণার সৃষ্টি করে যা তারা সম্ভবতঃ পরিবর্তন করতে চায়। সুতরাং এটি ধরে নেওয়া যৌক্তিক যে, খ্রিষ্ট ধর্মীয় বাণী স্থানীয়দের মাতৃভাষায় প্রকাশের মাধ্যমে অর্থের পরিবর্তন ঘটেছে। 'সিনক্রেটিজম' -এর প্রশ্নে এই বিষয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিচার্য বিষয় হতে পারে। এক্ষেত্রে তৃতীয় বিচার্য বিষয় অশুভ শক্তি বা শয়তানের স্বরূপ ব্যাখ্যা (Diabolization)। 'সিনক্রেটিক' প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে শয়তানের ব্যাখ্যাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। খ্রিষ্ট ধর্মীয় মিশনারিগণ ঈউ গোষ্ঠীর সদস্যদের ধর্মান্তরে অনুপ্রাণিত করতে গিয়ে তাদের প্রচলিত ধর্মের ঈশ্বর 'মায়ু' (Mawu) শব্দটি ব্যবহার করে। তবে এই অনুবাদ সমস্যাপূর্ণ ছিল না তা নয়। কেননা ঈউ গোষ্ঠীর প্রাক-খ্রিষ্টান ধর্মে মায়ু মানুষের সৃষ্টিকর্তা হলেও মানুষের ভালো-মন্দের সাথে সম্পর্ক নেই এবং মায়ুকে দূরবর্তী ঈশ্বর বলে ধরে নেওয়া হয়। বরং মানুষের বিভিন্ন দিকের কল্যাণের জন্য আলাদা আলদা দেব-দেবী আছে–ভূমির দেবী মায়ু সোভজা, বজ্রের দেবতা মায়ু সোগবেল, ধনের দেবতা মায়ু সউলুই। মানুষের সুস্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, সাফল্যের জন্য প্রার্থনা করতে হয় বিভিন্ন থ্রয়ুর (Trow) কাছে। আসলে থ্রয়ু মানুষ ও মায়ুর মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম। এ কারণে হয়তো মিশনারিগণ যীশু খ্রিষ্টের ধারণা তাদের বুঝানেরা জন্য থ্রয়ু শব্দটি ব্যবহার করেছেন। অন্যদিকে মায়ু ব্যতীত ঈউ গোষ্ঠীর মাতৃভাষায় প্রচলিত সকল দেবতা ও অশরিরী শক্তিকে মিশনারিগণ শয়তান বা অশুভ শক্তি হিসেবে অনুবাদ করেছে। এভাবে অনুবাদ করতে গিয়ে প্রকৃতপক্ষে ঈউদের প্রাক-খ্রিষ্টান ধর্মের সমস্ত দেব-দেবী ও অন্যান্য অশরিরী সত্ত্বা ঈউ প্রোটেস্টান্ট ধর্মের অংশে পরিণত হয়েছে (Meyer, 1994 : 59)। এভাবে ঈউ গোষ্ঠীর মাতৃভাষায় শয়তানের স্বরূপ ব্যাখ্যার ফলশ্রুতিতে ঈউ প্রোটেস্টান্ট ধর্মের মধ্যে পুরাতন ও নতুন ধর্মের সমন্বয়ের মাধ্যমে এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।

Mayer (1990, 1992) -এর বক্তব্য[৭] থেকে এটি অনুমান করা অযৌক্তিক নয়, আফ্রিকার অন্যান্য অঞ্চলে খ্রিষ্টধর্মের অন্যান্য শাখার মিশনারিগণও একই পদ্ধতিতে স্থানীয়দের প্রচলিত ধর্মের দেব-দেবীকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করেছে যে খ্রিষ্টধর্মের শয়তান হল তাদের পূর্ববর্তী ধর্মের এসব সত্ত্বার নেতা। এ প্রক্রিয়ায় শয়তানের ব্যাখ্যা করার রীতি হয়তো সমগ্র বিশ্বেই বহু স্থানে, বহুবার ঘটেছে এবং একইসাথে খ্রিষ্টধর্মের সাথে প্রাক খ্রিষ্টধর্মের কোন ধারণার মিশ্রণ ঘটেছে (দৃষ্টান্ত স্বরূপ,

[৭] "The result of the diazotization was that these spiritual beings were considered to have a real existence as demons under the auspices of the Devil through the Devil the spiritual beings of the old religion became part of Ewe Protestantism."

Ingham, 1986 : 103ff.; Pina-Cabral, 1992; Schneider, 1990; Tausig, 1980 : 169ff)। ব্রিজিত মেয়ারের বক্তব্য[৮] এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য (Meyer, 1994 : 59-60) ।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে, খ্রিষ্টধর্ম স্থানীয়দের উপযোগী করে প্রচারের জন্য অনুবাদ এবং শয়তানের স্বরূপ ব্যাখ্যা (Diabotization) যদি করা হয়ে থাকে তাহলে ধর্মান্তরিত খ্রিষ্টানদের চিন্তা-ধারণার উপর মিশনারিদের নিয়ন্ত্রণ যা মনে করা হয় তার চেয়ে সীমিত বলে ধরে নিতে হবে। সুতরাং আফ্রিকার তৃণমূল পর্যায়ের মিশনারি কর্মীদের উচ্চতর পর্যায়ের ধর্মতাত্ত্বিকদের আফ্রিকার উপযোগী করে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের নীতির (Africanization) কোন প্রয়োজন নেই; তারা তাদের নিজস্ব প্রক্রিয়ায় নিজেদের সুবিধা অনুসারে এর আগেই খ্রিষ্টধর্ম ও সনাতনী ধর্মের সমন্বয় সাধন করেছে (Meyer, 1994 : 60)।

দক্ষিণ আফ্রিকায় সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণ এবং সিনক্রেটিজম এড়ানোর জন্য রাজনৈতিকভাবে ভিন্ন ভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীকে পৃথিকীকরণের চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু তা সফল হয়নি। খ্রিষ্ট ধর্মীয় ইভানজেলিজমও (Christian Evangelism) সংস্কৃতিক সংমিশ্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এ ধরনের সংমিশ্রণের প্রবণতা খ্রিষ্ট ধর্মীয় বিভিন্ন শাখার ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা গিয়েছে। তবে আফ্রিকার স্বতন্ত্র চার্চগুলোকে আফ্রিকার আদিবাসী ধর্ম ও খ্রিষ্টধর্মের সমন্বয়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। আফ্রিকার খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীদের মধ্যে প্রায় ত্রিশ শতাংশ আফ্রিকার স্বতন্ত্র চার্চগুলোর (Independent African Churches) অনুসারী। এই চার্চগুলোর মধ্যে ধর্মীয় কর্মকাণ্ড ও প্রার্থনার ক্ষেত্রে অনেক ভিন্নতা থাকলে ও তাদের মধ্যে দু'টি চার্চ প্রধান । এর একটি হচ্ছে ইথিওপিয়ান চার্চসমূহ এবং অন্যটি হচ্ছে জায়োনিস্ট চার্চ (Zionists)। জায়োনিস্ট চার্চগুলোর অনুসারীর সংখ্যা অনেক বেশী এবং তাদের মধ্যে অনেকেই দরিদ্র এবং অশিক্ষিত জনগোষ্ঠী। খ্রিষ্ট ধর্মীয় জায়োনিস্ট চার্চের অনুসারী দক্ষিণ আফ্রিকার জুলু জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় কর্মকাণ্ড সিনক্রেটিজমের দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রণিধানযোগ্য বলে অনেকে মনে করেন। জুলু জায়োনিজম ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন লি রক্স (Le Roux) নামক এক খ্রিষ্টধর্ম প্রচারক এবং বর্তমানের এর অনুসারীর সংখ্যা প্রায় ১৫ থেকে ১৮ মিলিয়ন। জলু জায়োনিজমকে অনেক সময়ই আফ্রিকার সনাতনী

[৮] "Indeed, Psalm: 95:5, which states The gods of the pagans are demons' became a key text for the early church fathers, who in order to construct a coherent image of the Devil, synthesized the scattered biblical fragments."

ধর্ম ও খ্রিষ্টধর্মের একটি সমন্বয় বলে মনে কর হয়। সুনকলার (Sundkler, 1976) জুলু জায়েনিজমকে সর্বপ্রাণবাদ বলে মনে করেন এবং একে বর্বরতা বলে সমালোচনাও করেন (Sundkler, 1976 : 397)। অন্যদিকে জিম কিয়েরনান তার গবেষণা প্রবন্ধে মত প্রকাশ করেন যে, জুলু জায়োনিস্টরা যথার্থই খ্রিষ্টান ধ্যান-ধারণার অনুসারী এবং তারা তাদের ধর্মীয় ঐতিহ্যকে বিশুদ্ধভাবে অনুসরণ করতেও অত্যন্ত সচেতন (Kiernan, 1994 : 77)।

৩.১। বাংলাদেশের নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি ক্ষুদ্র দেশ। আয়তনের তুলনায় এ দেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য অতুলনীয়। একই রকম বিচিত্র এ দেশের মানুষের মানুষের সংস্কৃতি ও ধর্মীয় ঐতিহ্য। পৃথিবীর খুব কম দেশেই এত ক্ষুদ্র পরিসরে এত বিচিত্র সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর সমাহার দেখা যায়। বাংলাদেশের অধিকাংশ অধিবাসী বাঙালি। এই বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি রয়েছে বহু ক্ষুদ্র নৃতাত্তিক গোষ্ঠী, যারা সাধারণভাবে উপজাতি বলে পরিচিত। এছাড়াও বাংলাদেশে পৃথিবীর চারটি প্রধান ধর্মের অনুসারীগণ বসবাস করায় এ দেশ ধর্মীয় বৈচিত্র্যে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। পশ্চিমা বিভিন্ন দেশে অভিবাসীদের আগমনের ফলে বর্তমানে সেসব দেশে বিচিত্র ধর্মের অনুসারী দেখা যায়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি ভিন্ন। ইসলামধর্ম, হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম ও খ্রিষ্টধর্ম– প্রতিটি ধর্মই এদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত। বর্তমান আলোচনায় মূলত বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীগুলোর ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হয়েছে।

সাধারণত: যেকোন আদিবাসী গোষ্ঠীর কিছু স্বকীয় বৈশিষ্ট্য থাকে। যে কারণে তাদের অন্যান্যদের থেকে পৃথক করা যায়। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বেশ অনেকগুলো আদিবাসী বা উপজাতি গোষ্ঠী বাস করছে, যদিও আদিবাসী গোষ্ঠীর মোট সংখ্যা প্রায় এক মিলিয়ন। অর্থাৎ দেশের মোট জনসংখ্যার তুলনায় শতকরা ১ ভাগেরও কম হচ্ছে আদিবাসী জনসংখ্যা। তা সত্ত্বেও বাংলাদেশে প্রায় ৪৫টি আদিবাসী গোষ্ঠী দেখা যায় এবং তাদের মধ্যে প্রায় ২৬টি ভিন্ন ভিন্ন ভাষা গোষ্ঠী পরিলক্ষিত হয়। অধিকাংশ আদিবাসী গোষ্ঠীর সদস্য নৃতাত্ত্বিক বিচারে সিনো তিব্বতীয় গোষ্ঠীর বলে অনেকেই মনে করেন। এসব আদিবাসী গোষ্ঠীর কেবল ভাষা, পোশাক ও খাদ্যাভ্যাসই ভিন্ন নয় বরং তাদের রয়েছে জন্ম, মৃত্য ও বিবাহ সম্পর্কে নিজস্ব রীতিনীতি, নিজস্ব প্রশাসনিক ও সামাজিক ব্যবস্থা এবং অন্যান্য সামাজিক প্রথা ও আচার অনুষ্ঠান।

এসব আদিবাসী গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক আরেকটি আকর্ষণীয় দিক তাদের ধর্মবিশ্বাস। ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যভাগে দেখা গিয়েছে আদিবাসী গোষ্ঠীর জনগণের শতকরা প্রায় ৪৪ ভাগ বৌদ্ধধর্মাবলাম্বী, ২৪ ভাগ হিন্দুধর্মাবলাম্বী, ১৩ ভাগ খ্রিষ্টধর্মাবলাম্বী এবং ১৯ ভাগ অন্যান্য ধর্মবিশ্বাসী। এই সংখ্যা অবশ্য বর্তমানে অনেকটাই পরিবর্তিত হয়েছে। প্রায় প্রতিটি আদিবাসী গোষ্ঠীরই নিজস্ব ধর্ম রয়েছে যা ক্ষেত্রবিশেষে বিলুপ্ত প্রায়। প্রায় বিলুপ্ত বা পরিবর্তিত হলেও তাদের

নিজ নিজ আদি ধর্মের প্রভাব তাদের সমাজ ও সংস্কৃতিতে এখনও বিদ্যমান। বস্তুত আদিবাসী ধর্ম, সমাজব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ছিল ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। একটি থেকে অন্যটিকে অনেক ক্ষেত্রে পৃথক করা যেত না। যেমন– যেসব আদিবাসী গোষ্ঠীর মূল পেশা ছিল কৃষিকাজ বা জুমচাষ তাদের ধর্মীয় রীতিনীতি, আচার অনুষ্ঠান, ধর্মীয় উৎসব এমনকি নাচ-গান সবই ছিল কৃষিকাজের সাথে সম্পর্কিত। বর্তমানে যান্ত্রিক সভ্যতা, ভিন্ন ভিন্ন বিশ্বধর্মে ধর্মান্তর ও নানা কারণে আদিবাসী গোষ্ঠীগুলোর নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কৃতি অনেকটাই হারিয়ে যাচ্ছে।

৩.১.১। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের আদিবাসী গোষ্ঠীসমূহের ধর্ম ও সংস্কৃতি :

১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট আদিবাসী জনসংখ্যা হচ্ছে ১২,০৫,৯৭৮ কিন্তু বাস্তবে এ সংখ্যা সম্ভবত দ্বিগুণ। নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বিচারে আদিবাসী গোষ্ঠীর সদস্যদের বৃহত্তর বাঙালিদের মত শংকর জাতি বলা যায় না। বরং নৃতাত্ত্বিক বিচারে তাদের মধ্যে মূলত দুটো প্রধান নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত বলে মনে করা হয়– একটি মঙ্গোলয়েড ও অন্যটি অস্ট্রোলয়েড। ভাষা ও বর্ণের বিচারেও তাদের সিনো তিব্বতীয় ও অস্ট্রো এশিয়াটিক এ দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। এছাড়াও চাকমাসহ কয়েকটি গোষ্ঠীর ভাষা ইন্দো এরিয়ান শাখাভূক্ত।

গবেষক আব্দুস সাত্তার *'Tribal Culture in Bangladesh'* গ্রন্থে বাংলাদেশে প্রায় ২৯টি উপজাতি বসবাস করছে বলে উল্লেখ করেছেন (Sattar, 1975 : 1)। সুগত চাকমা তাঁর গ্রন্থে (*বাংলাদেশের উপজাতি*) ত্রিশটির বেশি তালিকা উল্লেখ করেছেন (Chakma, 1985 : 17)। অন্যদিকে বাংলাদেশের আদিবাসী ফোরামের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রায় ৪৫টি আদিবাসী গোষ্ঠী বসবাস করছে (Kamal, Islam and Chakma, 2007 : xxxiii) ।

বাংলাদেশের আদিবাসী গোষ্ঠীগুলোর অধিকাংশই পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বাস করে। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাসকারী কয়েকটি প্রধান আদিবাসী গোষ্ঠীর নাম নিম্নে উল্লেখ করা হল:

১. চাকমা	৫. বম	৯. চাক	১৩. সেনডুগ
২. মারমা	৬. কুকি	১০. দৈনাক	১৪. খুমী
৩. ত্রিপুরা	৭. লুসাই	১১. পাংখোয়া	১৫. খিয়াং
৪. তঞ্চঙ্গ্যা	৮. মুরং	১২. বনযোগী	১৬. মুর

৩.১.১.১। চাকমা :

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিভিন্ন আদিবাসী গুলোর মধ্যে বৃহত্তম আদিবাসী গোষ্ঠী হল চাকমা। চাকমারা বাইরের লোকদের কাছে চাকমা নামে পরিচিত হলেও তাদের প্রকৃত নাম চাঙমা (Changma)। চাকমা তরুনদের মধ্যে অনেকেই 'চাঙমা' নামটিই ব্যবহারের পক্ষপাতি। ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের আদশুমারী অনুযায়ী বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান এ তিনটি জেলার চাকমাদের মোট জনসংখ্যা ২,৩৯৪১৭ জন। তবে ঐসময় কক্সবাজার ও অন্যত্র বসবাসকারী চাকমাদের অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি। বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলেই তাদের জনসংখ্যা তিন লক্ষের মতো। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতিত ভারতের ত্রিপুরা, মিজোরাম, মিকিরহিল ও অরুনাচলে চাকমারা বাস করে। বার্মার আরাকান অঞ্চলে চাকমা আদিবাসী গোষ্ঠীর কিছু সদস্য রয়েছে। তাঁরা সেখানে দৈন্নাক নামে পরিচিত (Khain, 1988 : 15)।

চাকমাদের অতীত ইতিহাস খুব স্পষ্ট নয়। অতীতে চাকমা গ্রামাঞ্চলে এক শ্রেণির চারণ কবিরা পালাগান শুনাতেন। এ সব পালাগানের কোন কোনটিতে চাকমাদের অতীত ইতিহাসের কাহিনী বর্ণনা করা হত। চাকমাদের এসব পালাগানে চম্পকনগর বলে একটি রাজ্যের উল্লেখ আছে। অতীতে চাকমারা চম্পকনগরে বাস করতো। সেই রাজ্যের রাজার বিজয়গিরি ও সমরগিরি নামে দুই পুত্র ছিল। পিতার মৃত্যুর পর বিজয়গিরি চম্পকনগর ত্যাগ করে তিনি তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে সাপ্রেইকুল চলে যান। চাকমাদের বিশ্বাস তারা বিজয়গিরির সেসব সৈন্যদেরই বংশধর। আরাকানিদের ইতিহাসেও এই জনপ্রিয় কিংবদন্তিটির সমর্থন পাওয়া যায়। আরাকানিরা চাকমাদের শাক্যবংশীয় লোক বলে মনে করেন। তাই তারা চাকমাদের 'সাক' বা 'সেগ' বলে। চাকমারা যে এককালে কক্সবাজার জেলার রামু পর্যন্ত অধিকার করেছিল তা প্রায় সুস্পষ্ট। এখনও রামুর দু'মাইল দূরে 'চাকমাকূল' নামে একটি স্থান আছে। অনেকেই চাকমাকূল অঞ্চলটি বিজয়গিরি বর্ণিত সাপ্রেইকূল বলে মনে করেন।

আরাকানের বেশ কিছু অঞ্চল চাকমারা বস্তুত: নবম শতক থেকে ১৪০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত শাসন করেন। চাকমারা পরে স্থানীয় আরাকানীদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে প্রথমে চট্টগ্রাম জেলায় এবং পরে ধীরে ধীরে পার্বত্য এলাকায় গিয়ে বসবাস শুরু করে। চাকমাদের এখানে আগমন ঘটে আনুমানিক

১৫শ শতকে। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে চাকমাদের আগমনের পর থেকে তাদের ইতিহাস আর কাহিনী ও কল্পনার দ্বারা প্রচ্ছন্ন থাকেনি।

চাকমাদের পারিবারিক ও সামাজিক কাঠামো: চাকমাদের নিজস্ব প্রশাসনিক ব্যবস্থা রয়েছে। প্রাচীনকাল থেকেই চাকমা সমাজের প্রধান হলেন রাজা। অতীতে রাজা তার মন্ত্রী ও সেনাপতিদের নিয়েই শাসন করতেন। তখন চাকমা সমাজে আঞ্চলিক প্রধান হিসেবে 'ধাবেং' এবং সেনাধ্যক্ষ হিসেবে 'চেগে' নামক দু'টি পদ ছিল। এছাড়া প্রত্যেক গ্রামে 'খীঝা' নামে একজন ব্যক্তি থাকতেন যিনি প্রশাসনের কাজে সাহায্য করতেন।

চাকমা সমাজ ঐতিহাসিক কাল থেকেই কতগুলো দলে বিভক্ত। এ দলগুলোকে এক একটি গঝা বলা হয়। কয়েকটি গুথি (গোত্র বা গোষ্ঠী) নিয়ে হয় একটি গঝা। চাকমাদের বেশ কয়েকটি গঝা এবং শতাধিক গুথি রয়েছে। শতীশচন্দ্র ঘোষ ১৩৩টি গোষ্ঠীর হিসাব দিতে সক্ষম হয়েছেন (Ghosh, 1909)। চাকমা সমাজে গুথির গুরুত্ব খুব বেশী। বিভিন্ন গুথিতে বিভিন্ন ধরণের ট্যাবু দেখতে পাওয়া যায়। যেমন- (১) লার্মা-গঝা চাকমা গোষ্ঠীর: উনুনশালে একত্রে তিনটি চুলা তৈরী করা নিষেধ, (২) লার্মা-গঝা কবাল্যা গোষ্ঠীর: মিষ্টি কুমড়ার শাক লাগানো নিষেধ, (৩) বোর্বুয়া-গঝা কালবা দাঘির: মোরগ এবং শূকর বিক্রি করা নিষেধ। এবং এভাবে অন্যান্য গুথিরও বিভিন্ন ট্যাবু বা হুমা দেখতে পাওয়া যায়। চাকমা সমাজ পিতৃতান্ত্রিক (Patriarchal) সমাজে পিতার সূত্র ধরেই সন্তানদের গঝা ও গুথি নির্ণয় করা হয়। চাকমা সমাজে উত্তরাধিকার সূত্রে মেয়েরা কোন সম্পত্তি অর্জন করেনা।

ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মীয় উৎসব: চাকমারা বর্তমানে প্রধানত: বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। চাকমারা হীনযানপন্থী। চাকমাদের প্রায় প্রতিটি গ্রামে ক্যাং বা বৌদ্ধ মন্দির আছে। প্রতিটি পরিবার সপ্তাহে একদিন ক্যাং-এ স্যং (ভিক্ষুদের আহার) দান করে। বৌদ্ধ ধর্মীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানগুলো তারা ভক্তি সহকারে পালন করে।

বাংলাদেশে অধিকাংশ আদিবাসী গোষ্ঠীরই নিজস্ব কোন ধর্মগ্রন্থ নেই। তারা তাদের ধর্মানুযায়ী হিন্দু, বৌদ্ধ বা খ্রিষ্টধর্মের ধর্মগ্রন্থগুলো অনুসরণ করে। কিন্তু চাকমাদের নিজস্ব ধর্মগ্রন্থ

আছে। তাদের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ 'আঘরতারা' তাদের নিজস্ব বর্ণমালায় লিখিত। আঘরতারার অন্তর্ভূক্ত ছিল বিভিন্ন তারা বা পালিসূত্র। যেমন-

১. মালেন তারা
২. সাধেংগিরি তারা
৩. আনিজা তারা
৪. সিগল মোগল তারা
৫. আরিন্তামা তার
৬. দাসা পারামি তারা
৭. বর-কুরুক তারা
৮. ছোত-কুরুক তারা
৯. সরক-দান তারা
১০. পুদুম ফুলু তারা

এরকম আরো অনেকগুলো তারা বা সূত্র। লুরি বা রুরি নামক বৌদ্ধ ভিক্ষুরা এই তারা গুলো থেকে বিভিন্ন পুজার সময় পাঠ করতেন। চাকমারা হীনযানপন্থী এবং গৌতমবুদ্ধের মূলনীতিগুলোকে গভীর ভক্তির সাথে অনুসরণ করার চেষ্টা করে। তবে তাদের ধর্মবিশ্বাসের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন দেব-দেবীতেও তারা বিশ্বাস করে। যেমন- গঙ্গা, লক্ষ্মী, বিয়াত্রা প্রভৃতি বিশ্বাস যেগুলো হিন্দুধর্ম দ্বারা প্রভাবিত বলে মনে হয়। চাকমাদের বিভিন্ন পূজা ও ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসবের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিচে প্রদান করা হল:

ভাতদ্যা পূজা: চাকমারা জন্মান্তরে বিশ্বাসী। একসময় গ্রামাঞ্চলে ভাতদ্যা পূজা অনুষ্ঠিত হতো। পূর্ব পুরুষেরা সদ্‌গতি কামনা করে এবং মৃত্যুর পর কে কোথায় জন্ম নিলেন তা নির্ণয় করার জন্য এ পূজা করা হয়। চাকমাদের বিশ্বাস কোন বিশেষ গোত্রের লোকেরা আবার তার নিজের গোত্রেই পুনর্জন্ম লাভ করে।

হাল-পালনি ও মা-লক্ষ্মী পূজা: চাকমা সমাজে আষাঢ় মাসের সাত তারিখ ফসল ও ঐশ্বর্যের দেবী মা লক্ষীর উদ্দেশ্যে ভাত দেওয়া হয়। একারণে এদিনকে হাল পালনি দিনও বলা হয়।

থান-মানা: চাকমাদের প্রতি গ্রামে বছরে অন্তত: একবার থান-মানা পূজা পালিত হয়। এ পূজায় গ্রামের সবাই মিলে ১৪ জন দেব দেবীকে একত্রে পূজা দেয়। এই দেব দেবীদের কয়েকজন হলেন- বাস্ত দেবতা থান, ফসলের দেবী মা-লক্ষ্মী মা, বিয়াত্রা, জল ও নদী দেবী মা- গঙ্গা, বাঘের দেবতা মাতা ভূতের রাজা 'ভুদরাজা' প্রভৃতি। এ পূজা নদীতীরে আয়োজন করা হয়।

ধর্মকাম: গৃহস্থের উন্নতি ও মঙ্গলের জন্য জঙ্গলে ধর্মকাম পূজা করা হল। এ পূজায় দেবতার উদ্দেশ্যে কলাপাতায় ভাত দেওয়া হয়। চাকমাদের প্রচলিত বিশ্বাস ঐ কলাপাতায় মোড়ানো ভাতের চারদিকে

একটি মাকড়সা বন থেকে এসে জাল বুনতে থাকে। এতে এ পূজা সার্থক হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়।

বিজু উৎসবঃ চাকামাদের বছরের সবচেয়ে বড় উৎসব বিজু উৎসব। চাকমারা মোট তিন দিন নববর্ষের উৎসব বা বিজু উৎসব পালন করে। পুরনো বর্ষের শেষ দিন মূল বিঝু তার আগের দিন ফুল বিঝু এবং নববর্ষের প্রথম দিনটিকে 'গোর্জ্যাপোর্জ্যা' দিন বলা হয়। মূল বিঝু দিনটিই প্রকৃত বিঝু দিন। নববর্ষে আনন্দের পাশাপাশি অনেকেই বৌদ্ধমন্দিরে গিয়ে প্রার্থনা করেন।

কঠিন চীবর দানঃ চাকমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় উৎসব কঠিন চীবর দান। 'কঠিন চীবর দান' প্রবারণা পূর্ণিমার একটি অংশ। এসময় ক্ষমা চেয়ে প্রার্থনা করা হয় ও পরস্পরকে ক্ষমা করা হয়। প্রবারণার শেষ অংশ হল কঠিন চীবর দান। বর্তমানে কঠিন চীবর দানের তাৎপর্য প্রবারণাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। কঠিন চীবর দান উৎসবের মূল উদ্দেশ্য পূণ্য অর্জন করা। 'চীবর' শব্দটির অর্থ বস্ত্র বা কাপড়। এ ধর্মীয় উৎসবে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তুলা থেকে সুতা তৈরী করে, রং করে শুকিয়ে, কাপড় বুনে বৌদ্ধ ভিক্ষুকে দান করা হয়। কাপড় বোনার জন্য নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে একটি বিশেষ স্থানে বিভিন্ন পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত হয়। তাদের সাথে থাকে তুলা থেকে কাপড় তৈরী করার সরঞ্জাম। এরপর কাপড়ের টুকরোগুলো একসাথে জোড়া লাগানো হয়। এমনভাবে জোড়া দেওয়া হয় যাতে জোড়ার স্থান আর নির্দেশ করা না যায়। কেউ যদি নির্দিষ্ট সময়ে কাপড় জমা দিতে না পারেন তবে তিনি পাপী হবেন এবং সেবছর তিনি কঠিন চীবর দান উৎসবের পূণ্য অর্জনে ব্যর্থ হবেন। কাপড় জোড়া দেওয়ার পর সেটি রাজার কাছে নিয়ে যাওয়া হয় ও তাকে হস্তান্তর করা হয়। রাজা কাপড়টি বৌদ্ধ পুরাহিতকে দান করেন। পুরহিত পরবর্তীতে কাপড়টি টুকরো টুকরো করে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের দান করেন। কঠিন চীবর দান বর্তমানে এ অঞ্চলে একটি বিরাট ধর্মীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে। এখন এ উৎসবে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে (CHT) বৌদ্ধধর্মাবলম্বী অন্যান্য উপজাতি যেমন- মারমা, তঞ্চংগা, চাকমা এবং অন্যান্য বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা কার্তিকী পূর্ণিমা দিবস উদযাপনকালে সাড়ম্বরে 'কঠিন চীবর দানোৎসব' উদযাপন করে থাকে (Chakma, 2007 : 70)।

৩.১.১.২। মারমা :

পার্বত্য চট্টগ্রামের দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ উপজাতি মারমা উপজাতি। বর্মি 'ম্রানমা' বা 'মাইমা' শব্দ থেকে মারমা শব্দটি উদ্ভূত (Pru, 1981 : 1)। উল্লেখ্য বার্মা নামটি পরিবর্তন করে বেশকিছু বছর আগে মিয়ানমার নামকরণ করা হয়। মারমা, ম্রাইমা, মিয়ানমার– এ শব্দগুলো প্রায় সমার্থক (Abedin, 1997 : 53)। বাংলাদেশ সরকারের ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দের আদমশুমারি রিপোর্ট অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামের মারমাদের জনসংখ্যা তখন ছিল ১,৪২,৩৩৪ জন। বান্দরবন ও মানিকছড়িতে তাদের দুজন রাজা আছে। বান্দরবানের রাজাকে বোমাংরাজা ও মানিকছড়ির রাজাকের মানরাজা বলা হয় (Chakma, 1985 : 26)।

ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মীয় উৎসবঃ মারমা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রায় প্রতিটি মারমা গ্রামে 'ক্যাং' (বৌদ্ধবিহার) দেখা যায়। তারা বৌদ্ধভিক্ষুকদের (ভন্তে) আহার দান করে। তারা বিভিন্ন ধর্মীয় দিবস, যেমন, বৈশাখি পুর্ণিমা, আশ্বিনী পূর্ণিমা, কার্ত্তিক পূর্ণিমা প্রভৃতি দিবসগুলোতে বৌদ্ধমন্দিরে গিয়ে ফুল দিয়ে এবং প্রদীপ জ্বালিয়ে বুদ্ধকে পূজা করে। তাদের ভাষায় বুদ্ধ শব্দের প্রতিশব্দ "ফরা" (Chakma, 2000 : 51)। মারমারা কর্মবাদী ও জন্মান্তরবাদী। তারা বার্মিজ সংস্কৃতিকে অনুসরণ করে। তাদের মতে, প্রত্যেক মানুষ অতীতের কর্মফল অনুসারে জন্ম নেয়। মারমারা একদিকে যেমন বৌদ্ধধর্মে গভীরভাবে বিশ্বাস করে অপরদিকে তাদের মধ্যে বিভিন্ন দেবতা, অপদেবতা এবং প্রকৃতি পূজার প্রবণতাও লক্ষ্য করা যায় (Nue, 2007 : 158) ।

৩.১.১.৩। ত্রিপুরা :

পাবর্ত্য চট্টগ্রামের একমাত্র হিন্দুধর্মাবলম্বী উপজাতি হল ত্রিপুরা নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী। তারা পাবর্ত্য চট্টগ্রামের তৃতীয় বৃহত্তম উপজাতি। ত্রিপুরাদের মূল আবাসস্থল ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য। ত্রিপুরা রাজন্যবর্গের উল্লেখযোগ্য অবদান ত্রিপুরা রাজ্যে বাংলা ভাষাকে মর্যাদা প্রদান করা (Tripura, 2007 : 104)। ত্রিপুরাদের ভাষা কক-বরক ভাষা নামে পরিচিত।

ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মীয় উৎসবঃ ত্রিপুরারা হিন্দুধর্মাবলম্বী হলেও তাদের ১৪ জন দেব-দেবী রয়েছে। ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় এই ১৪ জন দেব-দেবীর মন্দির রয়েছে। এই দেব-দেবীর সঙ্গে বৈদিক ধর্মে বর্ণিত দেব-দেবীর সাদৃশ্য রয়েছে। যেমন-

১. সিবরাই (শিব)
২. সংগ্রাংমা (কালী)
৩. সুকুন্দ্রায় (কার্তিক)
৪. বুকুন্দ্রায় (গণেশ)
৫. হাচুকমা (বসুন্ধরা)
৬. তোয়বুকমা (জলদেবী)
৭. মাইলুকমা (লক্ষীদেবী)
৮. ইক্ষিত্রা (অগ্নি/ সূর্যদেব)
৯. বিক্ষিত্রা (পবন দেব)
১০. কালাকতর (মহাকাল)
১১. কালাক্ষী (ঘমদেব)
১২. রন্দকা (কামদেব)
১৩. ধন্তকা (কুবের)
১৪. বনিরক (আশ্বিনী কুমারদ্বয়)

তাদের পূজা করার নিজস্ব পদ্ধতি আছে এবং ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে 'অচাই' নামক একধরনের পুরহিত পূজা আর্চনা সম্পন্ন করেন। ত্রিপুরা জাতিসত্ত্বা ৩৬টি দলে বিভক্ত। সাম্প্রতিক কালে তাদের উসুই দলের অনেকেই খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে। পাবর্ত্য চট্টগ্রামে একমাত্র ত্রিপুরাই দ্বি-ধারায় বংশগণনা করে। পুত্রসন্তান তার পিতার দল ও গোত্রের উত্তরাধিকারী বলে বিবেচিত হয় এবং কন্যা সন্তান তার মায়ের উত্তরাধিকারী বলে বিবেচিত হয়।

ত্রিপুরাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি অত্যন্ত সমৃদ্ধ। তাদের বাৎসরিক কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পূজা-পার্বন ও উৎসব হলো বৈসু উৎসব, কের উৎসব, সিবরাই পূজা, রাজপুণ্যাহ উৎসব ও চুমলাই উৎসব। ত্রিপুরাদের প্রধান উৎসব বৈসু উৎসব। এ উৎসবে পুরনো বছরকে বিদায় জানানো হয় এবং নতুন বছরকে স্বাগত জানানো হয়। পাবর্ত্য চট্টগ্রামে ত্রিপুরাদের বৈসু, মারমাদের সাংগ্রেই এবং চাকমাদের বিঝু উৎসবের সমন্বয়ে বৈসাবি উৎসব পালিত হয়। ত্রিপুরাদের তান্ত্রিক পূজাপার্বণ বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা সামাজিক অনুষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ নাচ ও গান।

৩.১.১.৪। লুসেই ও পাংখুয়া :

পাবর্ত্য চট্টগ্রামের কুকি-চীন ভাষাভাষী দু'টি উপজাতি লুসেই ও পাংখুয়া। উভয় উপজাতিই লুসাইপাহাড় বা মিজোরামের দিক থেকে অতীতে চট্টগ্রামে এসেছে। পাংখুয়ারা মনে করে তারা অতীতে লুসাইপাহাড়ের 'পাংখোয়া' নামক একটি গ্রামে বাস করত। 'পাং' শব্দের অর্থ শিমুলফুল এবং 'খোয়া' অর্থ গ্রাম। আধুনিকযুগের পাংখুয়ারা লোকালয় থেকে দূরে দূর্গম এলাকায় থাকতে পছন্দ করে। অন্যদিকে লুসাইদের সংখ্যা পাবর্ত্য চট্টগ্রামে কম হলেও তাদের আদিনিবাস লুসাইপাহাড় বা বর্তমানে ভারতের মিজোরামে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ উপজাতি। অতীতে লুসাইরা ছিল দুর্ধর্ষ উপজাতি। চট্টগ্রামসহ আশে পাশের কয়েকটি জেলায় প্রায়ই তারা আক্রমন করতো।

ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মীয় উৎসবঃ লুসেই ও পাংখুয়া এই দুই উপজাতিই অতীতে সর্বপ্রাণবাদী ছিল। লুসাইদের বিভিন্ন গ্রামে ভিন্ন ভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করা হতো। ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে ব্যাপ্টিস্ট মিশনারী গোষ্ঠীর ধর্মপ্রচারের মাধ্যমে লুসাইদের খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তর শুরু হয় এবং বর্তমানে তারা সবাই খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী।

ক্যাপটেন টি. এইচ লুইন (১৯১২) তাঁর '*A Fly on the Wheel*' গ্রন্থে ইংরেজ শাসনামলে লুসেইদের সম্পর্ক অনেক তথ্য উল্লেখ করেছেন। তিনি তাদের সাহসী এবং একইসাথে অমায়িক স্বভাবের বলে মনে করেছেন। তিনি পাংখুয়াদের প্রকৃতির সাথে একাত্ম ও সরল উপজাতি বলে বর্ণনা করেছেন (Chakma, 1996 : 25)।

৩.১.১.৫। বম :

বমদের ভাষা ও সংস্কৃতি অনেকটা লুসেই ও পাংখুয়াদের মত। চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যারা তাদের এখনও কুকি বলে ডাকে। অতীতে বমরা লুসেই ও পাংখুয়াদের মত দলবদ্ধভাবে পশু শিকার করতো। বমরা বহু পূর্ব থেকে লোহা ও পিতলের ব্যবহার জানতো এবং এসব ধাতু দিয়ে অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করতো। অতীতকালে মৃতব্যক্তির কবরে তারা এসব অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে দিত। মৃতব্যক্তি কোন প্রভাবশালী সর্দার হলে তার পাশের গুহায় কিছু দিনের খাবার ও দাসদাসীদেরও জীবন্ত কবর দেওয়া হতো। বর্তমানে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করার ফলে তাদের অতীতের এসব রীতি লোপ পেয়েছে (Lewin, 1869 : 25)।

ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মীয় উৎসবঃ বমদের বাৎসরিক বিভিন্ন উৎসবের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নবান্ন উৎসব। স্মরণাতীত কাল থেকেই তারা জুমের ফসল তোলার পর নবান্ন উৎসব পালন করে আসছে। তবে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করার পর তাদের নবান্ন উৎসব পালন করার ধরণ পরিবর্তন হয়েছে। জুমের উৎপাদিত ফসল আগে তারা গির্জায় উৎসর্গ করে, তারপর সেগুলো সকলে একসাথে খায়। বম নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর আরো দু'টি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান হচ্ছে বর্ষ বিদায় ও বর্ষ বরণ অনুষ্ঠান। বর্তমানে তারা ১লা জানুয়ারিতে নববর্ষ অনুষ্ঠান পালন করে। তাদের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে তাদের তরুণীদের বাঁশনৃত্য বা 'চেরলাম'। মণিপুরীদের নৃত্যের মত তাদের বাঁশনৃত্যও ক্রমে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

৩.১.১.৬। ম্রো :

পাবর্ত্য চট্টগ্রামের চতুর্থ সংখ্যাগরিষ্ট উপজাতি ম্রো। ক্যাপটেন টি এইচ লিউইনের গ্রন্থ থেকে জানা যায়, ম্রোরা আরাকানের খুমী উপাজাতি কর্তৃক বিতারিত হয়ে পাবর্ত্য চট্টগ্রামে আসে।

ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মীয় উৎসবঃ ম্রোদের প্রতিবেশী উপজাতি মারমাদের প্রভাবে ম্রোরা এখন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। তাদের মধ্যে অল্পসংখ্যক খ্রিষ্টধর্মও গ্রহণ করেছে। ম্রোরা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হলেও তাদের মধ্যে নানা প্রকার জড় উপাসনা এখনও দেখা যায়। তাদের বিশ্বাস থুরাই নামে একজন প্রধান দেবতা আছেন যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। থুরাই একটি গরুকে দিয়ে ম্রোদের কাছে একটি ধর্মগ্রন্থ পাঠান। গরুটি কলাপাতার লেখা ধর্মগ্রন্থটি নিয়ে আসার সময় পথে ক্ষুধার্ত হয়ে ধর্মগ্রন্থটি খেয়ে ফেলে এবং থুরাই ম্রোদের কাছে যে সমস্ত উপদেশ বাণী পাঠিয়ে ছিলেন সেগুলো সম্পর্কেও মিথ্যা কথা বলে। তাই তারা এখন পূজা অনুষ্ঠানে 'গো-হত্যা' অনুষ্ঠান পালন করে এবং গরুকে হত্যা করার পর শাস্তিস্বরূপ জিহ্বাটি কেটে নেয়। ম্রোরা রোগব্যাধি, মহামারি, বা অপদেবতার কুদৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পূজার আয়োজন করে।

৩.১.২। উত্তরবঙ্গ ও ময়মনসিংহ-সিলেট অঞ্চলের আদিবাসী গোষ্ঠীসমুহের ধর্ম ও সংস্কৃতি :

বৃহত্তর চট্টগ্রাম এবং পাবর্ত্য চট্টগ্রাম ছাড়া বাংলাদেশর উপজাতীয় জনগোষ্ঠী অন্যান্য যেসব এলাকায় বসবাস করে সেসব এলাকাগুলো হলো বৃহত্তর সিলেট, ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল অঞ্চল, দেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে বৃহত্তর রাজশাহী, দিনাজপুর, বগুড়া ও পাবনা জেলা। এছাড়া কুষ্টিয়া জেলা এবং দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে পটুয়াখালী ও বরগুণা জেলায় কয়েকটি উপজাতি বসবাস করছে। এসব নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীগুলোর কয়েকটি গোষ্ঠীর সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল:

৩.১.২.১। সাঁওতাল :

নৃবিজ্ঞানীদের মতে সাঁওতালরা বহুকাল ধরে বাংলাদেশে উত্তরাঞ্চলে বাস করে আসছে। তারা দিনাজপুর, রংপুর, রাজশাহী, বগুড়া প্রভৃতি জেলায় বাস করে। সাঁওতলরা নিজেদের নাম 'হড়' বলে উল্লেখ করে, যার অর্থ মানুষ। সম্ভবত পশ্চিমবঙ্গে সামন্তভূমি বা 'সাঁওন্ত'- এ তাদের অবস্থানকালে

'সাঁওনতার' শব্দ থেকে সাঁওতাল নামটি উদ্ভূত হয়েছে। ডালটনের মতে, বঙ্গের আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে সাঁওতালরাই সবচেয়ে সম্মানিত জনগোষ্ঠী। (Dalton, 1972 : 209)।

ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মীয় উৎসবঃ সাঁওতাল সমাজে বিভিন্ন টোটেম গোত্র রয়েছে। তারা বিভিন্ন দেবতায় বিশ্বাস করে। তাদের ভাষায় দেবতাকে বলা হয় 'বোঙ্গা'। বিভিন্ন বোঙ্গাকে সন্তুষ্ট করার জন্য তারা বিভিন্ন ধরনের পূজা অর্চনা করে থাকে । তাদের আদি দেবতা সিংবোঙ্গাকে তারা ঠাকুর বলে সম্বোধন করে। তবে এ দেবতাকে নিয়মিত পূজা করতে হয়না। পাঁচ বা দশ বছর পর সিং বোঙ্গার উদ্দেশ্যে পূজা দেওয়া হয় এবং মোরগ বা পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। 'মারাং বুরু' প্রধান দেবতাদের অন্যতম যিনি সাঁওতাল জাতির পালনকর্তা। 'মারাং বুরু' অর্থ পাহাড়। 'ওরাক' বা 'ওরা বোঙ্গা' এবং 'আরকে বোঙ্গা' সাঁওতালদের কয়েকটি পারিবারিক দেবতা। তারা সময় ও সুযোগ মতো এসব বোঙ্গার পূজা করে। সাঁওতালদের বিশ্বাস গ্রামের বাইরে 'জাহের থান' বা 'পবিত্রকুঞ্জে' কয়েকজন বোঙ্গা থাকে। তারা হল মারাং বুরু, জাহের এরা, গোসাই এরা, মোরেইকো-তুরুইকো এবং পরগণা। গ্রামে কোন মহামারি হলে মোরেইকো-তুরুইকোর উদ্দেশ্যে পূজা করা হয়। সাঁওতাল সমাজে হিন্দু দেব-দেবীর প্রভাবও দেখা যায়।তারা সর্বপ্রাণবাদী ও প্রকৃতির উপাসক আবার তারা ঠাকুর জিউ' কে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে মানে (Drang, 2001 : 249)। সাঁওতাল সমাজের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য তাদের নিজস্ব সমাজ কাঠামো এবং বিচার ব্যবস্থা। তবে সাঁওতালরা ক্রমে খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ায় এবং বাঙালী সংস্কৃতির প্রভাবে তাদের সংস্কৃতি ক্রমে পরিবর্তিত হচ্ছে।

৩.১.২.২। রাখাইন :

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী ব-দ্বীপ এলাকায় পটুয়াখালী ও বরগুণা জেলায় এবং সবচেয়ে দক্ষিণ-পূর্ব কোনে কক্সবাজার জেলায় রাখাইনরা বাস করে। "রক্ষণ" হতে রাখাইন শব্দের উৎপত্তি। রাখাইনরা ধর্ম, কৃষ্টি, ঐতিহ্য রক্ষা করে চলে এসেছে বলে তাদের নাম রাখাইন রাখা হয়েছে। তাদের আদি নিবাস ছিল আরাকানে। বস্তুত তারা পাবর্ত্য চট্টগ্রামের মারমাদের সমগোত্রীয় জনগোষ্ঠী।

ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মীয় উৎসবঃ রাখাইনরা সকলেই বৌদ্ধধর্মাবলম্বী এবং হীনযানপন্থী। তারা বৌদ্ধ ধর্মের বিজ্ঞানসম্মত শাস্ত্রীয় শিষ্টাচারই পালন করে (Majid, 1992 : 78)। বৌদ্ধধর্মের পবিত্র দিনগুলো

তারা ভক্তির সাথে পালন করে। রাখাইনদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব হচ্ছে বুদ্ধপূর্ণিমা। এছাড়া তারা বৌদ্ধধর্মের পবিত্র দিনগুলো যেমন আষাঢ়ী পূর্ণিমা, ভাদ্রপূর্ণিমা, কার্তিকীপূর্ণিমা ও মাঘীপূর্ণিমায় সকলে একসাথে বৌদ্ধভিক্ষুর ধর্মবাণী শোনার জন্য বৌদ্ধমন্দিরে যায়।

৩.১.২.৩। মণিপুরী :

মণিপুরীরা বাংলাদেশের মৌলভিবাজার, হবিগঞ্জ, সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলার বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলের সমতল ভূমিতে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। মণিপুরীরা ভারতের মণিপুর রাজ্যের অধিবাসী। মণিপুরের প্রাচীন নাম ছিল গন্ধর্বরাজ্য। মহাভারতে উল্লেখ আছে একসময় এ অঞ্চলের নাম ছিল 'মেকলি দেশ'। মণিপুর বা মেকলে অঞ্চলটি মূলত পাহাড়ে ঘেরা একটি সমতলভূমি। এখানে আছে লোকতাগ হ্রদ নামে একটি বৃহৎ হ্রদ। কথিত আছে দেবাদিদেব শিব এবং দূর্গা এ স্থানটি রাসনৃত্য করার জন্য মনোনীত করেন। তাদের আমন্ত্রণে অনন্তনাগ তার মাথার মণির সাহায্যে সবদিকে পাহাড়ে ঘেরা অঞ্চলটি আলোকিত করে তুলেছিল, তাই এ অঞ্চলের নাম মণিপুর রাখা হয়। মণিপুরীদের মধ্যে দুটি শ্রেনি আছে, প্রথমটি বিষ্ণুপ্রিয়া। তারা ইন্দো এরিয়ান ভাষাভাষী। দ্বিতীয়টি মৈতৈ মণিপুরী। তারা মঙ্গেলীয় জনগোষ্ঠীর লোক। বিষ্ণুপ্রিয়াদের খালাচাই নামেও ডাকা হয় যার অর্থ বৃহৎ হ্রদের সন্তান। ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে খালাচাইরা বহুপূর্ব থেকে বিষ্ণুপূজা করে আসছে বলে তারা তাদের রাজধানীর নামকরণ করে বিষ্ণুপুর। এখান থেকেই এসেছে বিষ্ণুপ্রিয়া নামটি। অন্যদিকে মৈতৈদের ইতিহাস স্পষ্ট নয়। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন তারা ধর্মান্তরের মাধ্যমে বিষ্ণুপ্রিয়াদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছিল।

ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মীয় উৎসব: পূর্বের মত বাংলাদেশের মণিপুরীরা এখন বৈষ্ণবধর্ম অনুসরণ করে। তারা সনাতন রীতিতে গন্ধর্ব ধারায় বিষ্ণু দেবতার পূজা অর্চনা নিষ্ঠার সাথে পালন করে। তাদের ধর্মগ্রন্থগুলোর মধ্যে মহাভারত, গীতা, রামায়ন, পুরাণ প্রধান। রাস উৎসব তাদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব।

৩.১.২.৪। খাসি :

বাংলাদেশের বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে বসবাসকারী একটি জনগোষ্ঠী হচ্ছে খাসি। তাদের গোষ্ঠীর অধিকাংশ সদস্য ভারতের মেঘালয়ে বাস করে। বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী খাসিপুঞ্জির খাসিরা পান চাষ করে। খাসিরা মাতৃতান্ত্রিক।

ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মীয় উৎসব: বর্তমানে বাংলাদেশের খাসিরা অধিকাংশ খ্রিষ্টধর্মে বিশ্বাসী। তবে এখনও অনেকে তাদের ঐতিহ্যবাহী সর্বপ্রাণাদী ধর্মে বিশ্বাস করে। তাদের ধর্মের দু'টো অংশ আছে- (১) জীবিতদের ধর্ম ও (২) মৃতদের ধর্ম। জীবিতদের ধর্মের মূলকথা সৎভাবে জীবনযাপন। মৃতদের ধর্মের মূলকথা, সম্মানের সাথে মৃত অত্মীয়স্বজনকে স্মরণ করা । সার্বিক বিচারে খাসিদের আদি ধর্মের সাথে গারোদের সাংসারেক ধর্মের অনেক মিল রয়েছে।

উপরোক্ত আদিবাসী গোষ্ঠীগুলো ছাড়াও বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আরো কতগুলো ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী আছে। উত্তরবঙ্গে ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে আছে ওঁরাও, নূনিয়া, পলিয়া, পাহান, ভূঁইমালী, মাহাতো, মাহালী, মুন্ডা, মুশহর, রবিদাস, রাঁজোয়াড়, রাজবংশী, রানা কর্মকার, লহরা প্রভৃতি এবং ময়মনসিংহ সিলেট অঞ্চলে গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে আছে কন্দ, কুর্মি, কোচ, খাড়িয়া, ডালু, নায়েক, পাঙন, পাত্র, বর্মণ, বীন, বোনাজ, ভূমিজ, শবর, হাজং এবং হালাম।

৩.২। নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীসমূহের ধর্মবিশ্বাস– তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ :

উপজাতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে গত শতকের প্রথম দিকে রিভার্স (Rivers, 1924 : 32) একে 'একটি সরল প্রকৃতির সামাজিক দল' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে 'এর সদস্যরা একই কথ্যভাষা (Dialect) ব্যবহার করে, একটি সামাজিক প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যে অবস্থান করে এবং একটি সমন্বিত উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োজিত থাকে'। অন্য নৃবিজ্ঞানীদের (Murdock et al., 1950; Lowie, 1960; Koreber, 1962 : 304-320) মতে 'উপজাতি' কতগুলো আঞ্চলিক সম্প্রদায়ের যৌথ ভৌগোলিক অবস্থানের মধ্য থেকে উদ্ভূত। তবে এই প্রত্যয়টি মূলত সেই সব দল বা গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় যার ঐক্য বা সংহতি প্রাথমিকভাবে বর্ধিত বংশধারার বন্ধনে আবদ্ধ থাকে বলে উপজাতীয় লোকজন মনে করে থাকে। এক্ষেত্রে অবশ্য মনে রাখা প্রয়োজন যে, বৃহত্তর জাতি ভিত্তিক রাষ্ট্রের সঙ্গে উপজাতি যুক্ত থাকলেও তাদের ভিন্ন সত্তা রক্ষায় তারা সদা সচেতন। বলাবাহুল্য,

যদিও উৎপত্তির মাত্রায় রক্ত সম্পর্কিত গোষ্ঠী বা গোত্রের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে, তবু উপজাতি প্রত্যয়টি গোত্র থেকে আর একটু ব্যাপক।

উপজাতির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে যে বিশেষ দিকের ব্যাপারে নৃবিজ্ঞানীগণ তথা সামাজিক বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার বিজ্ঞানীগণ অভিমত প্রকাশ করেছেন। সেটি হলো প্রধানত সাংস্কৃতিক বিভিন্নতা বিষয়ক; এবং তা চূড়ান্ত বিশ্লেষণে ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠানের প্রতি দৃষ্টি প্রসারিত করে। উপজাতীয় ধর্ম সম্পর্কে একটি নিশ্চিত ধারণা পেতে আমাদের বোঝা দরকার এটা কী নয়। এটা সার্বজনীন ধর্ম নয়, কিংবা এর অনুসারীরা এদের ধর্মপ্রচারের জন্য আদৌ আগ্রহী নন; যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে ধর্মপ্রচারকদের এক একটি সার্বজনীন ধর্মের অবকাঠামোর মধ্যে তাঁদের অবস্থান থাকে এবং তা প্রধান গোষ্ঠীগত বা উপজাতীয় আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একেবারেই ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করে। এর অনেক উদাহরণ রয়েছে। কিন্তু এর উদাহরণসমূহের ফলে বিপত্তিও সৃষ্টি হয়েছে। যেমন কিরঘিজ উপজাতি ইসলামের অনুসারী হয়েও টোটেমবাদের ওপর আস্থাশীল। এমনিতর উদাহরণ দিতে গিয়ে অনেকসময় তাত্ত্বিকেরা ধর্মীয় উপশাখাসমূহের সঙ্গে এর মিল খুঁজে পান। অন্য কথায়, তাঁরা ঐশীবাণী প্রাপ্ত (Relealed Religion) আধুনিক সমাজে প্রচলিত ধর্মের মধ্যেও যে ধারা (sect) সমূহের বিকাশ ঘটেছে তার সঙ্গে এর তুলনা করেন। তবে একটু গভীর অনুশীলনে এটা প্রতীয়মান হয় যে, ধারা (sect) সমূহের আবির্ভাব সনাতন ধর্মের বিকশিত রূপ; অর্থাৎ পরিণত পর্যায়ে এগুলো দেখা দেয়। যেমন কিরঘিজ সম্প্রদায়ের আচার অনুষ্ঠান, সেখানে ইসলাম ধর্মের প্রচার হবার অনেক আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। অনুরূপভাবে খ্রিষ্টিয় গারো সম্প্রদায় কিংবা বৌদ্ধ মারমা সম্প্রদায় নিজস্ব ধর্মান্তরিত ধর্মবিশ্বাসের প্রতি অবিচল থেকেও প্রাচীন কৃষ্টি পালন করে চলেছে।

আলোচনার মাধ্যমে অবশ্য উপজাতীয় ধর্মের আদি রূপের কোন ধারণা পাওয়া যাবে না। প্রকৃতপ্রস্তাবে, উপজাতীয় ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো এদের ধর্মীয় ঐতিহ্যের মধ্যেই নিহিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই ধর্মীয় অনুভূতি যুগ যুগ ধরে প্রচলিত কাহিনীর ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। এমনিভাবে এর কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন রূপও পরিলক্ষিত হয় যা নৃবিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত করেছেন। এগুলো প্রধানত টোটেমিজম, ফেটিশবাদ, এনিমিজম, এনিমাটিজম ইত্যাদি নামে পরিচিতি লাভ করেছে। এর মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে প্রাচীন হলো টোটেমবাদ যার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, কোন একটি

গাছ বা জীবকে আরাধ্য বা দেবতা জ্ঞানে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করা ও অনেক সময় পূজাও করা। টোটেম শব্দটি ওজিবোয়া রেড ইন্ডিয়ানদের মধ্যে প্রচলিত ছিল যা প্রকৃতপক্ষে রক্তসম্পর্কীয় ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে যুক্ত। আসলে টোটেমভূক্ত গোষ্ঠী মনে করে যে, তারা একই বংশোদ্ভূত, ফলে তাদের মধ্যে পারস্পরিক বিবাহ নিষিদ্ধ। টোটেমকে অবশ্য টোটেমভূক্ত ব্যক্তিবর্গের কোন পূর্বপুরুষের সঙ্গে যুক্ত কোন প্রাণী বলে কখনো কখনো মনে করা হয়। অবশ্য এর কোন অলৌকিক শক্তি নেই বা এটি কোন অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রতীকও নয় বরং এই প্রত্যয়টিকে অনেক প্রাচীন বা আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে এক প্রকার ধর্মীয় উপসর্গ বা সামাজিক সংগঠনের বিশেষ ধরণ হিসেবে গণ্য করা স্বাভাবিক। একটি আদিবাসীর (Tribe) ক্ষেত্রে টোটেমবাদের প্রতিফলন তখনই ঘটে যখন তা সীমিত ও নির্দিষ্ট কয়েকটি গোষ্ঠীতে (Clan) বিভক্ত হয়ে থাকে বা বাহ্যত নির্দিষ্ট সংখ্যক দল বা গোষ্ঠীতে আত্মপ্রকাশ করে। এদের প্রত্যেকেরই কোন না কোন জীব বা উদ্ভিদের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে যা টোটেম নামে অভিহিত হয়। এই সম্পর্কটি প্রত্যেক গোষ্ঠীর জন্য আলাদা হলেও এর ধরন একই প্রকৃতির। এদের কোন সদস্য সাধারণত দল বদল করতে পারে না। তবে একই গোত্রের বিভিন্ন গোষ্ঠী দল একই অঞ্চলে বসবাস করে। গোষ্ঠীর কাছে টোটেম একটি ভীতিপ্রদ অথচ অনুকরণীয় অতি ক্ষমতা সম্পন্ন প্রাণী। কোন কোন ক্ষেত্রে এটি আবার একটি ভোজ্য উদ্ভিদ। এমনকি, প্রধান খাদ্যবস্তুও হতে পারে। তবে সাংবাৎসরিক নিষিদ্ধ খাদ্য অথবা কেবল বছরের নির্দিষ্ট কোন পার্বণে ভক্ষণ-সিদ্ধ খাদ্যও টোটেম-বস্তু হতে পারে (Durkheim, 1966 : 123)।

টোটেম গোষ্ঠী নিজেদের মধ্যে অথবা নির্ধারিত অন্যান্য গোষ্ঠীর বাইরে যৌন সম্পর্কে আবদ্ধ হয় না। তবে এটা বিবাহের পরিবর্তে রক্ত সম্পর্কীয় বংশধারা বলে অভিহিত হতে পারে। প্রায় টোটেমগোত্র প্রাচীন কল্পকাহিনী এবং প্রাতিষ্ঠানিক কঠোর নৈতিকতার দ্বারা আবদ্ধ থাকে। টোটেম দলের বা গোত্রের সদস্যপদ এক অর্থে আমৃত্যু, বংশানুক্রমিক এবং যৌনমিলনের ও সন্তান ধারণের জন্য অত্যন্ত কঠিন নিয়ম ও নিয়ন্ত্রণে আবদ্ধ, যদিও আপাতদৃষ্টিতে এটা যৌথ বিবাহ হিসেবে গণ্য হয়। এক কথায় টোটেম, ট্যাবু ও বহুবিবাহ এই প্রাচীন গোত্রসমূহের জীবনের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত (Durkheim, 1966 : 125-126)।

এ কথা মনে করার কোন কারণ নেই যে, টোটেমবাদ পৃথিবীর যেসব আদিবাসীদের মধ্যে অদ্যাবধি প্রচলিত রয়েছে, তারা সবাই একই ধরণের আচার আচরণ অথবা বিশ্বাস দ্বারা প্রভাবিত।

এমনকি বিভিন্ন মহাদেশের টোটেমবাদী আদিবাসীদের মধ্যেও যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। বর্তমানে কোন আদিবাসী গোত্রই এই সনাতনী টোটেমবাদী সূত্রের সব শর্ত পূরণ করে না। তা সত্ত্বেও একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে, বর্তমানে অনেক আদিবাসী গোত্রেই এর বিভিন্ন উপসর্গ কম বেশি বিদ্যমান। একটা ব্যাপারে খুবই সন্দেহ রয়েছে এবং সেটি হলো টোটেমবাদের রূপ প্রকৃতিগতভাবে বিভিন্ন মহাদেশে পরিলক্ষিত হলেও এগুলো কি একই উৎস হতে উৎপন্ন? প্রশ্নটি অন্যভাবে উত্থাপিত করে বলা যায় যে, টোটেমবাদের একক সূত্র তত্ত্ব অথবা বিবর্তনবাদী তত্ত্ব কতটুকু গ্রহণযোগ্য? গেল শতাব্দীর মাঝামাঝি একক বা বিবর্তনবাদী তত্ত্বের বিপরীতে জৈব মানসিক ব্যাখ্যাও ব্যাপক স্বীকৃতি লাভ করেছে। সে যাই হোক, টোটেমবাদের অপভ্রংশ কিংবা এর ক্ষীণধারা অদ্যাবধিও বর্তমান। প্রায় সবগুলো অস্ট্রেলীয় আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে টরেস প্রণালী ও অস্ট্রেলীয় নিউগিনির উপকূলবর্তী গোত্রসমূহের মধ্যে মাইক্রেনেশীয়, পলিনেশীয়া, সুমাত্রা ও ইন্দোনেশীয় আদিবাসী গোষ্ঠীসমূহের মধ্যে কমবেশি এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ভারত উপমহাদেশেও বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে এর অপভ্রংশ বিদ্যমান। আফ্রিকার বান্টুগোত্রের মধ্যে এবং মধ্য ও পূর্ব আফ্রিকার মিলেটিক গোষ্ঠীসমূহে এর প্রভাব বর্তমান। পশ্চিম আফ্রিকার গোল্ডকোস্ট ও আইভরি কোস্টের গোত্রসমূহেও এর স্বাভাবিক প্রকরণ পরিলক্ষিত হয়। উত্তর আফ্রিকার আদিবাসীদের মধ্যে যেখানেই কৃষি ভিত্তিক সমাজ বর্তমান সেখানেই এর প্রভাব লক্ষ্যযোগ্য। কলম্বিয়া ও গিনির বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে এর প্রভাব রয়েছে বলে অনেকে অভিমত ব্যক্ত করেন। মধ্য এশীয় কিরঘিজ গোত্রে এবং ইন্দো-ইউরোপীয় ও সেমিটিক গোত্রসমূহের মধ্যকার অনেক আদিবাসী গোত্র এর দ্বারা প্রভাবিত বলে অনেক নৃতাত্ত্বিকের বিশ্বাস। তবে এর প্রকরণ ও অপভ্রংশ সম্পর্কে সুস্পষ্ট মতামত অদ্যাবধি নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি (Durkheim, 1966 : 136)। তাত্ত্বিক বিচারে এই টোটেমবাদ একটা বড় ধরণের প্রশ্নবোধক চিহ্ন বলে গণ্য হতে পারে। প্রথমত এর বিশ্বাস ও ব্যবহারিক দিকের পার্থক্য নির্ণয় করা প্রায় অসম্ভব; কেননা ইতোমধ্যে বিভিন্ন আধুনিক সমাজের ঐশীবাণীপ্রাপ্ত ধর্মের (Relealed Religion) প্রভাব আদিবাসী গোত্রসমূহে ব্যাপক পরিবর্তন এনে দিয়েছে। বিশেষ করে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কোথাও ইসলাম কোথাও বা খ্রিষ্টধর্ম প্রভাব সৃষ্ট করেছে এর মৌলিক ভিত্তি পরিবর্তনে। পক্ষান্তরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উপজাতিদের মধ্যে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম টোটেমবাদের সঙ্গে অভূতপূর্ব একটা সংমিশ্রণের মাধ্যমে এর প্রকৃতিগত একটা মৌলিক ধারা সৃষ্টি করেছে; ক্ষেত্র বিশেষে প্রাচীন টোটেমবাদের চরিত্রকে প্রায় আচ্ছন্ন করে ফেলেছে বললে অত্যুক্তি হয় না।

টোটেমবাদের উৎপত্তি সম্পর্কে তাত্ত্বিকদের মধ্যে রয়েছে প্রচুর মতভেদ। হার্বার্ট স্পেনসার এটাকে ডাক নামের অপব্যাখ্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। জি. এ. উইলকিন্স এটাকে মানুষ ও পশুর আত্মার পূর্বজন্মের বিশ্বাস বলে মনে করেন। এ. সি. হ্যডন টোটেমবাদের উৎপত্তিকে দেখেছেন গোত্রবহির্ভূত ব্যক্তি বা জাতিসমূহ কর্তৃক আঞ্চলিক টোটেম গোত্রের প্রধান খাদ্যের নামানুসারে চিহ্নিতকরণ হিসেবে; আবার এফ. বোয়াস এটাকে দেখেছেন ব্যক্তি অভিভাবকের আত্মার উত্তরাধিকার গোত্রের মধ্যে বিস্তৃতিকরণ হিসাবে। প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী ডুর্খিম টোটেমকে দেখেছেন গোষ্ঠীর সামাজিক বন্ধনের একটা আধ্যাত্মিক ঐক্যের প্রতীক হিসাবে। অপরপক্ষে ফ্রয়েডের অনুসরণে মনোসমীক্ষণবাদীগণ টোটেমবাদকে জীবজন্তুর মধ্যে পারিবারিক গুণাগুণের প্রতীক রূপে মনে করেন (LaBarre, 1967 : 104)। জে. বি. ফ্রেজার তাঁর চার খণ্ডে লিখিত *Totemism & Exogamy* গ্রন্থে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্বের উল্লেখ করেছেন। (ক) টোটেম গোত্র বা গোষ্ঠীসমূহের মধ্যে বিভাজিত আত্মার পূনরাবির্ভাবের ও পুনর্জন্মের আকর (Repository) (খ) টোটেমবাদ একটি গোষ্ঠী বা দলের প্রধান খাদ্যের নিশ্চয়তা সম্পর্কিত একটা ঐন্দ্রজালিক ব্যবস্থা এবং (গ) টোটেমবাদ একটা প্রক্রিয়া যা পিতৃত্ব নির্ধারণে আদিযুগের মানুষের প্রজনন সম্পর্কিত ধারণা পোষণ করার ব্যবস্থা। বলা বাহুল্য, এই সব তত্ত্বকে সর্বজনীন কোন ধারা বলে গণ্য করা যায় না। কেননা এগুলো সীমিত সংখ্যক আদিবাসী গোষ্ঠীর বিশ্বাসকেই চিত্রিত করে (Wagner, 1987 : 547)।

আদিবাসীদের মধ্যে টোটেমবাদের পাশাপাশি সর্বপ্রাণবাদ ও (Animism) ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে। লাতিন শব্দ 'anima' থেকে এর উদ্ভব, যার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে জীবন বা আত্মা। জীববিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানে সর্বপ্রাণবাদের ধারণা এই যে, মন বা আত্মা একটি নিজস্ব উপাদান যা মস্তিষ্ক ও ইন্দ্রিয়ের সহযোগিতায় পূর্ণাঙ্গতা অর্জন করে। দর্শনে এই তত্ত্ব প্রাকৃতিক বস্তুর প্রতিটি রূপকেই জীবন্ত বলে মনে করে। অর্থাৎ প্রতিটি বস্তুর মধ্যেই একটি আত্মা বিরাজমান। দার্শনিক ধারণা অনুযায়ী সর্বপ্রাণবাদ বস্তুর অন্তর্নিহিত তেজের অস্তিত্বকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে।

সর্বপ্রাণবাদ টাইলরের আলোচনার মাধ্যমেই সর্বাধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। তাঁর মতে, অতি আদিকালে মানুষের জীবন ও জগৎ সম্পর্কে ধারণা অস্পষ্ট থাকার কারণে নিদ্রা, স্বপ্ন কিংবা মৃত্যুকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সকল বস্তুর মাধ্যমেই মানুষ আত্মার সম্বন্ধে ব্যাপৃত ছিল। তিনি বলেছেন, মানুষের অস্তিত্বের প্রশ্নে প্রাচীনকালে সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাসী আদিবাসীরা মনে করত যে, মানুষের দুটি

সত্ত্বা রয়েছে যার একটি হচ্ছে জীবন বা কায়া, অপরটি হচ্ছে আত্মা বা ছায়া। তিনি মনে করেন, ধর্মের উৎপত্তি ঘটেছে এখান থেকেই। কায়া (দেহ) ও ছায়া (আত্মা) উভয়ই দেহকে অবলম্বন করে পার্থিব কাজকর্ম সম্পাদন করে। অর্থাৎ এই দুটো উপাদান দেহ থেকে অপসারিত হলেই মৃত্যু ঘটে। টাইলরের মতে, আদিম পর্যায় থেকে মানুষ ক্রমান্বয়ে কিছুটা উন্নতি সাধন করলে এই আত্মার বিবর্তন সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা শুরু হয় এবং এই পর্যায়ে জীবন ও আত্মার সহযোগের মাধ্যমে অপচ্ছায়া বা ভূতের আবির্ভাব সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে তারা এই অপচ্ছায়ার অনুপ্রবেশ অন্যান্য জীব, এমনকি বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে আবিষ্কার করতে থাকে। বস্তুত, টাইলরের মতে ধর্ম হচ্ছে মানুষের জীবনের অস্তিত্বের সঙ্গে এই ধরণের অবস্থাগত সত্তার সম্পর্ক স্থাপনের প্রক্রিয়া। অধুনা প্রাচীন গোত্রসমূহের ধারণায় এই অবস্তুগত সত্তার প্রভাব ব্যাপক এবং প্রাকৃতিক জগতে মারাত্মকভাবে তা বিরাজমান (Balle, 1987 : 297)। টাইলরের বিস্তারিত আলোচনা ও ব্যাখ্যা নৃবিজ্ঞান জগতে বেশ খানিকটা জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও এর সমালোচনা হয়েছে প্রচুর। বর্বর গোষ্ঠীর দার্শনিক চিন্তাধারা বলে তিনি যে ধারণাগুলোর ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছেন, বিশেষ করে তাদের প্রকৃতির যাবতীয় বস্তুর জীবন্ত অস্তিত্ব সম্পর্কে, সে সম্পর্কে ম্যারেট তীব্র সমালোচনা করেছেন। ম্যারেট এ সম্পর্কে সর্বপ্রাণবাদ অথবা প্রাকসর্বপ্রাণবাদ (animatism or preanimism) নামে বিভিন্ন প্রত্যয়ের অবতারণা করেছেন। তাঁর মতে একটি বস্তু সততই আত্মার অধিকারী হয় না এবং প্রাচীন গোত্রসমূহের মধ্যে এই ধারণা থাকাটাও স্বাভাবিক নয়। আদিবাসীদের গোত্রসমূহে প্রাচীনকালেও দেহ ও আত্মার এই পার্থক্য নির্ণয় করা সম্ভব ছিলনা বলেই তিনি মত প্রকাশ করেছেন। পক্ষান্তরে, তাঁর মতে, নির্জীব বস্তুর দ্রব্যগুণের বিচার করতে গিয়ে তার ভেতর প্রাচীন গোত্রসমূহ বিশেষ শক্তির (আত্মার নয়) সন্ধান পেয়েছিল বলে মনে করা যেতে পারে। এখান থেকে আদিবাসী গোত্রসমূহের মধ্যে প্রচলিত mana প্রত্যয়টির সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন যা একটি দৈহিক শক্তির বাইরে ভিন্নতর একটি শক্তিরূপে কাজ করে চলে বলে তারা মনে করতো। এটাকে energy বা শক্তি হিসেবে তারা চিহ্নিত করে যা হস্তান্তরযোগ্য, এমনকি সংক্রামক বলেও তারা মনে করে (Marett, 1914 : 103-105)।

সর্বপ্রাণবাদ বা প্রাকসর্বপ্রাণবাদের অস্তিত্ব অদ্যাবধি বর্তমান। শুধু আদিবাসী গোত্রের মধ্যেই নয়, কোন কোন ক্ষেত্রে এটা সভ্য সমাজের বিভিন্ন আচার আচরণেও প্রকাশ পায়। আফ্রিকার অনেক সম্প্রদায়ের মধ্যেই এই বিশ্বাস ধর্মীয় পর্যায়ে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের প্রচলন করেছে; যেমন পাথর

পূজা, কিংবা বিশেষ ধরণের পাথরের কবচ ধারণ এই বিশ্বাসের প্রতিফলন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সর্বপ্রাণবাদ এবং পূর্বপুরুষের পূজা গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। কেননা সর্বপ্রাণবাদ মনে করে মৃতদেহ থেকে আত্মার পৃথকীকরণের মাধ্যমে তার অবস্থান দেহের কাছাকাছি থাকে এবং ওই আত্মার আরাধনা ও উপাসনা ও খাদ্য সরবরাহ ধর্মীয় কাজ বলেই গণ্য হয়। প্রায় তিন হাজার বছর পর্যন্ত চীনের ভূখণ্ডে এই ধারণার ব্যাপকতা ছিল এবং ম্যারেট বর্ণিত প্রাক-সর্বপ্রণবাদের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রকৃতির উপাসনা তথাপি নিঃসন্দেহে একথা বলা চলে যে, সকল প্রকৃতির উপাসনাই হল সর্বপ্রাণবাদ। কখনো কখনো এর মধ্যে mana -র (অর্থাৎ বস্তুর মধ্যে পবিত্রতা অপবিত্রতা) কারণে আদিবাসীদের ধর্মে প্রকৃতির উপাসনা দেখা যায়। আবার ক্ষেত্র বিশেষে এর মধ্যে একেশ্বরবাদের চিহ্নও দেখা যায়। তবে এর মধ্যে বিশেষ যে ধারণাটি প্রতিভাত হয় তা হলো, পূর্বপুরুষদের আত্মার সদগতির জন্য উপাসনা করতে হবে যেন তাদের প্রেতাত্মা দানবে পরিণত না হয়। একই সঙ্গে বিদেহী আত্মার শক্তি যা পাহাড়ে, জঙ্গলে, নদীতে কিংবা গুহায় অবস্থান করছে, তাকে সন্তুষ্ট করার প্রবণতাও এতে লক্ষ্য করা যায় (Balle, 1987 : 299)। এখানে বলা প্রয়োজন যে, পূর্বপুরুষ-পূজা অনেক আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল এবং তা সর্বপ্রাণবাদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বলে অনেকে মনে করেন। তবে এর কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ধারণ অর্থাৎ পূর্বপুরুষ পূজা কি সর্বপ্রাণবাদের কারণ না ফলাফল তা অদ্যাবধি নিরূপিত হয়নি।

আদিবাসী গোত্রসমূহের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, আত্মার মুক্তি বা সদগতির জন্য Shaman বা বৈদ্যের বিশেষ ভূমিকা। আদিবাসী বেশকিছু গোত্রের মধ্যে গোত্রপ্রধান ধর্মীয় নেতা বলে গণ্য হন এবং তার কিছু অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা আছে বলে মনে করা হয়। ঝাড়ফুঁক কিংবা বিশেষ অনুপানের মাধ্যমে রোগমুক্তির ধারণা এখানে প্রধান। স্বভাবত এর মাধ্যমে কিছু ঐন্দ্রজালিক কলাকৌশল প্রদর্শনও গোত্র প্রধানের ক্ষমতার উৎস বলে মনে করা যেতে পারে। ম্যাজিক বা ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ম্যালিনস্কি বলেন:

> *'ম্যাজিকের ভূমিকা হচ্ছে মানুষের আশাবাদের একটি আনুষ্ঠানিক ভিত্তি প্রদান করা'।*

এর মাধ্যমে মানুষ বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করে, ভয়ের বিপরীতে আশার জয়কে নিশ্চিত করে (Malinowski, 1984 : 90)।

ঐন্দ্রজালিক প্রভাবের বলয় আদিবাসী ধর্মে অতিমাত্রায় বিস্তৃত। কখনো কখনো এর প্রভাব আধুনিক সমাজের বিশ্বাসকেও স্পর্শ করে। বিশেষ করে সভ্য সমাজের প্রচলিত ধর্মসমূহের মধ্যেও অনেক ধর্মীয় নেতা বা গুরু এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। এখানে যে বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করে তাকে আদিবাসী ধর্মের মধ্যে ফেটিশবাদ (Feticism) বলে অভিহিত করা হয়। এটি হলো কোন একটা ক্ষুদ্র বস্তুর মধ্যে (সেটা পাথর, কবচ বা প্রাকৃতিক যেকোন বস্তুই হোক না কেন) অতিপ্রাকৃত শক্তি কল্পনা করা যা সাধারণভাবে বিভিন্ন অঞ্চলে দ্রব্যগুণ বলে অভিহিত হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়াতে পূর্ব আফ্রিকায় এবং কঙ্গো অঞ্চলে পর্তুগীজ ঔপনিবেশিকরা এই বিশেষ ধরণের বিশ্বাসকে এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে পূর্ব ইউরোপে যে ঐন্দ্রজালিক উপসর্গ আত্মপ্রকাশ করেছিল তারই আলোকে পর্তুগীজ Feticio শব্দটির প্রয়োগ করা হয়েছিল। ফরাসিদের দ্বারা এই ধারণারে ফরাসি নামকরণের মাধ্যমেই Fetiche শব্দটির পরিচিতি ঘটে। ফরাসি দার্শনিক অগাস্ট কোঁৎ অবশ্য এটাকে আদিতম ধর্মবিশ্বাস হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। যার দ্বারা তিনি মানুষের গুণাবলী অন্যান্য প্রাণির মধ্যে প্রতিফলিত হয় বলে মনে করেন। বোধহয় তিনি মিশরের পিরামিডকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ ধর্মীয় ভাবের আদিরূপ বলে মনে করেছিলেন। অবশ্য প্রখ্যাত নৃবিজ্ঞানী টাইলর (E. B. Tylor) কোঁৎ বর্ণিত এই ধর্মীয় ভাবকে animism বা প্রাণবাদ আখ্যা দিয়েছেন এবং Feticism বলতে বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে কোন একটি বা একাধিক আধ্যাত্মিক শক্তির স্ফূরণ বা প্রকাশকে বুঝিয়েছেন (Herskovits, 1948 : 368)। এখানে বলা প্রয়োজন, টাইলরের ধারণাই সর্বজন স্বীকৃত ধারণা বলে গণ্য হয়। বলাবাহুল্য বস্তুর গুণাবলী হিসেবে ফেটিশ বস্তুকে (Fetish Object) ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতার আকর বলা হয়: কিন্তু অতিপ্রাকৃত শক্তির নিয়ন্ত্রক হিসেবে বর্ণনা করা হয় না। উপরে আলোচনা হতে বোঝা যায়, ফেটিশ বস্তুর প্রভাব আধুনিক সমাজের ঐশীবাদী ধর্মের (Revealed Religion) ব্যবহারিক আচার অনুষ্ঠানে কিংবা বিভিন্ন অনানুষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডেও পরিলক্ষিত হয়। এ সম্পর্কে অবশ্য গবেষণার প্রচুর অবকাশ রয়েছে। যেমন, বিভিন্ন ধরণের পাথরের ব্যবহার, মাদুলি বা কোন ধরণের তাবিজ গ্রহণ এই বিশ্বাসের অপভ্রংশ বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে কেননা মূল ধর্মে এর কোন সমর্থন নাও থাকতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ধর্মের মতই এই বিশ্বাস দৃঢ়মূল হতে পারে। এমনকি আধুনিক ধর্মের অনুসারীরাও ধর্মীয় পুরোহিত বা গুরুদের অনুসরণে এই ধরণের ফেটিশে বিশ্বাস স্থাপন করে থাকে। তবে প্রাচীনকালের ফেটিশবাদ বা বর্তমান আদিবাসী গোত্রসমূহে প্রচলিত ফেটিশের ওপর বিশ্বাস ঐশীধর্মে বিশ্বাসের সঙ্গে আদৌ সঙ্গতিপূর্ণ নয়

বলে প্রতীয়মান হয়। আদিবাসী ধর্ম ও আধুনিক সমাজে প্রচলিত ধর্মসমূহের পার্থক্য এই কারণেই বিশেষভাবে আলোচনার অপেক্ষা রাখে। এখানে অবশ্যই আদিবাসী ধর্মের সঙ্গে খ্রিষ্ট বা বৌদ্ধধর্মের সংমিশ্রণ (Syncretism) বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

৩.৩। আদিবাসী ধর্ম ও সমাজ– পারস্পরিক সম্পর্ক :

উপজাতীয় গোষ্ঠীসমূহের ধর্মবিশ্বাসের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ থেকে একটি বিষয় স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আদিবাসী ও উপজাতীয় গোষ্ঠীর ধর্ম ও সমাজ অত্যন্ত ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কযুক্ত। যদিও উপজাতির কোন নির্দিষ্ট বা সর্বজন স্বীকৃত সংজ্ঞা নেই। তবে সাধারণভাবে বলা যায়, উপজাতি বলতে বুঝায় এমন একটি জনগোষ্ঠী যারা মোটামুটিভাবে একটি অঞ্চলে সংগঠিত, যাদের মধ্যে রয়েছে সংস্কৃতিক ঐক্য এবং যার সদস্যরা মনে করে যে, তারা একই সাংস্কৃতিক এককের অন্তর্ভূক্ত। (Tylor, 1980 : 339)।

কোন রাষ্ট্রের মূল জনগোষ্ঠীর চেয়ে আদিবাসী গোষ্ঠীর কিছু ভিন্ন বৈশিষ্ট্য থাকে, যার ভিত্তিতে আমরা বুঝতে পারি তারা আদিবাসী গোষ্ঠী, ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী বা উপজাতি গোষ্ঠী। জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশন, আই.এল.ও (ILO), বিশ্ব ব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক আইন কোন গোষ্ঠীকে আদিবাসী হিসেবে গণ্য হওয়ার জন্য চারটি বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করেছে। এগুলো হলঃ (ক) উপজাতি বা আদিবাসী গোষ্ঠীর সদস্যরা এমন একটি এলাকার বসবাস করে যা প্রায় নির্দিষ্ট। তারা সাধারণত: তাদের পূর্বপুরুষের বসবাসস্থানেই বাস করে যা অন্য এলাকা থেকে ভৌগলিকভাবে স্বতন্ত্র। (খ) তাদের এলাকায় তারা ভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনা করতে চেষ্টা করে। (গ) তারা যে রাষ্ট্রে বসবাস করে সে দেশের জাতীয় সমাজে তারা পুরোপুরি মিশে না গিয়ে তারা ভৌগলিকভাবে, সাংস্কৃতিকভাবে এবং প্রতিষ্ঠানিকভাবে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে চেষ্টা করে। (ঘ) তারা নিজেদের আদিবাসী গোষ্ঠী বা উপজাতীয় গোষ্ঠী বলে পরিচয় প্রদান করে (Quader, 2008 : 5)।

বাংলাদেশের উপজাতি বা আদিবাসী গোষ্ঠীগুলো সম্পর্কে যে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে তা থেকে আমরা বাংলাদেশের উপজাতিগুলোর ধর্মের কতগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করতে পারি: (ক) অধিকাংশ আদিবাসীর কোন লিখিত ধর্মগ্রন্থ নেই। তাদের ধর্মবিশ্বাস ও কর্মকাণ্ডে

মিথোলজি বা উপকথার গুরুত্ব খুব বেশি, (খ) তাদের জীবন উৎসব ও আনন্দে পরিপূর্ণ, (গ) নাচ ও গান তাদের ধর্মীয় জীবনে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে, (ঘ) বিভিন্ন উপজাতির নিজস্ব অনুষ্ঠান আছে। যেমন-চাকমাদের কঠিন চীবর দান, গারোদের ওয়ানগালা, মনিপুরীদের রাস উৎসব প্রভৃতি, (ঙ) কালের বিবর্তনে আদিবাসী গোষ্ঠীগুলো কোন না কোন বিশ্বধর্ম গ্রহণ করেছে এবং (চ) আধুনিক কালে আদিবাসী ধর্ম ও সংস্কৃতির বিবর্তন লক্ষণীয়।

প্রকৃতপক্ষে বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের আদিবাসী গোষ্ঠীর মত বাংলাদেশের আদিবাসী গোষ্ঠীগুলোর সদস্যদের মধ্যের ঐক্যের অনুভূতি বিদ্যমান। অতীতে একই গোষ্ঠীর সদস্যদের সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক জীবন প্রণালী একই ধরনের হতো সেহেতু আর্থ-সামাজিক বৈষম্য খুব বেশি থাকতো না, একারণে তাদের মধ্যে ঐক্যের ধারণা আরো প্রবল হতো। কালক্রমে উপজাতীয় গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে পরিবর্তন আসলেও তাদের মধ্যে এখনও সংহতিবোধ তীব্র। কোন দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী বা শহুরে জনগোষ্ঠীর চেয়ে আদিবাসী গোষ্ঠীর ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের একটি বিশেষ পার্থক্য আছে। প্রকৃতপক্ষে আদিবাসী গোষ্ঠীর ধর্মীয় কর্মকাণ্ড, সামাজিক কর্মকাণ্ড ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড খুব স্পষ্টভাবে পৃথক করা যায়না। তাদের ধর্ম, সমাজ ও অর্থনৈতিক জীবন অত্যন্ত ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কযুক্ত। যেমন– জুম চাষের উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী বা পশু পাখি শিকারের উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর বাৎসরিক বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান জুম চাষ বা শিকারের সাথে সম্পর্কিত (Saad, 2011 : 93)।

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে সুন্দরবন এলাকার জনগোষ্ঠীর মধ্যেও একই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এ এলাকার জনগোষ্ঠী জীবিকার জন্য কোন না কোন ভাবে সুন্দরবনের উপর নির্ভরশীল। এখানে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে বাঘের আক্রমন থেকে রক্ষা পাবার জন্য 'বনবিবির' পূজা করে থাকে। বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের মত বাংলাদেশের আদিবাসী গোষ্ঠীগুলোর মধ্যেও লোকায়ত ধর্ম ও বিশ্বধর্ম একইসাথে লক্ষ্য করা যায়। তাদের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে লোকায়ত ধর্ম ও বিশ্বধর্মের সহাবস্থান ও সমন্বয়ের মাধ্যেমে এক নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে। তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী জলাশয়, জঙ্গলে বা কোন নির্দিষ্ট লোকালয়ে বসবাসকারী অশরিরী শক্তিগুলো তাদের জীবনের যেকোন ক্ষেত্রেই প্রভাব বিস্তার করতে পারে। তাদের সন্তুষ্ট করার জন্য পশু-পাখি বা ক্ষেত্রের ফসল উৎসর্গ করা হয়। কখনও তারা কোন বিশেষ অলঙ্কার ব্যবহার করে আত্মার কুদৃষ্টি থেকে রক্ষা

পাওয়ার চেষ্টা করে। তবে মহামারীর সময় সামাজিক বিচ্ছিন্নতার মত প্রথা তাদের অনুসরণ করতে দেখা যায় (Lewin, 1869 : 78)[১]।

এ প্রথায়ও যদি মহামারী থেকে উদ্ধার পাওয়া না যায় তাহলে সম্পূর্ণ গ্রাম পরিত্যাক্ত করার নিদর্শনও দেখা যায়। আদিবাসী ধর্ম ও সমাজের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তাদের সমাজিক ভোজ উৎসব। তারা সারা বছর বিভিন্ন কারণে এরকম ভোজ উৎসবের আয়োজন করে। কোন ব্যক্তি দলনেতা নির্বাচিত হলে দেবতাকে কৃতজ্ঞতা জানাতে গোষ্ঠীর অন্যান্য সদস্যদের ভোজে আমন্ত্রণ জানানো হয়। ফসল বোনার সময় অপদেবতাদের কুদৃষ্টি এড়ানোর জন্য পশুপাখি উৎসর্গ করা হয় ও ভোজের আয়োজন করা হয়। আবার ফসল ভালো হলে দেবতাকে কৃতজ্ঞতা জানাতে ভোজ ও নাচ-গানের উৎসবের আয়োজন করা হয়। আদিবাসী সমাজে এরকম ভোজ উৎসবের যারা আয়োজন করেন তাঁদের সমাজে অত্যন্ত সম্মানিত বলে গণ্য করা হয়। লোকায়ত ধর্ম ছাড়া পাবর্ত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রধান ধর্ম বৌদ্ধধর্ম। বৌদ্ধধর্ম একটি উদারধর্মী বিশ্বাস যা অন্যান্য বিভিন্ন মতবাদের প্রতি সহনশীল এবং প্রকৃতির আরাধনাকে এ ধর্মে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে। ফলে পাবর্ত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের একটি ভিন্ন প্রকরণ বিকাশলাভ করেছে এবং তা ভিন্নভাবে অধ্যয়ন না করলে এসব ধর্মবিশ্বাস বোঝা সম্ভব নয়। আদিবাসী সমাজে উপাসনালয়ের গুরুত্বও খুব বেশি। পাবর্ত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে খ্যাং বা বৌদ্ধমন্দিরে কেবল বুদ্ধের কাছে প্রার্থনা করা হয় তা নয়। খ্যাং গ্রামের শিশু, কিশোর, নারী, পুরুষ, বৃদ্ধ সকলের মিলিত হবার স্থানও (Lewin, 1869 : 39-40)। একইসাথে বৌদ্ধমন্দির আদিবাসী গ্রামের শিশুদের শিক্ষালয়। এখানে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপশি আদিবাসী সমাজে শিশুরা লেখা পড়াও শেখে (Schendal, May and Dewa, 2001 : 158)।

[১] In case of epidemies, the custom of quarantine, or, as it is called ‘Khang’ is universal among them... A sacrifice is offered, and the village is encircled with a fresh-spume white thread. The blood of the animal sacrificed is then sprinkled about the village, and a general sweeping and cleansing takes place, the houses and gates being decorated with green bough.

৪.১। আচিক্ মান্দি নৃগোষ্ঠীর পরিচয় :

সাধারণভাবে বলা যায় যে, আচিক্ মান্দি বাংলাদেশের গারো পাহাড় অঞ্চলে বসবাসকারী একটি আদিবাসী গোষ্ঠী। এদের বসতি একটু ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলেও মোটামুটিভাবে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐক্যের কারণে তারা একটি সমন্বিত ও অতি পুরনো একটি মাতৃতান্ত্রিক আদিবাসী গোষ্ঠী। এদের একটা বড় অংশই বাংলাদেশের বাইরে অর্থাৎ ভারতে বসবাস করছে। নৃবিজ্ঞানীদের মতে এরা মোঙ্গলীয় জাতিভুক্ত যাদেরকে তিব্বতী-বর্মন জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত বলে মনে করা হয় (Kamal et al., 2007 : 389)।

সিনক্রেটিজমের উদাহরণ হিসাবে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে আচিক্ মান্দি বা গারোরা অন্যতম প্রধান গোষ্ঠী। বিশ্বে তাদের বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় পাঁচ লক্ষ। তারা বসবাস করে উত্তর-পূর্ব ভারতে ও বাংলাদেশে, বিশেষ করে গারো পাহাড় সংলগ্ন এলাকায়। এ প্রসঙ্গে ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত বার্লিংয়ের (Burnling, 1997 : 6) -এর তথ্য গণ্য করা যেতে পারে[১]।

ভারতে তাদের আবাসস্থল আরো বিস্তৃত হয়েছে গারো পাহাড়ের পারিপার্শ্বিক এলাকায় খাসি পাহাড়, আসাম, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা এবং পশ্চিম বাংলা। আসামে গারোরা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় কয়েকটি জেলায় বসবাস করে। তবে তাদের অধিকাংশই গোপালপাড়া ও কামরূপ জেলায় বসবাস করে। নাগাল্যান্ডে কিছু গারো কোহিমা জেলার চুমুকদিনা এলাকায় বসবাস করে। ত্রিপুরার দক্ষিণাংশেও তারা বাস করে। পশ্চিমবঙ্গে তাদের আবাসস্থল জলপাইগুড়ি জেলায় এবং কোচবিহারে।

গারোদের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক পঞ্চামাংশ বাংলাদেশে বসবাস করে। বাংলাদেশে বসবাসকারী গারোদের অধিকাংশই ময়মনসিংহ, জামালপুর, শেরপুর, নেত্রকোণা-এসব সীমান্তবর্তী এলাকায় বসবাস করে। ময়মনসিংহে তাদের বসবাস ভালুকা, ফুলবাড়িয়া, মুক্তাগাছা, ফুলপুর, হালুয়াঘাট এবং ধোবাউরায়। শেরপুরে প্রায় সব উপজেলায়ই তাদের বাস–ঝিনাইগাতি, শ্রীবর্দী, নলিতাবাড়ি, নকলা এবং শেরপুর সদর। নেত্রকোণার তাদের দেখা যায় দুর্গাপুর, কমলাকান্দা এবং পূর্বধলায়। বর্তমান টাঙ্গাইল জেলায় তাদের একটা বড় অংশ বসবাস করে। টাঙ্গাইল জেলার শেরপুর

[১] "The Garo Hills District holds the largest numbers of Garo people. It forms the Western position of the Indian State of Meghalaya and the Western position of the Shillong plateau that divides Assam from Bengal."

উপজেলার অল্পকিছু গারো বাস কলে। ঢাকায় বর্তমানে প্রায় ৫০০০ জন গারো বাস করে, যাদের অধিকাংশই লেখাপড়া বা কর্মসূত্রে ঢাকায় এসেছে। একই কারণে চট্টগ্রাম শহরেও প্রায় এক হাজার গারো বাস করে। বর্তমানে কিছুসংখ্যক গারো সিলেট, মৌলভীবাজার ও সুনামগঞ্জ জেলায় বাস করতে দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে বার্লিং (Burnling, 1997 : 4) -এর বক্তব্যটি সুসংগত[২]।

'উপজাতি' (Tribe) শব্দটি ব্যবহারে নৃবিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকের আপত্তি থাকলেও গারোদের উপজাতি হিসেবে অভিহিত করা হলে এখনও পর্যন্ত তারা খুব একটা অসন্তুষ্ট নয়। বরং এই অভিধা তাদের পাশাপাশি বসবাসকারী হিন্দু ও মুসলিম জনগোষ্ঠী থেকে আলাদা ভাবতে সাহায্য করে। এই সাতন্ত্রবোধই তাদের কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। অবশ্য নৃবিজ্ঞানের গবেষকের জন্য বৃহত্তর বাঙালী জনগোষ্ঠীর থেকে তাদের প্রাথমিক পার্থক্য বোঝার জন্য খুব বেশী গভীর পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন নেই। গারোদের ভাষা টিবেটো বার্মান (Tibeto-Burman) শ্রেণীভুক্ত, যা পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশের ভাষার সাথে সম্পর্কিত। অন্যদিকে তাদের পাশাপাশি বসবাসকারী প্রতিবেশী বাঙালীদের ভাষা ইন্দো-এরিয়ান (Indo Aryan) শ্রেণীভুক্ত। হিন্দুধর্ম গারোদের কখনই আকর্ষণ করেনি এবং ইসলামধর্মে ধর্মান্তরিত হতেও তারা কখনই আগ্রহী ছিলনা। তাদের অধিকাংশই বর্তমানে খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে, কিন্তু অল্পসংখ্যক গারো এখনও তাদের পূর্বপুরুষের ধর্ম অনুসরণ করছে। গারোরা তাদের পাশাপাশি বসবাসকারী জনগোষ্ঠী থেকে কেবল সাংস্কৃতিক দিক থেকে ভিন্ন তাই নয় বরং তাদের থেকে গারোদের চেহারাও অনেক ভিন্ন। তাদের মুখায়ব দেখে বাংলাদেশ বা ভারতের মানুষের চেয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কিছু দেশ, যেমন ইন্দোনেশিয়ার মানুষদের সাথে বেশি মিল আছে বলে মনে হয় (Burnling, 1997 : 1)। বার্লিং এ প্রসঙ্গে বলেন, ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের মেঘালয় রাজ্যে গারো অধুষ্যিত এলাকায় যখন তিনি কাজ করছিলেন তখন গারোদের থেকে ভারতীয় বাঙালীদের পার্থক্য ছিল খুব স্পষ্ট। বাঙালী গ্রামে বাড়িঘর মাটি দিয়ে তৈরী, নারী পুরুষের পোষাক শাড়ি ও ধুতি, তাদের ভাষা বাংলা। বাঙালী গ্রামে সমতলভূমিতে, ভিজা ক্ষেতে ধান উৎপন্ন হয়। অন্যদিকে বাঙালী গ্রাম থেকে মাত্র আধা ঘণ্টার হাঁটা পথ পার হলেই চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। ধানক্ষেতের পর একটি বনের পথে সামান্য হাঁটলেই দেখা যাবে

[২] "About 100,000 Mandis live in Bangladesh, most of them in a fringe of territory only few kilomiters wide that stretches along the southern edge of the Garo Hills. In 1947 when the British India was partitioned its independent India and Pakistan… Garo population has gradually taken hold among the Mandis of Bangladesh."

সেখানে বন পুড়িয়ে পরিষ্কার করে জুমচাষ পদ্ধতিতে শুকনো ক্ষেতে ধান চাষ করা হচ্ছে। খানিক দূরেই গারো গ্রামে প্রবেশ করলে দেখা যাবে এখানে সংস্কৃতির দৃশ্যমান ও বস্তুগত সমস্ত কিছুই ভিন্ন। বাড়িঘর মাটির বদলে এখানে বাঁশ দিয়ে তৈরী। পুরুষরা এখানে ধুতির বদলে এক ফালি কাপড় পরিধান করে এবং নারীরাও স্কার্ট স্বদৃশ্য একধরণের পোশাক পরিধান করে। তৈজসপত্র, ঝুড়ি, গহনা প্রতিটি জিনিসই এখানে ভিন্ন। তবে সমাজব্যবস্থার ভিন্নতাই বেশী গুরুত্বপূর্ণ। বর্ণপ্রথার মতো কোন কিছুর অস্তিত্ব এখানে নেই। শিশুরা মাতৃসূত্রীয় ধারায় তার মায়ের পদবী অনুসরণ করে, জ্ঞাতি সম্পর্কের দিক থেকে মায়ের গোত্রের অন্তর্ভূক্ত বলে বিবেচিত হয়, পিতার নয়।

তবে গারোদের থেকে তাদের প্রতিবেশীদের একটি বড় পার্থক্য গারো সমাজে নারীদের অবস্থান। এবং এ কারণেই গারো নারীর আচার আচরণও স্পষ্টতঃই ভিন্ন। ভারত বা বাংলাদেশে তাদের প্রতিবেশী সমাজের নারীরা খানিকটা পর্দাপ্রথায় অভ্যস্ত এবং তারা সহজে অপরিচিত মানুষের সামনে আসতো না। কিন্তু গারো নারীরা বহু পূর্ব থেকে স্বাধীনচেতা এবং অপরিচিত মানুষের সামনেও কথা বলতে তাদের লজ্জা পেতে বা অপ্রস্তুত হতে দেখা যেত না। একারণেই বার্লিং (Burnling, 1997 : 2) -এর বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য[৩]।

গত দুই শতকে গারো সংস্কৃতিতে বেশ কিছু পরিবর্তন এসেছে। তবে পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে এ পরিবর্তন খুব বেশি নয়। বহুবছর ধরে হিন্দু ও মুসলিম প্রতিবেশীদের পাশাপাশি বসবাস করা সত্ত্বেও তাদের সংস্কৃতি থেকে প্রায় কিছুই তারা গ্রহণ করেনি। এমনকি ইংরেজ শাসকরা এদেশে আগমনের পরও কিছুদিন তাদের ওপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। রাজনৈতিক ক্ষমতা হারানোর পরও এক শতকের বেশি সময় ধরে তারা তাদের স্বকীয়তা বজায় রেখেছিল। পরিবর্তনশীল প্রযুক্তির প্রভাব, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, নতুন ধর্ম গ্রহণ এসব কিছুর পরও গারোরা একটি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী হিসেবে স্বতন্ত্র এবং সহজেই তাদের প্রতিবেশীদের থেকে তাদের আলাদা করা যায়।

অতীতের মতো ভবিষ্যতেও গারোরা তাদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র কতটা রক্ষা করতে পারবে তা খুব সহজে অনুমান করা সম্ভব নয়। তবে বর্তমানে গারোদের জীবনযাত্রায় সবক্ষেত্রে পরিবর্তনের মাত্রা

[৩] "The role of women is just one trait among many that distinguishes the Garos, but it is a central trait and one that they and their Hindu and Muslim neighbors recognize as clearly as do Westerners."

সমান নয়। সাম্প্রতিককালে উন্নত প্রযুক্তি এবং খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ তাদের জীবনব্যবস্থায় নাটকীয় পরিবর্তন এনেছে বলে বাহ্যিকভাবে মনে হয়। তবে সামাজিক প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে গোত্র সম্পর্কের ক্ষেত্রে সে তুলনায় পরিবর্তন আসেনি। গারো সমাজে নারী-পুরুষের অবস্থান, বিশেষ করে সমাজে নারীর ভূমিকা তাদের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। সাম্প্রতিককালে গারো নারীর অবস্থান ও ভূমিকার অবশ্যই কিছুটা পরিবর্তন এসেছে, তবে বাহ্যিক সমাজ ও পরিস্থিতির প্রভাবে তুলনায় এ পরিবর্তন খুব বেশী নয়।

বর্তমান অভিসন্দর্ভের পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে গারো নামের উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যাখ্যা রয়েছে। কিন্তু একটি বিষয়ে প্রায় সকল গবেষকই একমত যে, গারো নামটি তারা নিজের দেয়নি বরং তাদের নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর বাইরের লোকেরা তাদের এ নামে সম্বোধন করতে শুরু করেছিল। পূর্বের গারোদের উপর অধিকাংশ এথনোগ্রাফিক রিপোর্টে তাদের গারো নামে সম্বোধন করা হয়েছে এবং এ নামটি বর্তমানে একটি ভৌগলিক ও রাজনৈতিক প্রত্যয়ে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশের গারোরা অবশ্য এ নাম ব্যবহারে খুশি না বরং তারা 'মান্দি' নামটিই অধিক গ্রহণযোগ্য মনে করে। এ প্রসঙ্গে বার্লিং (Burnling, 1997 : 3) -এর বক্তব্যটি স্মরণ করা যেতে পারে[৪]।

মিহির এন সাংমা (Sangma, 1933) মনে করেন, গারো ভাষায় 'গারো' বলে কোন শব্দ নেই এবং নিজেদের মধ্যে কথোপকথোনের ক্ষেত্রে তারা কখনই এ শব্দটি ব্যবহার করেনা। তাদের ভাষায় গারো শব্দটির যেমন কোন অর্থ নেই, তেমনি গারো শব্দটির উৎস ও বিবর্তিত হওয়া সম্পর্কে কোন তথ্যও তাদের ভাষায় পাওয়া যায়না। অতএব, এটি তাদের জন্য একটি তাদের ভাষাবর্হিভূত একটি শব্দ।

[৪] "The people among whom I lived in the 1950's did not find the word offensive. Indeed, the official name of their district in India was the 'Garo Hills' and everyone continues to use that geographical and political term. Since all earlier ethnographic reports referred to the people as "Garos" it seemed unnecessary to complicate the record by introducing a new term. The people I have come to know more recently in Bangladesh, however, no longer like to be called "Garos." This is the outside's word, not their own, and since their experience with outsiders has something been unhappy, the outsides word has come to be resented."

গারো অধুষ্যিত অঞ্চলে আগত প্রথম ইউরোপীয় পর্যটক ছিলেন জন ইলিয়ট। ১৭৮৮-১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি এ অঞ্চলে ভ্রমন করতে আসেন। তাঁর রিপোর্টে[৫] তিনি তাঁদের 'গাড়ো' হিসেবে উল্লেখ করেন (Bal, 2007 : 74)।

১৮০৭ থেকে ১৮১৪ খ্রিষ্টাব্দে হ্যামিলটন (সাবেক নাম বুকানন) বাংলার কিছু অংশে, রংপুর ও গারো পাহাড়ের দক্ষিণাংশে একটি ব্যাপক সমীক্ষা করেন। ছয়জন গারো তথ্য সরবরাহকারী তাকে বলেন, 'গারো' নামটি বাঙালীরা তাদের দিয়েছে। এ প্রসংঙ্গে তার অভিমত[৬] (quoted by Bal: 2007: 75) প্রণিধানযোগ্য:

ডালটনের (Dalton) বর্ণনা হ্যামিলটনের পর্যবেক্ষণকে সমর্থন করছে। তাঁর মতে, "নাগা" শব্দের মতো "গারো" শব্দটিও হিন্দুদের দেওয়া, গারোরা নিজেরা মনে করে তাদের মধ্যে তিন বা চারটি ভিন্ন নামের জাতিগোষ্ঠী রয়েছে (Dalton, 1872 : 7)। প্লেফেয়ার নির্দেশ করেন যে গারো নামটি কেবল গারোদের একটি উপদলের নামের পরিবর্তিত রূপ, তাঁর মতে, গারো পাহাড়ের দক্ষিণ প্রান্তে বর্তমান বাংলাদেশের সীমানার কাছাকাছি একসময় গারোদের অন্যতম দল গারা-গানচিংয়ের বসতি ছিল। তৎকালীন অন্য ভাষাভাষী মানুষেরা তাদের সাথেই প্রথম পরিচিত হন। সুতরাং অন্য ভাষাভাষী মানুষরা উক্ত দলের নামানুসারে তাদের গারা-গানচিং সম্বোধন করতে করতে কালক্রমে সম্বোধনটি গারোতে রূপান্তর হয়। এ প্রসঙ্গে প্লেফেয়ার (Playfair, 1909 : 8) -এর বক্তব্যটি[৭] প্রণিধানযোগ্য।

গারো শব্দটি 'গারা' বা 'গানচিং' শব্দের পরিবর্তিত রূপ নয় বলে কোন কোন গবেষক মনে করেন। জুলিয়াস মারাক (Julius Marak) -এর মতে গারা বা গানচিং দলটি গারো পাহাড়ের দক্ষিণে ক্ষুদ্র অংশে বসবাস করে। গারো উপজাতির এ দলটির আঞ্চলিক নাম গারা বা গানচিং, এর

[৫] "The Garrows are called by the villagers, and upper hill people, Counch Garrows; though they themselves, if you ask them of what cast they are, will answer, Garrows, and not to give themselves any appellation of cast; though there are many castes of Garrows, but of what differences I had no time to ascertain."

[৬] "My informants say that, Garo is a Bengalese word, not do they seem to have any general word to express this nation, each of the tribes into which it is divided, has a name peculiar to itself."

[৭] "In the southern portion of the hills there exists a division of tribe who call themselves Gara or Gara-Ganching. These people are not far removed from Mymensingh district from which direction the Garos were first approached by Europeans or Bengalis. It is therefore not unlikely that this division of the tribe first received their appellation of Gara, that the name was extended to all inhabitants of the hills and that in time it became corrupted from 'Gara' to 'Garo'."

বহুপূর্ব থেকেই গারো উপজাতির লোকেরা ময়মনসিংহ বা কোচবিহারে বসবাস করছে (Marak, 1985 : 8-9)। গারো নামটি 'গারু' 'গারুদাস' বা 'গারুদা' শব্দ থেকে রূপান্তরিত হয়েছে– এ তত্ত্বের স্বপক্ষে বরং তিনি কিছু সত্যতা খুঁজে পেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর ব্যাখ্যাটি প্রণিধানযোগ্য[৮]।

তবে তিনি মনে করেন, এ সম্পর্কে আরো গবেষণা করা দরকার, যেহেতু এ বক্তব্যের সমর্থনে পর্যাপ্ত প্রমাণ পাওয়া যায়না। মিহির এন সাংমা এ সম্পর্কিত বিভিন্ন মতামত আলোচনা করেন এবং তিনি অনুমান করেন যে গারো শব্দটি 'গারুহ' নামে বিশালাকৃতির পাখির নামের পরিবর্তিত রূপ। একটি প্রাচীন লোকগীতি থেকে জানা যায়, গারো পাহাড়ে মানব বসতি স্থাপনের পূর্বে সেখানে গভীর অরণ্য ছিল এবং বন্য পশু-পাখিতে পূর্ণ ছিল। ঐ সময়ে সুউচ্চ পাহাড় থেকে প্রায়ই একধরণের দৈত্যাকৃতির শিকারী পাখি সমতলে এসে গৃহপালিত প্রাণী, এমনকি ছোট ছোট শিশুদেরও শিকার করে নিয়ে যেত। এই পাখি শ্রীকৃষ্ণের বাহনগামী গারুহ বা গারুদার নামানুসারে 'গারুহ' বা 'গারুদাহ' নামেই পরিচিত ছিল। এই পাখির নামানুসারেই সমতলের মানুষের কাছে পাহাড়টি গারুহ পাহাড় নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। গারুহ পাহাড়ে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীই পরে গারুহ নামে পরিচিতি পায়। নামটি পরে পরিবর্তিত হয়ে গাড়ো এবং আরো পরে গারো নামে পরিচিত হয়। গারোদের নামানুসারে গারো পাহাড়ের নামকরণ হয়েছে না গারো পাহাড়ের নামানুসারে গারোদের নামকরণ হয়েছে এ নিয়েও অবশ্য মতভেদ আছে। তবে অধিকাংশ গবেষকই মনে করছেন গারোদের নামানুসারে গারো পাহাড়ের নামকরণ হয়েছে।

মলীন্দ্রনাথ মারাক, বিধি পিটার দাংগো, সুভাস জে, সাংমা এবং আলবার্ট মানকিন এই চারজন গারো লেখক 'বাংলাদেশ আদিবাসী উপজাতি কল্যাণ সমিতি' কর্তৃক প্রকাশিত 'মাটির মানুষ' (১৯৮২) নামক গ্রন্থে 'বাংলদেশী গারোদের কথা' লিখতে গিয়ে বলেছেন, "গারোরা মঙ্গোলীয় জাত-গোষ্ঠীর বৃহৎ বড়ো সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত। খ্রিষ্টিয় প্রথম শতাব্দীতে প্লিনি তাঁর নেচারাল হিস্ট্রিতে গারোদের মান্দাই বলে উল্লেখ করেছেন। খ্রিষ্টিয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে টলেমী পাটলীপুত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করবার সময় গারো পাহাড়কে উমর পুজ এবং এর অধিবাসীদের গারিওনি বলে লিপিবদ্ধ

[৮] "When the Garos migrated from Tibet they were known as Garu Mandai when they settled down in India during the Vedic period they began to be called as 'kiratas'. Later, the Garos come to be known as Garudas during the age of Ramayana and Garuda in the Mahavarata period. The British writers called them "Garrow for Garo. This, in course of time Garu became Garo."

করেছেন। গারিওনি গারো নামের অপভ্রংশ। ঐতিহাসিকভাবে টলেমিই সর্ব প্রথম গারো নামের উল্লেখ করেছেন" (Marak, 1982 : 2)।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় গারো নামের উৎপত্তি ও অর্থ সম্পর্কে বহু বিতর্ক রয়েছে। তদুপরি গারোদের নিজেদের মধ্যেও গারো নামের ব্যবহার সম্পর্কে বিতর্ক আছে। গারোদের নাম সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্লেফেয়ার (Playfair, 1909 : 8) লিখেছেন–

> *"প্রকৃত সত্য এই যে গারোরা বিদেশীদের কথা বলার সময় ব্যতীত কখনই গারো নামটি ব্যবহার করেনা, বরং সর্বদা নিজেদেরকে আচিক্ (পাহাড়ী মানুষ) মান্দি (মানুষ) অথবা আচিক্মান্দি বলে উল্লেখ করে"।*

এলান বল (Bal, 2000 : 72) মনে করেন, গারো নামটি বহুদিন তাদের কাছে মর্যদাহানিকর বলে বিবেচিত হয়ে আসছে। এতদসত্ত্বেও, আচিক্ মান্দি সম্পর্কিত প্রবন্ধ বা গ্রন্থে গারো নামটি লেখক ও গবেষকরা অনেকসময়ই ব্যবহার করে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে গারো নামের কোন বিকল্প না থাকায় অনেকেই বাধ্য হয়ে গারো নামটি ব্যবহার করেন। গারো নামের এমন কোন বিকল্প নেই যার মাধ্যমে পাহাড়ী; সমতলবাসী বাংলাদেশ ও ভারতে বসবাসকারী গারো সকলকে একসাথে বোঝানো যায়। বার্লিং (Burling, 1997 : 3-4) মনে করেন, একারণে অনেকেই গারো নামটি ব্যবহারই সুবিধাজনক বলে মনে করেন[৯]।

[৯] "In Bangladesh the people know the word "Garo" very well, but the word they use for themselves is "Mandi", a word that, like so many other ethnic terms that are used around the world, means, most literally, just "human being". It is now tempting to use "Mandi" wherever I once would have used "Garo", but unfortunately the pronunciation "Mandi' is largely restricted to the dialects spoken in Bangladesh. The people who live further north more often pronounce the word as "Mandi" so it would be artificial to refer the entire group as "Mandi." The Northerners, moreover, more often refer to themselves as "Achik" which mean "hill person", a term that is hardly appropriate for people who live in a country that is as uniformly low and flat as Bangladesh. This means that there is no single term that all the people who have been known as "Garo" use for themselves. The difficulty of finding a single appropriate term might suggest that the very idea of a single ``Garos" ethnic group is wrong, but the people themselves recognise their own relationship well enough. The boundaries of the group that has been called "Garo" are generally clear, but it is an inconvenience that there is no fully satisfactory term that refers to them all."

৪.২। গারোদের অতীত ইতিহাস এবং ভারতবর্ষে আগমন :

গারোদের অতীত ইতিহাস সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য পাওয়া যায়না। প্রকৃতপক্ষে তাদের অতীত ইতিহাস অস্পষ্ট এবং তাদের ইতিহাস এবং ভারতবর্ষে আগমন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সপক্ষে কোন বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক প্রমান পাওয়া যায়না। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত তাদের অতীত ইতিহাস সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য বেশকিছু প্রচেষ্টা করা হয়েছে। এসব তথ্য সংগৃহীত হয়েছে মূলত: প্রচলিত লোককাহিনী থেকে যার কোন লিখিত নিদর্শন নেই। যেহেতু তাদের ভাষার কোন লিখিত রূপ নেই সেহেতু উপকথা ও পৌরাণিক কাহিনী সংগ্রহের ক্ষেত্রে গারোদের স্মৃতিশক্তির উপরেই নির্ভরশীল হতে হয়। ঐতিহ্যবাহী পৌরাণিক কাহিনীগুলো বংশপরম্পরায় তারা তাদের স্মৃতিতে সংরক্ষণ করে আসছে। এসব কাহিনীও আবার সময়ের পরিক্রময়ায় এবং পরিবেশ, পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়েছে। সেখানে একই কাহিনীর বিভিন্ন ধরন ও ব্যাখ্যা উদ্ভব হওয়ায় পুরো বিষয়টি আরও জটিল হয়ে গিয়েছে। প্লেফেয়ার ছিলেন প্রথম ইউরোপীয় লেখক যিনি গারোদের অতীত ইতিহাস উৎঘাটনের জন্য নিয়মতান্ত্রিকভাবে গবেষণা করেছিলেন। প্লেফেয়ারের (Playfair, 1909 : 13) বিবৃতি[১০] থেকে গারোদের দেশান্তর সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা পাওয়া না গেলেও একটি বিষয়ে প্রায় সব গবেষকই একমত যে তারা তিব্বত থেকে ভারতবর্ষে আগমন করেছিলেন। আবার এটিও অনুমান করা হয় তিব্বত তাদের প্রকৃত বাসস্থান ছিল না। কোন কোন লেখক মনে করেন, তারা আগমন করেছেন প্রাচীন চীন থেকে, চীনের যে অংশটি পরবর্তীতে মঙ্গোলিয়া বা তিব্বতের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হয়। বলা হয় চীনের দক্ষিণ পশ্চিমাংশে অনেক আদিবাসী গোষ্ঠী (Aboriginal tribes) বসবাস করে উৎপত্তিগতভাবে যারা চৈনিক নয় (non-chinese)। এদের মধ্যে কেহ ডেও (Keh-Deo) উপজাতির সাথে গারোদের আশ্চর্যরকম মিল রয়েছে। এ প্রসঙ্গে বল্ডউইন (Baldwin, 1934 : 14) -এর উক্তিটি উল্লেখযোগ্য[১১]। এছাড়াও মিল্টন এস সাংমা (Sangma, 1981 : 23) তাঁর বইয়ে প্রায় একই ধরণের মত প্রকাশ

[১০] "The story of the migration has been told in verse as well as in prose, but in the former, there is so much allegory and poetic license, and the language is so archaic, that it is most difficult to understand. Further, the names have been changed, and the circumstances of the tale also, and the only impression of any value while we can glean from the mass of detail, is that of general movement of a people from beyond the Himalayas into the plains to the south of them."

[১১] "It is not incredible that the Keh-Deo represents one terminal, and the Garos the other, of a race whose cradle lay, "between the upper waters of Yang-tsi-kiang and Ho-ang-ho" rivers in north-west China, but which migrated to a more hospitable climate and friendly soil; for this wave of migration might easily have been broken eastward and westward, is its impact with the rock-like 'ferocious and war-like tribes' then inhabiting the hills of Eastern Assam and Upper Burma."

করেছেন[১২]। উপরন্তু আলী নেওয়াজ (Nawaj, 1984 : 209-210) প্রাচীন চীনের অন্য একটি উপজাতির সাথে গারোদের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন[১৩]।

উপরোক্ত মতামতগুলো থেকে গারোদের অতীত সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়না, কেননা কোন মতামতের স্বপক্ষেই যথেষ্ট ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায়না। তবে এটুকু অনুমান করা যায় যে, তারা বিভিন্ন কারণে প্রাচীন চীন থেকে দেশান্তরিত হয়ে তিব্বতে আগমন করেছিল এবং সিলেটের মধ্য দিয়ে বারাক নদী (সুরমা নদী) ধরে পূর্ববাংলায় প্রবেশ করে। এ প্রসঙ্গে মিহির এন সাংমা (Sangma, 1993 : 15) -এর বক্তব্যটি উল্লেখ করা যেতে পারে[১৪]।

গারো দলপ্রধান সুসং তার রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন সুসং দুর্গাপুরে। মনসিং নামে অন্য আরেকজন দলপ্রধান রাজ্য স্থাপন করেন মনসিং-এ, যা এখন ময়মনসিংহ নামে পরিচিত। তারা ঢাকার ভাওয়াল এলাকা দখল করেছিলেন। গারো যোদ্ধাদের একটি ছোট অংশ সোমেশ্বরী নদী ধরে গারো পাহাড়ের দক্ষিণাংশের পাদদেশে পৌঁছে। ক্রমে তারা গারো পাহাড় এলাকায় বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে[১৫]। তারা গারা গানচিং, আত্তোং, চিবক, রুগা এবং দোয়াল নামে পরিচিত (Sangma, 1993 : 16)।

তবে বর্তমান বাংলাদেশে গারোদের সংখ্যা বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা এক ভাগেরও এক দশমাংশেরও কম। বলা হয়ে থাকে অতীতে গারো জনসংখ্যা এরচেয়ে বেশি ছিল।

[১২] "There are a section of the Tibeto-Burman race of the Tibeto-Chinese family, where cradle is said to have been the north-western China between the upper waters of Yang-tse-kiang and Ho-ang-ho. The Tibeto-Burman sent forth successive waves of emigrants who spread down the valley of the Barhmaputra and the great rivers, such as Chindwin, the Irrawardy and the Mekong, that flow towards the South."

[১৩] "There is a Han dynasty in China consisting of a very large population. It is interesting to note that there is a group in Garo tribe named 'Hanas'. Many common words and lores are still found in Garo and Chinese languages with or without variations. Some of the Garo customs were prevalent in ancient Chinese society."

[১৪] "Later on, they were separated and gradually a group of Garos started off towards the middle part of Asssam and first settled down at Gongadol and Sibdol areas. The other group of Garos moved towards south along the source of Surma or Barak river through Cachar and Sylhet districts. The Garos entered into Bengal (Present Bangladesh) and first settled their kingdom at 'Gaur' in Maldah district under the able leadership of Sangka. According to the legend, the Garos settled there for many years"

[১৫] "Even today, there are many Garos widely spread over six thanas of Sherpur Nalitabari, Haluaghat, Susang Durgapore, Kulmakanda and Srobordi in present Bangladesh."

কালক্রমে, বিভিন্ন কারণে তাদের অনেকে বাংলাদেশ ত্যাগ করেছে (Nawaj, 1984 : 213)। এ প্রসঙ্গে আলী নেওয়াজ -এর বক্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে[১৬]।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে, ময়মনসিংহের সীমান্তবর্তী এলাকায় এবং বাংলাদেশের অন্যান্য সমতল এলাকায় বসবাসকারী গারোরা, গারো পাহাড়ী এলাকায় বসবাসকারী গারোদের উত্তরসূরী– এ বক্তব্যের সমর্থনে খুব বেশি যুক্তি দেওয়া যায়না। তা সত্ত্বেও, বাংলাদেশে বসবাসকারী গারোদের সাথে গারো পাহাড়ী এলাকায় বসবাসকারী গারোদের একটি মনস্তাত্ত্বিক যোগ আছে বলে মনে হয় এবং অনেকে একথা বিশ্বাস করেন যে গারো পাহাড়ী এলাকাই তাদের প্রকৃত মাতৃভূমি।

৪.৩। আচিক্ মান্দি নৃগোষ্ঠী বা গারোদের ঐতিহ্যবাহী ধর্ম :

আচিক্ মান্দিদের ঐতিহ্যবাহী ধর্ম 'সাংসারেক' -এর অর্থ খুব একটা স্পষ্ট নয়। এমনকি আচিক্ মান্দিরাও সঠিকভাবে এর অর্থ জানেন না। সম্ভবতঃ বাংলা সংসার থেকে সাংসারেক শব্দটি এসেছে। সাংসারেক ধর্মটি নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করলে একে সর্বপ্রাণবাদী (animism) বিশ্বাস বলে অভিহিত করা যায়। সর্বপ্রাাণবাদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সাংসারেক ধর্মবিশ্বাসীরাও মনে করে তাদের আশেপাশে সব কিছুতেই অতিপ্রাকৃত শক্তির অস্তিত্ব আছে। জগতের সৃষ্টি থেকে শুরু করে জগতের শুভ-অশুভ সব কিছু এই অতিপ্রাকৃত শক্তির উপর নির্ভরশীল। তারা এই অতিপ্রাকৃত শক্তিকে 'মিতে' বা 'মাইতে' বলে আখ্যায়িত করে। 'মাইতে' দেব-দেবী এবং প্রেতাত্মা উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। আচিক্ মান্দিদের মতে কিছু মাইতে দয়ালু, পরোপকারী তথা বন্ধুবৎসল। অপরপক্ষে কিছু মাইতে আবার শত্রুভাবাপন্ন। আচিক্ মান্দিরা উভয় ধরণের মাইতেকেই পূজা-আর্চনার দ্বারা খুশী করতে চেষ্টা করে।

আচিক্ মান্দিদের বিশ্বাস, অধিকাংশ মাইতে জঙ্গলে বা পাহাড়ে বসবাস করে। কিছু মাইতে আবার আকাশেও বসবাস করে। তবে সব মাইতেই আচিক্ মান্দিদের গ্রামাঞ্চলে ঘোরাফেরা করে যাদেরকে তারা কখনো দেখেনা বলে মনে করে। তবে আচিক্ মান্দিদের বিশ্বাস, মাইতে তাদেরকে

[১৬] "During the last few years, many Garos left Bangladesh. Deforestation on Bangladesh side is largely responsible for this exodus. For this reason, there is no Garo in Bhaluka of the Mymensingh District at present. Forest is the part and parcel of the Garo way of life. Probably the establishment of Meghalaya autonomous state in India with the Garo Hills District also intrigued them to leave for Meghalaya. During the last liberation war of Bangladesh, the Garo in large number, having been disturbed by Pakistan Army, took resort in Meghalaya, and many of them did not come back."

দেখছে। মাইতেকে পূজা দিয়ে খুশী করতে পারলে আচিক্ মান্দিদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে বলে তারা বিশ্বাস করে। মাইতের সংখ্যা কত তা আচিক্ মান্দিরা জানে না। তবে ড. কিবরিয়াউল খালেক কতিপয় মাইতের নাম সংগ্রহ করে তাদের কাজ ও মর্যাদার বর্ণনা দিয়েছেন (Khaleque, 1984)।

তাতারা রাবুগা: তাতারা হচ্ছে মাইতেদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ক্ষমতা সম্পন্ন। তাতারা অন্যান্য মাইতেদের সহায়তায় এই মহাবিশ্ব ও প্রাণীজগত সৃষ্টি করেছেন।

সালজং: সালজং হচ্ছে উর্বরতার দেবতা। সূর্য হচ্ছে সালজং -এর প্রতিনিধি। ফসলের ভাল-মন্দ এই দেবতার উপরই নির্ভর করে বলে তাদের বিশ্বাস।

সুসাইম: সুসাইম হচ্ছে আচিক্ মান্দিদের ধন দৌলতের দেবতা। চন্দ্র হচ্ছে এই দেবতার প্রতিনিধি। গারো পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী সুসাইম হচ্ছে সালজং -এর বোন।

গোয়েরা: গোয়েরা হচ্ছে গারোদের শক্তি-দেবতার নাম।

কালকেম: কালকেম জীবন নিয়ন্ত্রণ করে বলে গারোদের বিশ্বাস। সে যখন খুশী যে কোন লোকের মৃত্যু ঘটাতে পারে, তবে বিভিন্ন অসুখের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দেব-দেবী আছে। যেমন-নাওয়াং পেটের অসুখের জন্য দায়ী। এমনি আরো দেব-দেবী রয়েছে যারা অন্যান্য অসুখের জন্য দায়ী বলে গারোদের বিশ্বাস।

৪.৪। সমাজ ব্যবস্থা ও আচিক্ মান্দি সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক :

গারো নৃগোষ্ঠীর বিশেষ বৈশিষ্ট্য তাদের সমাজ ব্যবস্থা। তাদের ঐতিহ্যবাহী সমাজব্যবস্থা বিভিন্ন দল এবং গোত্রে বিভক্ত ছিল। তাদের সমাজ ও ধর্ম সম্পর্কে জানতে হলে এই দল ও গোত্র-উপগোত্র সম্পর্কে জানতে হবে। কেননা তাদের সমাজিক রীতি-নীতি ও বিভিন্ন অনুশাসন এই দল ও গোত্রের সাথে সম্পর্কিত। সমগ্র গারো সমাজ কয়েকটি দলে বিভক্ত এবং তাদের জীবনযাত্রা ও সমাজব্যবস্থায় কমবেশি পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। গারোদের প্রধান কয়েকটি দলের বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হল:

১. আখাওয়ে বা আত্তয়ে দলের লোক গারো পাহাড়ের উত্তর-পূর্বাংশে আসামের সমভূমিতে বাস করে। তারা মূলতঃ কৃষিজীবি।

২. গারো পাহাড়ের পশ্চিমাংশে আবেংদের বাস। তারা অত্যন্ত প্রভাবশালী একটি দল এবং গারোদের মধ্যে তাদের সংখ্যাই বেশি।

৩. গারো এবং কোচ সম্প্রদায়ের মিশ্র বিবাহের ফলে উক্ত দলের উৎপত্তি বলে মনে করা হয়।

৪. গারো পাহাড় জেলার ডালুর নিকটে এবং বাংলাদেশের দুর্গাপুর থানার কিছু এলাকায় রুগা নামক দলের লোক বাস করে।

৫. ভারতের ভোগাই নদীর অববাহিকা থেকে নিতাই নদীর তীর পর্যন্ত এবং বাংলাদেশের হালুয়াঘাট থানার কিছু অংশে চিবকরা বসবাস করে।

উপারোক্ত পাঁচটি দল ছাড়াও তাদের আরো অনেকগুলো দল রয়েছে। যেমন- চিসক্, দোয়াল, মাচ্ছি, কচ্ছু, আতিয়াগ্রা, মাত্তাবেং, গারা গানছিং, মেগাম প্রভৃতি। এছাড়া ব্রাক, শমন, দলি, গন্ডায় নামে কয়েকটি ছোট দল রয়েছে, যাদের জনসংখ্যা খুবই কম। গারো সমাজের সকল দলই মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অধীন।

গারোদের সবচেয়ে বৃহৎ মাতৃসূত্রীয় দল বা গোত্রের নাম চাট্-চী যার অর্থ আত্মীয় বা জ্ঞাতি। গোত্রকে গারোরা 'মাচং' বলে অভিহিত করে থাকে। তারা পাঁচটি প্রধান গোত্রে বিভক্ত। এগুলো হল সাংমা, মারাক, মমিন, শিরা, আবেং প্রভৃতি। বাংলাদেশে প্রধানত তিনধরনের দলের লোক দেখা যায়ঃ সাংমা, মারাক ও মমিন। এই দলগুলো আবার কতগুলো উপগোত্রে বিভক্ত। উপগোত্রকে গারোরা মাহারী নামে উল্লেখ করে। গারো সমাজে মাহারীর গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। তাদের মধ্যে বহির্বিবাহ রীতি (Exogamy) প্রচলিত। অর্থাৎ একই উপগোত্রের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। প্লেফেয়ার ১২৭টি উপগোত্রের নাম লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এসব উপগোত্রের কোন কোনটি বিভিন্ন পশুপাখির নামে পরিচিত হলেও তাদের কোন টোটেম গোষ্ঠী (Totem Group) নেই। গারো গ্রাম সমাজে গ্রাম প্রধানের অস্তিত্ব বরাবরই ছিল, তথাপি চাকমাদের মতো উপজাতি প্রধান (Tribal Chief) বলতে কিছু নেই। বস্তুতঃ গারো সমাজে কখনোই কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব (Centralized Leadership) গড়ে ওঠেনি। গারো গ্রাম সমাজের প্রধান গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে গ্রামীন বিচার-আচার পরিচালনা করেন।

একজন গারো মন্দ কাজ করে মন্দ জীবনযাপন করে স্বেচ্ছাচারীভাবে চলতে পারে না। গারো গোষ্ঠীর একজন সদস্যের সমাজকে উপেক্ষা করার কোন সুযোগ নেই।

একজন গারো মন্দ কাজ করে মন্দ জীবনযাপন করে স্বেচ্ছাচারীভাবে সমাজকে উপেক্ষা করে নিজেকে রক্ষা করতে পারেনা। এ ক্ষেত্রে সমাজ, মাহারী তাকে সংশোদন কিংবা শাসনের মাধ্যমে সামাজিক দায়িত্ব নিস্পন্ন করে। ঠিক একইভাবে সৎকাজ করে এবং সৎ জীবন যাপন করে একজন গারোকে সমাজের নিকট হতে তার প্রাপ্য সম্মান পাওয়ার অপেক্ষায় থাকতে হয়না। সেক্ষেত্রে সমাজ এবং গ্রামবাসীরাই তাকে উপযুক্ত সম্মানে সমাসীন করে।

পারিবারিক জীবন যাপনের বেলাতেও গারোদের সামাজিক জীবন বিধান অনন্য। একজন গারোকে কোনদিন নিঃসঙ্গ অবহেলিত জীবনযাপন করতে হয়না। কোন অসহায় নির্বান্ধব নিঃসঙ্গ ব্যক্তি অথবা অসহায় কোন অনাথ শিশু গারো সমাজে অপাংক্তেয় নয়। বরং এ ক্ষেত্রে সমাজ ঐরূপ ব্যক্তিকে কোন না কোন ভাবে নিরাপদ আশ্রয় ও জীবিকা নির্বাহের নিশ্চয়তা বিধান করে দেয়। উদাহরণস্বরূপ, ধরা যাক্ বাপ-মা, আত্মীয় স্বজন হারা যেকোন অনাথ শিশুকে আশ্রয়দানের কাজে প্রথমেই তার দূর সম্পর্কের আত্মীয় স্বজনেরা এগিয়ে আসবে। আর যদি সেরকম কেউ না থাকে তবে মাহারীভুক্ত যে কোন পরিবার স্বেচ্ছায় দায়িত্ব গ্রহণ করবে এবং মাহারীভুক্ত এরকম কোন পরিবার যদি না থাকে তবে যে কোন গারো পরিবার সাহায্যের হাত প্রসারিত করে এগিয়ে আসবে এবং এ ক্ষেত্রে ঐ পরিবারে অনাথ শিশুটির স্থান হবে পরিবারেরই অন্য পাঁচটি সন্তানের মতই, কোন অবাঞ্ছিত কিংবা দাসদাসির মত নয়। ঠিক তদ্রূপ নির্বান্ধব যে কোন ব্যক্তিও একই ভাবে মাহারী, গোষ্ঠী, কিংবা সমাজের যে কোন পরিবারের অকুণ্ঠ সাহায্য সহযোগিতা পেতে পারে। অপরদিকে গারো সমাজে বিবাহিত জীবনে বিধবা কিংবা বিপত্নীক কোন ব্যক্তি অসহায় অবস্থার মধ্যে বিড়ম্বনাময় জীবন যাপন করতে হয়না। সমাজ তথা মাহারীই ঐরূপ ব্যক্তির স্বাভাবিক জীবন যাপনের নিশ্চয়তা বিধান করে দেয়। এ জন্যেই গারো সমাজে ভিক্ষাবৃত্তি নেই, বেশ্যাবৃত্তি নেই, হৃদয়হীন শিশুশ্রম নেই এবং এসবের মূলে রয়েছে গারোদের সামাজিক সহমর্মীতা। বর্তমান হৃদয়হীন সভ্যতার যুগে মানুষ যেখানে চরম আত্মসর্বস্ব হয়ে ওঠেছে সে যুগেও গারো সমাজে উপরোক্ত রীতিনীতি এখনও সুলভ আর এটিই গারোদের সামাজিক ঐতিহ্য। জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রেও গারোদের ব্যক্তি জীবনের উপর সামাজিক প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট। আগেকার দিনে গারোদের প্রধান জীবিকা ছিল জুমচাষ। বর্তমানকালেও গারো অধ্যুষিত মেঘালয়ের অনেক স্থানেই জুমচাষের প্রচলন বিদ্যমান। এই জুমচাষের গোড়ার কথাই ছিল

যৌথ কৃষি পদ্ধতি। আখিং নকমার (এলাকা প্রধান) নেতৃত্বে পছন্দমত জঙ্গল নির্বাচন করে একযোগে সেই জঙ্গল পরিষ্কার করার পর পরিবার পিছু পরিষ্কৃত জমি সমান অংশে ভাগাভাগি করে চাষ করাই ছিল গারোদের আগেকার দিনের প্রথা। এই জুমচাষকে কেন্দ্র করেই তারা পরস্পর পরস্পরকে নানাভাবে কাজকর্মে সাহায্য সহযোগীতা করতো। জুমচাষ ভিত্তিক যে সব ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো সেগুলোতে তারা যৌথভাবে অংশ গ্রহণ করতো। এই সব আচার অনুষ্ঠান এবং উৎসবের আয়োজন কেবলমাত্র ব্যক্তিগত পর্যায়ে না থেকে সামাজিক পর্যায়ে উপনীত হতো। ফসল বোনার সময়, ক্ষেতের আগাছা পরিষ্কার করার সময়, ফসল তোলার সময় গারোরা পরস্পর পরস্পরকে বিনা পারিশ্রমিকে সাহায্য সহযোগীতা করতো। গারো ভাষায় এ সাহায্য সহযোগীতাকে "বারা" বলা হয়। এক কথায় কোন পরিবারের কোন কাজ শ্রমশক্তির অভাবে পিছিয়ে থাকতনা। অধ্যাবধিও গারো সমাজে এরকম সাহায্য সহযোগিতার প্রবণতা বিদ্যমান। এখনও ক্ষেতে খামারে কৃষি কাজের সময় গারোরা বিনা পারিশ্রমিকে পরস্পরকে সাহায্য সহযোগিতা করে থাকে। ফসল বোনার সময়, আগাছা পরিষ্কার করার সময়, ঘরে ফসল তোলার সময়, এমন কি ঘর বাঁধার সময়েও প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায় গারোরা স্বতঃপ্রণোদিতভাবে পরস্পরকে সাহায্য সহযোগিতা করে থাকে। একটা নতুন ঘর তৈরি করতে কিংবা ঘরের ছাউনী বদলাতে একটা গারো পরিবারের বেশি সময় নিতে হয় না কিংবা বেশি খরচাপাতি করতে হয়না। শুধুমাত্র নির্মাণ সামগ্রী সংগ্রহ করে দিন তারিখ নির্দিষ্ট করলেই কর্মক্ষম গ্রামবাসীরা সবাই মিলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ঘর তুলে দেবে অথবা ছাউনী বদলে দেবে। এর প্রতিদানে শুধু সন্ধ্যেবেলায় এক হাঁড়ি মদ আর সেই সঙ্গে সামর্থ্যে কুলালে একবেলা ডালভাত খাওয়ালেই যথেষ্ঠ। সে সবের যোগাড় করতে না পারলেও কেউ কিছুর প্রত্যাশা করেনা। শুধুমাত্র সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধেই তারা এভাবে পরস্পরকে সাহায্য সহযোগিতা করে থাকে এবং পরস্পর পরস্পরের নিকট হ'তে সাহায্য সহযোগিতার প্রত্যাশা রাখে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, গারো সমাজে মাহারীর গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। গারো সমাজে যেহেতু একই মাহারীর মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ সেহেতু বিবাহের মাধ্যমের দু'টো ভিন্ন মাহারীর মধ্যে সম্পর্কের সূচনা হয়। এই সম্পর্ককে অটুট রাখার দায়িত্ব মাহারী দু'টির। এই দায়িত্ব পালনের প্রথাকে তারা 'খিম্', প্রথা বলে। গারো মাতৃ-তান্ত্রিক সমাজে মেয়েরাই পারিবারিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। সাধারণত পরিবারে সর্বকনিষ্ঠা কন্যা সম্পত্তির সিংহভাগ পায় যাকে নকনা বলা হয়। নকনার জামাইকে বলা হয় নক্রম। বৃদ্ধ অবস্থায় পিতা-মাতাকে দেখার দায়িত্ব নকনা ও

নক্রমের। গারো ব্যক্তিজীবন ও পারিবারিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই মাহারী নিয়ন্ত্রণ করে। বিবাহের ক্ষেত্রে পারিবারিক সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে, যেকোন ধরনের সামাজিক অশান্তি, কোন অপরাধ সংঘটিত হলে সালিশ করার ক্ষেত্রে এবং অপরাধী ব্যক্তিকে সংশোধনের ক্ষেত্রে প্রতিটি ক্ষেত্রেই দায়িত্ব পালন করে মাহারী।

৪.৫। আচিক্ মান্দি: ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠানের তাৎপর্য :

ঐতিহাসিকভাবে জুমচাষ গারোদের প্রধান পেশা। গারো ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে তাদের পেশার সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। এই জুমচাষকে কেন্দ্র করেই গারোদের বাৎসরিক বিভিন্ন উৎসবের বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হল:

দেন বিলসিয়া: 'দেন' শব্দের অর্থ 'কাটা', 'বিলসি' অর্থ 'বৎসর'। জুমচাষের পূর্বে উপযুক্ত স্থান ঠিক করার জন্য চাষী নির্বাচিত একটি ক্ষেতের কোণায় কিছু জঙ্গল পরিষ্কার করে বাড়িতে ফিরে আসে। রাতে যদি অমঙ্গলজনক কোন স্বপ্ন দেখে তা হলে সেই নির্বাচিত স্থান পরিত্যাগ করে নতুন কোন স্থানের সন্ধানে যায়। এভাবে স্থান নির্ধারিত হলে 'নকমা' অর্থাৎ গ্রাম প্রধানের গৃহে 'দেন-বিলসিয়া' উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

'আগাল মাক্কা' বা 'আচিরক্কা': আগাল-মাক্কা বলতে আগুনের তাপ দেওয়া বুঝায়। জুমক্ষেতের ঝোপঝাড় কাটা হলে আগুনে পুড়িয়ে পরিষ্কার করার আগে জুমচাষের মঙ্গলের জন্য এ অনুষ্ঠান পালন করা হয়। প্রথমে একখণ্ড কাঁচা বাঁশ জুমক্ষেতের মাঝখানে পোঁতা হয়। বাঁশের গোড়ায় কলাপাতায় করে কিছু সিদ্ধ ধান, ভাত, রান্না করা মুরগির মাংস, শুটকী মাছ, কাঁকড়া প্রভৃতি রাখা হয়। আলাদা পাত্রে কিছু মদও রাখা হয়। জুমক্ষেতে যেসব ফসল বোনা হবে সেসব শস্যের কিছু পরিমান সেখানে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এরপর কাটা জঙ্গলে আগুণ ধরিয়ে পরিষ্কার করে ফেলা হয় এবং বীজ বপন শুরু হয়। এসময় প্রশস্তি করা হয় নিম্নরূপ:

> *'হে রকখিমে (ধানের মা) স্নিগ্ধ সুশীতল জলময় স্থান হতে মেঘের ছায়ায় ধীরে ধীরে উঠে এসা। সময় উপস্থিত, রা'ছা ও নেংরা মে' এনমা 'সে এন না' (জুমক্ষেতে উৎপাদিত বিভিন্ন ফসলের দেবী) ও তোমাকে বিবাহ করেব। তোমেদের জীবন সুখের হোক''।*

রংচু গাল্‌লা (নতুন চিড়ার উৎসব): রংচু শব্দের অর্থ চিড়া। ধান কাটার ঠিক আগে এ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। জুম ক্ষেতের এককোণে কিছু জায়গা পরিষ্কার করে নতুন ধানের চিড়া কলাপাতায় তুলে জুম ক্ষেতের ভাগ্যদেবীর উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হয়। একটি বাতাবীলেবু বা লেবু তিন টুকরা করে প্রতিটি টুকরার সঙ্গে কিছু পরিমান চাল মিশিয়ে অ-পরিষ্কার স্থানে রাখা হয় ও সেগুলির উপর মদ ছিটিয়ে দেওয়া হয়।

জামে গাপ্পা আহওয়া: সেপ্টেম্বর মাসে এ উৎসব পালিত হয়। এটি ধান কাটার প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান। 'আহওয়া' শব্দটি উল্লাস ধ্বনি। ক্ষেতের মালিক বাড়িতে ধানের গুচ্ছ বহণ করে নিয়ে যাওয়ার সময়ে ছেলেরা চিৎকার করে 'আহওয়া' শব্দ করতে করতে তাকে অনুসরণ করে। এ উৎসবে যুবক-যুবতীরা নাচ পরিবেশন করে। দামা ও খ্রাম (গারো বাদ্যযন্ত্র) এর শব্দ ধান গাছের বৃদ্ধি ও ফলন বাধাগ্রস্ত হয় বলে ফসল তোলার পূর্বের উৎসবগুলোতে তা বাজানো নিষেধ। নাচের তালের জন্য এসব বাদ্যযন্ত্র প্রয়োজন।

ওয়ানগালা: গারোদের সবচেয়ে প্রধান ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব ওয়ানগালা। জুমক্ষেতের সব ফসল তোলা হয়ে গেলে বিপুল জাঁকজমকের সাথে এ উৎসব পালন করা হয়। প্রথমে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন দেব-দেবীর আরাধনা, পরে ব্যক্তিগত ও গ্রামের মঙ্গলের জন্য পূজা দেওয়া হয়। এরপর পানাহার ও নাচগানের মাধ্যমে সামাজিক অনুষ্ঠান শুরু হয়। তিন দিন থেকে এক সপ্তাহ ধরে এ উৎসব চলে। এ উৎসবটিকে অনেকটা নবান্ন উৎসবের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। অক্টোবর মাসের শেষে অথবা নভেম্বর মাসে ওয়ানগালা উৎসবটি পালিত হয়। গ্রামের প্রবীনদের সাথে পরামর্শ করে 'আকিং-নকমা' আগেই উৎসবের দিন ঠিক করে দেন। ওয়ানগলা উৎসবের প্রস্তুতি পর্বে গ্রামের জঙ্গল, পথঘাট প্রভৃতি পরিষ্কার করা হয়। গ্রামের প্রতিটি পরিবারই নিজ নিজ সাধ্যানুযায়ী প্রচুর পমিানে চুঁ বা পঁচুই মদ তৈরী করে। উৎসবের শুরুতে গ্রামের প্রতিটি পরিবার নিজ বাড়ির সামনে জুমক্ষেতে উৎপাদিত সব শস্যের কিছু পরিমান সাজিয়ে দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে। গারোরা ওয়ানগালা উৎসবের আগে কখনও জুমক্ষেতে উৎপাদিত ফসল খায় না। ওয়ানগালা উৎসবের প্রথম দুদিন যথাক্রমে 'চুরুগালা' এবং 'গাকাতা' নামে পরিচিত। 'চুরুগালার' দিনে নাচ ও মদপান শুরু হয়। ওয়ানগালা উৎসব শেষ হবার সাথে সাথে গারোদের জুমচাষ কেন্দ্রীক বাৎসরিক সব অনুষ্ঠান শেষ হয়। গারোদের মধ্যে যারা শিক্ষিত এবং খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী ও সমতলবাসী হালচাষী তারা এসব অনুষ্ঠান পালন করে না।

৫.১। ইংরেজ শাসনামলে মিশনারি কর্মকাণ্ড :

বাংলাদেশ তথা ভারতীয় উপমহাদেশের খ্রিষ্টধর্মের প্রচারের সূচনা হয় ব্রিটিশ শাসনামলে। তবে ভারতে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ইউরোপীয়দের মধ্যে পর্তুগিজরাই প্রথম এতদ্বঞ্চলে খ্রিষ্টধর্ম বা ক্যাথলিক ধর্মপ্রচার করতে এসেছিলো। ১৫১৪ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই জুন পোপ দশম লিও ও পর্তুগিজ সরকারের সঙ্গে এক চুক্তি হয়। এ চুক্তি অনুযায়ী পর্তুগিজ খ্রিষ্টধর্ম প্রচারকারীগণ ভারতে ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাস প্রচার, ডায়োসিস প্রতিষ্ঠা, বিশপ ও সাধারণ যাজক নিযুক্তিসহ যথাযোগ্য মর্যাদায় ডায়োসিসের অন্তর্গত বিভিন্ন প্যারিস পরিচালনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত হবেন। পর্তুগিজ সরকারের সহায়তায় ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত অগাস্টিন ও জেসুইট খ্রিষ্টধর্ম প্রচারকরা বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় ক্যাথলিক ধর্মপ্রচার করেন। এই প্রচারের ফলে বেশ কয়েক হাজার মানুষ খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। কিন্তু সে সময়ে ক্যাথলিক মিশনারিদের কার্মকাণ্ড খুব বেশী এগোতে পারেনি। ইউরোপীয় অন্যান্য দেশের এই পরিকল্পনার প্রতি সমর্থন থাকলেও শুধু স্পেনের প্রবল আপত্তির কারণে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়নি। তাই স্পেনের রাজা বাংলাদেশে পর্তুগিজদের নতুন ডায়োসিস স্থাপনের সরাসরি বিরোধীতা করেন। স্পেন ও পর্তুগাল দু'দেশই ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাসী হলেও সে সময়ে কেবলমাত্র ব্যবসায়িক স্বার্থের কারণে এক দেশ অন্য দেশের আধিপত্য স্বীকার করতে রাজি হয়নি। স্পেনের রাজা সন্দেহ করেছিলেন, "হুগলী ডায়োসিস" প্রতিষ্ঠিত হলে পর্তুগিজরা বাংলাদেশে তাদের আধিপত্য স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে। এসময়ে পর্তুগালের অর্থনৈতিক অবস্থায়ও ক্রমান্বয়ে নিম্নমুখী হতে থাকে। তদুপরি উপমহাদেশে ইংরেজদের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতিযোগিতায় তারা পিছিয়ে পড়ে। এর সরাসরি প্রভাব পড়ে বাংলাদেশে পর্তুগিজ মিশনারিদের দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন ক্যাথলিক ধর্মপ্রচার কেন্দ্রগুলোতে।

সমগ্র বাংলাদেশে যখন ক্যাথলিক মিশনারিগুলোর নাজুক অবস্থা, সেসময়েই বাংলাদেশে প্রোটেস্ট্যান্ট মিশনারিরা তাদের খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের কর্মকাণ্ড শুরু করেন। বাংলাদেশে ধর্মপ্রচারে পর্তুগিজ মিশনারিদের পরে যে প্রেটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়গুলো এখানে এসেছিল তারা বিভিন্ন ডিনোমিনেশন বা ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ব্যাপ্টিস্ট মিশনারি সোসাইটি (BMS), চার্চ মিশনারি সোসাইটি (CMS), লন্ডন মিশনারি সোসাইটি (LMS) এবং ওয়েসলিয়ান মেথোডিস্ট মিশনারি সোসাইটি (WMMS)।

অবিভক্ত বাংলার প্রথম মিশনারি ছিলেন সুইডেনের নাগরিক রেবেন্ড জন জাকারিয়া কিয়ের নানদার। উইলিয়ম কেরীর এদশে আসার ৫৩ বছর পূর্বে তিনি আগমন করেন। তিনি ১৭৪০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে দক্ষিণ ভারতে এবং ১৭৫৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে রবার্ট ক্লাইভের আমন্ত্রণে বাংলাদেশে এসে কাজ শুরু করেন। তবে কোম্পানির নীতি অনুযায়ী তিনি এদেশীয় হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে ধর্মপ্রচারের কাজ করতে পারলেন না। তার কাজ সীমিত ছিল কলকাতার রোমান ক্যাথলিক পর্তুগিজ ও কিছু ইংরেজ পরিবারের মধ্যে। পর্তুগিজদের নিজস্ব কোন ধর্মযাজক তখন এখানে ছিল না। এছাড়া তাঁর কর্মকাণ্ড ইংরেজদের উপসনা পরিচালনা ও পারিবারিক প্রার্থনা সভার মধ্যে সীমিত ছিল। ১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি তার ব্যক্তিগত অর্থ দিয়ে কলকাতায় একটি গির্জা প্রতিষ্ঠা করেন, যা "ওল্ডচার্চ" বা "মিশন চার্চ" হিসেবে পরিচিত ছিল।

কিয়েরনানদারের মৃত্যুর পর তাঁর প্রতিষ্ঠিত গির্জার সমস্ত দায়িত্ব পলন করার জন্য চার্লস গ্রান্ট ইংল্যান্ড থেকে রেভারেন্ড আব্রাহাম টমাস ক্লার্ক নামের একজন ধর্মযাজককে কলকাতায় নিয়ে আসেন। তবে কিয়েরনানদার বা রেভারেন্ড ক্লার্ক কেউই এদেশীয় অ-খ্রিষ্টানদের মধ্যে ধর্মপ্রচারে কাজে নিয়োজিত ছিলেন না।

১৭৭৭ থেকে ১৭৯১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত "মোরাভিয়ান সম্প্রদায়" এর কয়েকজন জার্মান মিশনারি এদেশে অবস্থান করেছিলেন। ড: টমাস নামক একজন চিকিৎসক ১৭৮০ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশে আসেন। তিনি ছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একজন মেডিকেল সার্জন এবং একজন ধর্মভীরু খ্রিষ্টান। তিনি নিজ উদ্যোগে কলকাতায় বসবাসরত ইউরোপীয়দের মধ্যে কোন ধার্মিক খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী ব্যক্তি আছেন কিনা তা জানতে চেষ্টা করেন। এভাবে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারে আগ্রহী যাদের তিনি সন্ধান পান, তাঁরা হলেন-চার্লস গ্রান্ট, ডেভিড ব্রাউন, উইলিয়াম চেম্বারস ও জর্জ উডনী। চার্লস গ্রান্ট তাকে বাংলাদেশে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারে সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দেন। এ পরিস্থিতিতে ড: জন টমাস একজন চিকিৎসক হওয়া সত্ত্বেও কোম্পানির চাকরি ছেড়ে দিয়ে মিশনারি কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তবে ইউরোপের কোন মিশনারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রেরিত না হওয়ায় তিনি বাংলাদেশে প্রথম খ্রিষ্টান মিশনারি বলেও স্বীকৃতি পাননি। ১৭৮৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ড: টমাস মালদহে বাঙালিদের মধ্যে খ্রিষ্টধর্ম প্রচার শুরু করেন। ব্যক্তিগতভাবে চিকিৎসক হওয়ায় এবং ধর্মপ্রচারে সীমাহীন উৎসাহ থাকায় তিনি অল্প সময়ের মধ্যে সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় হন। ১৭৯২ খ্রিষ্টাব্দে ড: টমাস দেশে ফিরে গিয়ে

বি এম এস (BMS) এর সভায় মালদহে তাঁর কাজের বর্ণনা দেন এবং কেরীকে সাথে করে বাংলাদেশে নিয়ে আসেন। এ দুজনকে পরবর্তীকালে লন্ডনের ব্যাপ্টিস্ট মিশনারি সোসাইটি তাদের মিশনারি কর্মী হিসেবে বাংলাদেশে নিয়োগ প্রদান করেন। স্বনামধন্য মিশনারি উইলিয়াম কেরী সপরিবারে ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর কলকাতা পৌঁছান। তৎকালীন ইংল্যান্ডের একটি প্রতিনিধি ব্যাপটিস্ট মিশনারি সোসাইটির মাধ্যমে প্রেরিত হওয়ায় তাঁকে এদেশে প্রথম মিশনারি হিসেবে অভিহিত করা হয়।

চার্লস গ্রান্ট ছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একজন কর্মকর্তা । বাংলাদেশে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারে তিনি ছিলেন অত্যন্ত আন্তরিক। সাধারণতঃ তার মন্তব্যের উপর ভিত্তি করেই বাংলাদেশে আগত প্রোটেস্ট্যান্ট মিশনারিরা তাদের কর্ম-পরিকল্পনা ঠিক করত। ১৭৯২ খ্রিষ্টাব্দে লন্ডনে প্রকাশিত তার বইটির শিরোনাম ছিল *'Observation on the State of Society among the Asiatic Subjects of Great Britain, Particulars with Respects to Morals and Means of Improving It'* এই বইটিতে তিনি হিন্দু, মুসলমান সমাজ উভয়েরই তীব্র সমালোচনা করেন এবং উভয় গোষ্ঠীকেই কুসংস্কারপূর্ণ বলে বর্ণনা করেন, তৎকালীন ভারতীয় সমাজের প্রেক্ষিতে যার কিছু কিছু সত্য। অন্যদিকে তিনি নব্য ধর্মান্তরিত ক্যাথলিক খ্রিষ্টানদের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি লিখেছেন ধর্মান্তরিত হলেও হিন্দুদের রীতি নীতি সবকিছুই এদের মধ্যে আছে। পার্থক্য হল, হিন্দু দেব-দেবীদের পরিবর্তে এরা মরিয়ম ও খ্রিষ্টান সাধু সন্ন্যাসীদের পূজা করে (Grant, 1792 : 61)।

কিন্তু বাংলাদেশে আগত কেরীর কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা করলে গ্রান্টের বক্তব্যের প্রভাব তাঁর উপরে পড়েছিল বলে মনে হয় না। উইলিয়াম কেরী ছিলেন বহুগুণের অধিকারী ও একজন মহান হৃদয়ের অধিকারী ধর্মপ্রচারক। বাংলাদেশে তাঁর ৪১ বছর অবস্থানকালে তাঁকে কখনই এদেশের মানুষ সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করতে দেখা যায়নি। অধিকন্তু পারিবারিক সমস্যা ও নানা প্রতিকুলতার মধ্যেও তিনি দেশে ফিরে যাননি। তাঁর নিজের বিশ্বাস অনুযায়ী এদেশের মানুষের কল্যাণ করা ও পরিত্রাণ পেতে সাহায্য করাই ছিল তাঁর জীবনের লক্ষ্য ও আদর্শ।

উইলিয়াম কেরী বাংলাদেশে আসার পর থেকে পরবর্তী চল্লিশ বছর পর্যন্ত প্রটেস্ট্যান্ট মণ্ডলীর প্রচার কর্মের খুব স্পষ্ট পরিসংখ্যান ইতিহাসে উল্লেখ নেই। বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত মিশনগুলো থেকে সঠিক তথ্য পাওয়াও সম্ভব ছিল না। তাছাড়া মিশনারিদের প্রচার কর্মের ফলে যারা দীক্ষা গ্রহণ

করেছিলেন তাদের মধ্যে স্থানীয় বাঙালি ছাড়াও অনেক ইউরোপীয়, আর্মেনীয় ও পর্তুগিজ ছিল। তাই এই সংখ্যা অনেকটা অনুমান নির্ভর। কেরী মদনাবাটিতে অবস্থানকালে একজনকেও ধর্মান্তরিত করতে পারেননি। এমনকি ডা: টমাসের মুন্সী ও পরবর্তীকালে কেরীর মুন্সী রাম রাম বসুও প্রকৃত অর্থে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেনি (Bisi, 1958 : 93)। কলকাতার কাছে শ্রীরামপুরে থাকা কালে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ও তার দুই সহযোগী প্রথম একজন স্থানীয় বাসিন্দাকে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করেন। কৃষ্ণপাল নামে একজন সূত্রধরই ছিল এ অঞ্চলে ব্যাপ্টিস্ট মিশনারিদের দ্বারা দীক্ষাপ্রাপ্ত প্রথম খ্রিষ্টান। কৃষ্ণপালের শ্যালিকা জয়মনিও পরে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে। কৃষ্ণপালই কলকাতার প্রথম স্থানীয় মিশনারি। মহিলাদের মধ্যে প্রথম খ্রিষ্টান জয়মনির কাজ ছিল শ্রীরামপুরসহ আশে পাশের এলাকায় বিধবাদের মধ্যে 'সুসমাচার' প্রচার করা।

ব্যাপ্টিস্ট মিশনারি সোসাইটি ১৮০৫ খ্রিষ্টাব্দে লন্ডনে প্রেরিত তাদের রিপোর্টে উল্লেখ করেন যে, ১৮০৫ খ্রিষ্টাব্দের আগে পর্যন্ত তারা মোট ১০০ জনকে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করেছেন। ১৮০৮ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে (৩/৪ বছর) তারা মোট ১৪৭ জনকে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষা দিয়েছেন। এদের মধ্যে অল্প ক'জন ব্রাক্ষণ ছিলেন যারা ছিলেন অত্যন্ত দারিদ্র। খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণের পর তাদের মিশন প্রেসে চাকুরী দেয়া হয়। অনুরূপভাবে ১৮১৪ খ্রিষ্টাব্দে ব্যাপ্টিস্ট মিশনারি রেভারেন্ড হগ যে রিপোর্ট পাঠান সেখানে উল্লেখ আছে এ পর্যন্ত মোট ধর্মান্তরিত খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীর সংখ্যা ৭৫৬ জন। এদের মধ্যে ২১ জন ব্রাক্ষণ এবং অন্যান্যদের মধ্যে আছে ছুতোর, ধোপা, কৈবর্ত, যুগী, তেলী -এরকম মানুষ যারা নিম্নসম্প্রদায়ের মানুষ বলে তখন পরিচিত ছিল (BMS Archive)।

বাংলাদেশে কর্মরত সকল মিশনারি প্রতিষ্ঠানের সর্বপ্রথম একটি সমবেত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দে। এ সম্মেলনে বাংলাদেশের বিভিন্ন মিশনারি প্রতিষ্ঠান তাদের কাজের বিবরণ দেয়। এ বিবরণ অনুযায়ী ১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এদেশের মিশনারি প্রতিষ্ঠানগুলো মোট ১৪০৬ জন বাঙালিকে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করতে পেরেছে। দেশের বিশাল জনসংখ্যার তুলনায় এ সংখ্যা ছিল খুবই কম। ১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দের পর থেকে সমস্ত মিশনারি প্রতিষ্ঠানের ধর্মপ্রচার তৎপরতা অনেকাংশে মন্থর হয়ে আসে। সমস্ত বাঙালি জাতিকে ধর্মান্তরিত করার যে স্বপ্ন নিয়ে তারা তাদের প্রচার কাজ শুরু করেছিল, ৪০ বছরে এদেশে তাদের ফলাফল অনুধাবনের পর এ স্বপ্নের পরিসমাপ্তি ঘটে।

তবে এর পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে খ্রিষ্ট ধর্মীয় মিশনারিদের কর্মকাণ্ড গারোদের ধর্মীয় ইতিহাসের সাথে ঘনিষ্টভাবে যুক্ত। ১৮৫৩ খ্রিষ্টাব্দে রেভা. রূপার্ট বিয়ন (Rev. Rupert Bion) দুর্গাপুরে গারো পাহাড়ের পাদদেশে ৪০০ গারোর নিকট সুসমাচার প্রচার করেন। তিনি ছিলেন ঢাকা ব্যাপ্টিস্ট মিশনের মিশনারি। গারোদের মধ্যে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের এটিই প্রথম ঐতিহাসিক রেকর্ড। ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে রেভাঃ রূপার্ট বিয়ন রাধানাথ ভৌমিককে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষাদান করেন, যিনি বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষিত গারো খ্রিষ্টান। ১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দে গোবিন্দ দারিং দ্বিতীয় খ্রিষ্টান। ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দে রাধানাথ ভৌমিকের প্রচারে ময়মনসিংহের পূর্বদিকে ঈশ্বরগঞ্জ থানায় দুইজন গারো খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে। ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দে আরো পাঁচজন খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে এবং সেখানে প্রথম গারো ব্যাপ্টিস্ট মণ্ডলী স্থাপিত হয়। ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দে বিরিশিরি ব্যাপ্টিস্ট মণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত হয় (পরিশিষ্ট: চিত্র ১)। পাঁচজন মিশনকর্মী এবং ১৬ জন নতুন ধর্মান্তরিত খ্রিষ্টানসহ মিশনের সদস্য সংখ্যা ছিল ২১ জন। রেভা. রূপার্ট বিয়নের পর ময়মনসিংহসহ বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে প্রচারের দায়িত্ব পান রেভা. জন এলিসন। তিনিই প্রথম বাংলা হরফ ব্যবহার করে গারো ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করেছিলেন। রেভা. বল্ডউহন তার গ্রন্থে ব্যাপ্টিস্ট মিশনারি গোষ্ঠীর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন তথ্য উল্লেখ করেছেন (Baldwin, 1934 : 84)। ব্যাপ্টিস্ট মিশনারিদের পর এ্যাংলিকান এবং পরে ক্যাথলিক মিশনারি গোষ্ঠী গারোদের মধ্যে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বিশপ লিন্নেবর্ণ ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা ধর্মপ্রদেশের বিশপ নিযুক্ত হন যিনি এক পর্যায়ে ময়মনসিংহের মান্দি অঞ্চলে যাজক পাঠাতে সিদ্ধান্ত নেন। ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে রাণীখংয়ে মান্দি অঞ্চলে প্রথম ক্যাথলিক মিশনারি হিসেবে ফাদার এডলফ ফ্রান্সিস ও ফাদার তিমথি ক্রাউলি যাজক হয়ে কাজ করতে আসেন। পরবর্তীতে ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে ফাদার ফ্রান্সিস এখানে একাই স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেন এবং মাঝে মধ্যেই তাঁর সম্প্রদায়ের অন্য জায়গার যাজকদের সাহায্য গ্রহণ করতেন। বলা বাহুল্য যে মান্দি অঞ্চলে ধর্মপ্রচার করা খুবই কঠিন ছিল কেননা জাগতিক কোন সুযোগ-সুবিধা পাবার আশায় মান্দিদের অনেকেই ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করেছিল। ক্যাথলিক মিশনারিদের সঙ্গে ব্যাপ্টিস্ট মণ্ডলীর প্রচারকগণের প্রতিযোগিতা চলত[১]। সাংসারিক মান্দিদের খ্রিষ্টধর্মের প্রতি তেমন আকর্ষণ ছিল না। এমনকি তারা প্রায় সময়েই মাতাল অবস্থায় ফাদারদের অভ্যর্থনা জানাত। তবে ফাদার ফ্রান্সিস

[১] ক্যাথলিক মিশনারিরা ছিল অত্যন্ত গরীব। অপরদিকে ব্যাপ্টিস্ট মণ্ডলীর ছিল আকর্ষণীয় স্কুল ঘর, প্রতিটি গ্রামে শিক্ষক প্রচারক দল ও আর্থিক উন্নয়নের জন্য ব্যাংক।

সাংসারিকদের মন জয় করার জন্য প্রায়ই বিভন্ন গ্রামে যেতেন এবং এক সময়ে তাদেরকে নিয়ে তিনি সমবায় স্থাপন করেছিলেন। ফলশ্রুতিতে তাদের মধ্যে একনিষ্ঠ ভক্তিপরায়ণতা সৃষ্টি হয়েছিল তাই দীক্ষিত মান্দিরা একাগ্রতার সঙ্গে ফাদারদের উপদেশ শুনত এবং বাস্তব জীবনে তা প্রয়োগ করার চেষ্টা করত। সে সময়ে ক্যাথলিক মিশনারিগণ মান্দি অঞ্চলে এসে মান্দিদের মধ্যে আদিম যুগের অর্ধ বর্বরতার সাথে সাথে উল্লেখযোগ্য পরিত্রাণদায়ী সৎগুণের তথা: সরলতা, সততা এবং পুরুষোচিত বীরত্বের উপস্থিতি লক্ষ্য করেছিল। তারা আরো লক্ষ্য করেছিল যে একবার যদি মান্দিরা খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হয় তবে তারা ভাল খ্রিষ্টান হয়ে থেকে যায়। এভাবে ফাদার ফ্রান্সিস মান্দিদের খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করার সাথে সাথে দীক্ষা প্রার্থীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি করতেও পেরেছিলেন (Rema, 2010 : 170)।

১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে থাউশালপাড়া থেকে রাণীখং টিলায় মিশন স্থানান্তর করা হয়[২] এবং এই স্থানান্তরের যৌক্তিকতা হিসেবে সুসং রাজার যে যুক্তিটি ছিল তা হল:

> *"যেহেতু ভবিষ্যতে সমতল এলাকা থেকে সব মান্দিকে পাহাড়ে পুনর্বাসিত করা হবে- তাই রাণীখং টিলায় মিশন স্থাপন করাটা যুক্তিসংগত হবে"।*

মিশন স্থাপিত হওয়ার পর এই রাণীখং থেকেই ক্যাথলিক মিশনারিদের প্রচার কাজ শুরু হয়েছিল[৩] এবং পর্যায়ক্রমে সেখানে একটি গির্জাঘরসহ (পরিশিষ্ট: চিত্র ২) প্রাইমারী স্কুল, ছেলে ও মেয়েদের জন্য হোস্টেল, একটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, ধর্মশিক্ষকদের ট্রেনিং স্কুল এবং একটি সংবাদ পত্রিকা[৪] প্রতিষ্ঠিত করার সাথে সাথে মান্দি ভাষায় প্রার্থনা ও ধর্ম শিক্ষাদানের জন্য মান্দি ভাষায় বই[৫] প্রকাশিত হয়েছিল। সময়ের সাথে সাথে নানা কারণে এসবই বিলুপ্ত হয়ে যায়। তবে ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ফাদার পিটার গুডল রেমার উদ্যোগে মান্দি ভাষায় উপসনা আবার শুরু হয়[৬] (Rema, 2010 : 170-171)।

[২] নানা অসুবিধার কারণে অন্যত্র মিশন স্থানান্তর করার চিন্তা করা হয়। প্রথমে মাদারপুট গ্রামে স্থানান্তর করার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু সুসং রাজার পরামর্শে অবশেষে বর্তমান রাণীখং টিলায় মিশন স্থানান্তর করা হয়।

[৩] পূর্বে বালুচড়া, সুদূর পশ্চিমে মরিময়নগর পর্যন্ত প্রায় ৯০ মাইল বিস্তৃত মান্দি এলাকায়।

[৪] "রাণীখংয়ের চিঠি" নামে একটি সংবাদ পত্রিকা প্রৈরিতিক কাজের খবরাখবর সরবরাহের জন্য এ অঞ্চলে জন্ম নেয়।

[৫] "স্খাং ক্যাটেগিজম" নামে মান্দি ভাষায় বই প্রকাশ করা হয় ফাদার ফ্রান্সিস গুডলের উদ্যোগে ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দে।

[৬] রোমে অনুষ্ঠিত (১৯৬২ থেকে ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত) দ্বিতীয় ভ্যাটিকান মহাসভায় মণ্ডলীর উপাসনার স্থানীয়করণের সুপারিশক্রমে ঢাকা মহাধর্ম প্রদেশের প্রয়াত আর্চবিশপ গাঙ্গুলী ও তাঁর উত্তরসূরী আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিওর সমর্থনে।

বিশপ যোসেফ আর্মন্ড লা গ্রান্ড ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে বিশপ লিন্নেবর্ণ পরলোকগমনের পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি মান্দি আদিবাসী অঞ্চল ছাড়াও আরাকানের আদিবাসী অঞ্চল ও লুসাই পাহাড়ী আদিবাসী অঞ্চল এই দুটি পাহাড়ী আদিবাসীদের মধ্যে কাজ করার জন্য মিশনারিদের পাঠিয়েছিলেন (Rema, 2010 : 171)।

লুসাই আদিবাসীদের অনুরোধে পরবর্তী সময়ে বিশপ লা গ্রান্ড লুসাই পাহাড়ীদের মধ্যে কাজ করার জন্য ফাদার বোলেকে নিয়োগ করেছিলেন। এরপর ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা ধর্মপ্রদেশকে দু'ভাগ করে চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশ বানিয়ে কানাডার হলিক্রশ সম্প্রদায়ের যাজকদের কাছে এর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল। এ পর্যায়ে পোপ একাদশ পিয়ুস -এর ঢাকা ধর্মপ্রদেশের জন্য সহকারী বিশপ নিয়োগ করার পরিকল্পনার সূত্র ধরে ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে ফাদার তিমথি ক্রাউলিকে ঢাকায় সহকারী বিশপ নিয়োগ করা হয়। ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে বিশপ লাগ্রান্ড রোমের কাছে অব্যাহতির জন্য আবেদন জানান এবং ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে স্বদেশে ফিরে যান। ফাদার বিশপ লাগ্রান্ডের অব্যাহতি লাভের পর পরই তাঁর উত্তরাধিকারী হিসেবে বিশপ ক্রাউলি ঢাকা ধর্মপ্রদেশের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন (Rema, 2010 : 171-172)।

ঢাকা ধর্মপ্রদেশের অধীনে ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বৃহত্তর ময়মনসিংহের মান্দি অঞ্চলে বেশ কয়েকটি মিশন স্থাপিত হয়[৭] যার ফলে বৃহত্তর ময়মনসিংহের অধিকাংশ মান্দিগণ ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষিত হয় (Rema, 2010 : 172)। যে কয়টি মিশন স্থাপন করা হয়েছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য:

১. রাণীখংয়ে ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে বিশপ লিন্নেবর্ণের আমলে ১টি।
২. ভালুকাপাড়ায় (পরিশিষ্ট চিত্র ৩) ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে বিশপ লাগ্রান্ডের আমলে ১টি ।
৩. ময়মনসিংহ শহরে (পরিশিষ্ট: চিত্র ৫) ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে ১টি ।
৪. বালুচড়ায় ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে বিশপ ক্রাউলির আমলে ১টি।
৫. মরিয়মনগরের বাঐবাদায় ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে ১টি।
৬. বারমারীতে (পরিশিষ্ট: চিত্র ৪) ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে ১টি।

[৭] হলিক্রশ সম্প্রদায়ের ফাদারগণই এসব মিশন স্থাপন করেছেন।

এছাড়াও ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে বিশপ গ্রেনার আমলেও জলছত্রে (পরিশিষ্ট: চিত্র ৬) ১টি মিশন স্থাপিত হয়। ফাদার লরেন্স গ্রেনার সিএসি ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকার ষষ্ঠ বিশপ হিসেবে মনোনীত হন এবং আমেরিকান নটরডেমে বিশপ হিসেবে তাঁর অভিষেক হয়। ঢাকায় পৌঁছার পর তাঁকে ধর্ম প্রদেশের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এরপর এ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন মিশনগুলোতে যাজকদের সাথে প্রৈরিতিক সেবা কাজ করার জন্য আগমন করে ক্রমান্বয়ে ফ্রান্সের সালেসিয়ান[৮], আমেরিকার হলিক্রশ এবং দেশীয় SMRA সিস্টারগণ অর্থাৎ সালেসিয়ান সম্প্রাদয়ের সিস্টারগণ চলে যাবার পরে হলিক্রশ সিস্টারগণ আসেন[৯] এবং পরে তাঁরা সেখান থেকে চলে গেলে তাঁদের জায়গায় SMRA সিস্টারগণ আসেন[১০]। সালেসিয়ান সম্প্রদায়ের সিস্টারগণ এ অঞ্চলে মেয়েদের জন্য হোস্টেল, প্রাইমারী ও হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এক পর্যায়ে সালেসিয়ান সম্প্রদায়ের সিস্টারগণ বিড়ইডাকুনী (পরিশিষ্ট: চিত্র ৭), ভালুকাপাড়া, রাণীখং, বারোমারী এবং মরিময়নগরে মিশনগুলোতেও কাজ শুরু করেন। এছাড়া মেডিক্যাল সিস্টারগণরাও এই বৃহত্তর ময়মনসিংহে কাজ করতে এসেছিলেন[১১]। বিশেষ করে মেরনাইট সিস্টারগণ ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দে জলছত্র কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠা এবং কুষ্ঠ রোগীদের সেবা করতে এ অঞ্চলে আগমন করেন (Rema, 2010 : 172-173)।

মান্দি অঞ্চলে মিশনগুলোর প্রতিষ্ঠার পর অদ্য অঞ্চলের প্রতিটি গ্রামেই একটি করে প্রাইমারী স্কুল, হাই স্কুল[১২], মেয়েদের হাই স্কুল[১৩], কর্মদক্ষতা ও কর্মসংস্থান গড়ে তোলার জন্য কারিগরি স্কুল, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য উন্নতমানের কৃষি খামার এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে আর্ত পীড়িতদের সেবার জন্য চিকিৎসা সেবা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। আর এভাবেই মিশনারিরা নানা সেবা প্রদান করার পাশাপাশি মান্দি অঞ্চলে খ্রিষ্টধর্ম প্রচার কাজ করছে। যার ফলে আচিক্ মান্দিদের মধ্যে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণের হার ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে (Rema, 2010 : 173-74)।

[৮] সর্বপ্রথম ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দে ময়মনসিংহে আসেন।

[৯] মান্দি অঞ্চলে বর্তমানে জলছত্র ও পীরগাছাতে হলিক্রশ সিস্টারগণ রয়েছেন।

[১০] সিস্টারগণ ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে মিশন থেকে চলে গিয়ে পরবর্তীতে আবার ফিরে এসে একরকম স্থায়ীভাবেই এ অঞ্চলে থেকে যায়।

[১১] আর্চবিশপ গ্রেনারের উদ্যোগে ময়মনসিংহ শহরে সেন্ট মাইকেল নামে একটি ধর্মপ্রদেশীয় হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করার জন্য ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে ১৩ সেপ্টেম্বর মেডিক্যাল সিস্টারগণ ঢাকা থেকে ময়মনসিংহ শহরে আসেন।

[১২] হলিক্রশ ব্রাদারদরগণ ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে বিড়ইডাকুনীতে একটি হাই স্কুল স্থাপন করেন।

[১৩] সালেসিয়ান সিস্টারগণ মেয়েদের জন্য ময়মনসিংহ শহরে হলি ফ্যামিলি হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।

৫.২। ইংরেজ শাসন পরবর্তীকালে খ্রিষ্টধর্মের স্বরূপ :

ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে গারো জনগোষ্ঠী কোন কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অধীনে সংগঠিত ছিল না। গারো এলাকায় তারা ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে বসবাস করত এবং প্রত্যেকটি দলে ভিন্ন ভিন্ন 'আখিং নকমা' বা গ্রাম প্রধান থাকতো। তাঁর নেতৃত্বে গারোদের বিভিন্ন দলে ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হত। এক্ষেত্রে পরিমল চন্দ্র করের (Kar, 1970 : 1-2) বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য[১৪]। তবে ১৯১০ খ্রিষ্টাদের আগে গারো জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে শাসনকার্য পরিচালনার জন্য ব্রিটিশ সরকারের কোন ভিন্ন প্রশাসনিক নীতি ছিল না। ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে একটি আইন[১৫] পাশের মাধ্যমে গারো পাহাড়ী এলাকা ব্রিটিশ শাসনের অধীনে আসে (Kar, 1970 : 76)। তবে গরোদের শাসন ব্যবস্থার অধীনে আনলেও তারা মূল জনগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করত। ব্রিটিশ সরকারও সচেতনভাবেই গারো এলাকার সাথে অন্য এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের চেষ্টা করেনি। তারা স্বাধীনভাবে তাদের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবন অতিবাহিত করতে পারত। প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ শাসন আমলে গারো জনগোষ্ঠীর মধ্যে খ্রিষ্টধর্ম প্রচার শুরু হলেও তা খুব বেশী ব্যাপকতা লাভ করতে পারেনি।

গারোদের মধ্যে খ্রিষ্টধর্মের প্রচার প্রধানতঃ গেল শতাব্দির মাঝামাঝি সময়ে ব্যাপকতা পেয়েছে যার মূল ধরণ বর্ণনার জন্যে প্রাথমিক পর্যায়ে খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করণের থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত একটি সম্যক প্রতিবেদনের প্রয়োজন। জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশের সমস্ত খ্রিষ্টান মণ্ডলীর মধ্যে সর্ববৃহৎ হচ্ছে ক্যাথলিক মণ্ডলী। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগে এই মণ্ডলীর মোট ডায়োসিসের সংখ্যা ছির চার। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের পর এই চারটি ডায়োসিস বেড়ে আটটি ডয়োসিস পর্যন্ত তৈরী হয়েছে। এর মধ্যে তিনটি ময়মনসিংহে। অর্থাৎ গারো জনসমষ্টির মধ্যে এর

[১৪] Immediately before the British contact with Garos the mountainous interior and the inaccessible tickets were found to be inhabited by this independent Garos; …. It does not appear, either from indigenous traditions or from any historical records, that the district the Garo Hills were ever administered by any indigenous government of a single or uniform system. The tribe was found both organized divided into several clans, and each clan was headed by an influential chief, called 'Nokma'….. as a religious head of the clans and a custodian of the land held in common ownership and use.

[১৫] Till the year 1910, no comprehensive rules were framed by the local government for the administration of police, civil and criminal justice. It was been carried on by different executive rules and Regulations. By a notification No. 746P, dated 24th September 1910, comprehensive rules were framed for the above purpose. Since then the district was being administrated under those rules. This notification only upheld the earlier tradition of the British administration in this district and made it politically, economically, and socially an excluded area.

প্রভাব সর্বাধিক পরিলক্ষিত হয়েছে। বস্তুত ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে যেখানে ক্যাথলিক জনসংখ্যা ছিল এক লাখ সেখানে আজ তা প্রায় পাঁচ লাখে পৌঁছেছে। উল্লেখ্য এই জনসংখ্যার প্রায় ৬০ ভাগই আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত। (Das, 2016 : 270-271) গারোরা কেন এত সহজে এবং দ্রুত ধর্মান্তরিত হলো এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে রেভাঃ ক্লেমেন্ট রিছিল লিখছেন যে, প্রধানত দুটি কারণ উল্লেখযোগ্য– প্রথমটি হচ্ছে ধর্ম ও শিক্ষা, অর্থাৎ শিক্ষার মাধ্যমেই পরোক্ষভাবে ধর্মপ্রচার। এ ক্ষেত্রে ক্যাথলিক এবং ব্যাপটিস্ট উভয় মণ্ডলী যথেষ্ট দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে তার মতে, সেবা কর্মে খ্রিষ্টান মিশনারিদের বিপুল প্রণোদনা। বহু সংখ্যক হাসপাতাল ও সেবামূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে তারা গারোদের হৃদয় মন জয় করে ফেলেছিল (Das, 2016 : 111-113)। একটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ এখানে প্রাসঙ্গিক হতে পারে। জি বি সি খ্রিষ্টান স্বাস্থ্য পরিকল্পনার অধীনে হালুয়া ঘাটে জয় রামপুরা একটি অত্যাধুনিক হাসপাতালে গেল শতাব্দীর শেষ দিকে সেখানকার উপজেলা মেজিস্ট্রেট পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। সেখানে জনৈক সেবা গ্রহণকারী ব্যক্তির সঙ্গে তার কথোপকথোনের সুযোগ হয়েছিল। তিনি একজন স্থানীয় ধর্মান্তরিত খ্রিষ্টান ছিলেন, যিনি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, এই সেবা লাভের আশায় তারা দলে দলে ধর্মান্তরিত হয়েছিল। পক্ষান্তরে ঐ ম্যাজিস্ট্রেটই কিছুক্ষণ পর ঐ প্রতিষ্ঠানের খ্রিষ্টিয় ধর্মযাজকের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে বিষয়টি উল্লেখ করেছিলেন। এতে তিনি আদৌ বিস্মিত হননি, বরঞ্চ তিনি সহাস্যে উল্লেখ করলেন যে আমাদের লক্ষ্যবস্তু এই বয়স্ক ব্যক্তিটি নয় বরঞ্চ তার সন্তানাদি যারা খ্রিষ্টধর্মের দীক্ষা থেকে বিচ্যুত হবে না। একজন গবেষকের পক্ষে এই তথ্য সরাসরিভাবে প্রশ্নমালার মাধ্যমে উদ্ধার করা হয়তো সম্ভব হতোনা কিন্তু একজন সাধারণ কর্মকর্তা কিংবা অনুরূপ কোন ব্যক্তির কাছে অতি সহজে প্রকাশিত হতে পারে (Hammersley and Atkinson, 1997 : 42)।

এদেশে গারো অঞ্চলে রোমান ক্যাথলিক খ্রিষ্ট ধর্মীয় বাণী প্রচার শুরু হয় বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে রোমান ক্যাথলিক চার্চের কয়েকজন মিশনারির ধর্মপ্রচারের মাধ্যমে। তাদের পুঁথিগত শিক্ষাও শুরু হয়েছিল এই মিশনারিদের প্রচেষ্টাতেই। ব্রিটিশ সরকার গারো অঞ্চলে প্রশাসনিক দ্বায়িত্ব গ্রহণ করলেও তাদের শিক্ষার ভার সম্পূর্ণভাবে মিশনারিদের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন। পূর্বে গারো অঞ্চলে হিন্দু জমিদারদের স্থাপিত যেসব স্কুল ছিল সেগুলোতে গারোদের প্রবেশাধিকার ছিল না। মিশনারিগণ গারো এলাকায় প্রথমে কেবল প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন (Kar, 1970 : 77)। গারো গ্রামে স্কুলগুলোতে মিশনারিগণ এই স্কুল থেকে শিক্ষা লাভ করা যুবকদের শিক্ষক ও

খ্রিষ্টধর্ম প্রচারকরূপে নিয়োগ দিতেন। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে যখন ক্যাথলিক মিশনারিগণ এসব এলাকায় আসেন। তখন তারাও শিক্ষা ও ধর্মপ্রচার কর্ম একইভাবে অব্যাহত রাখেন। পঞ্চাশ বছরের মধ্যে গারোদের ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন আসে। শিক্ষা ক্ষেত্রের মত চিকিৎসা ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রেও তারা অবদান রেখেছে। শুধুমাত্রই ক্যাথলিক মিশনারিরাই নন, সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যাপ্টিস্ট, এ্যাংলিকান, এডভেনটিস্ট, প্রেসবাইটারীয়ান প্রভৃতি সব সম্প্রদায়ের মিশনারিরাই নিজ নিজ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। গারো অঞ্চলে বিভিন্ন মিশনারিদের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলোতে ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সকলে শিক্ষা লাভ করতে পেরেছে। তবে মিশনারিদের মূল লক্ষ্য ছিল গারো জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করে তোলা। সেই সাথে তাদের আরেকটি লক্ষ্য ছিল এসব বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেয়ার মাধ্যমে খ্রিষ্টধর্মের আদর্শকে প্রচার ও প্রসার। প্রথম দিকে তারা ধর্মপ্রচারের সাথে সাথে গারোদের ঐতিহ্যবাহী নাচ গান ও সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানকে নির্মুল করার চেষ্টা করলেও পরবর্তীকালে তাদের মনোভাব পরিবর্তিত হয়। বিশেষ করে ক্যাথলিক মিশনারিগণ তাদের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতিকে খ্রিষ্টধর্মের সাথে সমন্বয় সাধনে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

তবে গারো আঞ্চলে ক্যাথলিক মিশনারিদের কর্মকাণ্ড অতীতে সবসময়ই নির্বিঘ্ন ছিলনা। ব্রিটিশ শাসনের পরবর্তীকালে গারো এলাকায় বসবাসকারী গারো জনগোষ্ঠী ও খ্রিষ্ট ধর্মীয় মিশনারিগণ সবচেয়ে বেশি সংকটময় পরিস্থিতিতে পড়ে ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়। ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ভারত থেকে বহুসংখ্যক উদ্বাস্তু জনগণ এসে উত্তর ময়মনসিংহের গারোদের বসবাসরত এলাকায় আশ্রয় গ্রহণ করে (Burling, 1997 : 67; Gedart and Jangcham, 2018 : 147)। এর অল্প কিছু দিন পরে পূর্ব পাকিস্তানের কিছু জনগণের সাথে এই ভূমিহীন উদ্বাস্তুদের ভয়াবহ দাঙ্গা সৃষ্টি হয়। এই দাঙ্গার সময়ে নিরাপত্তার অজুহাতে তৎকালীন পাকিস্তানী সরকার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বিদেশী মিশনারি কর্মীদের অবস্থানে বিধিনিষেধ আরোপ করে। ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় গারো অঞ্চলে কর্মরত আমেরিকান মিশনারিরা এ অঞ্চলের আদিবাসীদের রক্ষায় যে ভূমিকা পালন করেছিল তার কারণে তৎকালীন পাকিস্তানী সরকার তাদের উপর অসন্তষ্ট হয়েছিল। এর ফলে হলিক্রশ মিশন গারো অঞ্চল থেকে তাদের বেশকিছু যাজককে প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। অন্যদিকে এই দাঙ্গার ফলে গারো জনগোষ্ঠীর অনেকেই ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ভারতীয় সীমান্তে বা দেশের অন্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করে। সে সময় এ অঞ্চরের মিশনারিরা অত্যন্ত

সাহসিকতার সাথে এ অঞ্চলের গারো ও অন্যান্য আদিবাসী গোষ্ঠীর সদস্যদের আশ্রয় দান করে ও তাদের সম্পত্তি রক্ষায় সাহায্য করে। তাদের এই সহায়তার কারণেই অনেক আদিবাসী ময়মনসিংহ এলাকায় থাকতে সমর্থ হয়েছিল। অন্যথায় এ অঞ্চল হয়তো আদিবাসী শূন্য হয়ে যেত (Gedart and Jangcham, 2018 : 142-143)।

১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার চেয়ে গারোদের উপর আরো বিরূপ প্রভাব পরেছিল ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে পাক-ভারত যুদ্ধের সময়। ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দের পাক-ভারত যুদ্ধ মূলত পশ্চিম পাকিস্তান সীমান্তেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু সেই যুদ্ধের প্রভাব পড়েছিল ময়মনসিংহ জেলার উত্তরাঞ্চলে আদিবাসী অধ্যুষিত এলকায়। পাকিস্তান সরকারের বিভিন্ন বিধিনিষেধের ফলে গারো অঞ্চলের প্রায় প্রতিটি মিশন হতে মিশনারিরা চলে যেতে বাধ্য হয়। অন্যদিকে আদিবাসীদের উপর নেমে এসেছিল সরকারের নানামুখী চাপ। ফলে ভীতসন্ত্রস্ত আদিবাসীরা আরো ব্যাপক হারে দেশ ত্যাগ করতে থাকে। পাকিস্তানী সরকার সে সময়ে আদিবাসীদের পরিত্যক্ত ভূ-সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তি হিসেবে তালিকাভুক্ত করে (Gedart and Jangcham, 2018 : 142-143)।

১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দের পর ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ও মান্দিরা আবার উদ্বাস্তু হয়ে দেশ ত্যাগে বাধ্য হয়েছিল। তবে পূর্বের সাথে ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের পার্থক্য ছিল এসময়ে তারা একা নয়। ১৯৭১ সনে বাঙালী হিন্দু মুসলমান সকলে একসাথে মান্দিদের মতই দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ই বস্তুত মান্দিরা বাঙালী জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ জনগোষ্ঠীর সাথে সত্যিকারভাবে একাত্মতাবোধ করে। এই বাংলাভাষী জনগোষ্ঠীর সাথে একাত্ম হয়ে গারো ও অন্যান্য উপজাতীয় জনগোষ্ঠীও পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিল (Burling, 1997 : 70)। প্রকৃতপক্ষে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে অংশ্রগ্রহণের ফলেই তারা বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর নিজেদের বাংলাদেশী বলে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করে। মুক্তিযুদ্ধে গারো অনেক তরুন যুদ্ধক্ষেত্রে আহত এবং নিহত হয়েছিল। গারো অঞ্চলে কর্মরত দেশী ও বিদেশী মিশনারি কর্মীরাও মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করেছিল। ফলে রাণীখং, ভালুকাপাড়া প্রভৃতি অঞ্চলের মিশনগুলোতে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী মর্টার শেল নিক্ষেপ করেছিল। টাঙ্গাইরের জলছত্র মিশনও পাকিস্তানী বাহিনীর আক্রমনের শিকার হয়েছিল। কারণ জলছত্র মিশনের তৎকালীন আমেরিকান মিশনারি ফাদার ইউজিন হোমরিক যুদ্ধাহত

মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করতেন এবং মিশনে বহু বিপন্ন হিন্দু পরিবারকে আশ্রয় প্রদান করেছিলেন (Gedart and Jangcham, 2018 : 144)।

এভাবে গত শতব্দীর ষাটের দশক থেকে মান্দিরা বিভিন্ন দূর্যোগে কাটিয়েছিল। একই সাথে তাদের অঞ্চলের মিশনারিদেরও রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে নানা সমস্যায় পড়তে হয়েছিল। তবে এসব নানামুখী সমস্যা মান্দিদের মধ্যে খ্রিষ্টধর্মের প্রচার ও প্রসারে বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি। বরং বিংশ শতাব্দীর শেষ কয়েক দশকেই তাদের ধর্মান্তরের হার বৃদ্ধি পেতে থাকে।

১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দে পোপ দ্বিতীয় জন পল ময়মনসিংহকে একটি আলাদা ধর্মপ্রদেশ হিসেবে ঘোষণা দেন। এই ঘোষাণার মাধ্যমে টাঙ্গাইল, জামালপুর, শেরপুর ময়মনসিংহ এবং নেত্রকোণা এই নতুন ক্যাথলিক ধর্মপ্রদেশের অর্ন্তভূক্ত হল। এই ধর্মপ্রদেশের প্রথম বিশপ ছিলেন ফাদার ফান্সিস এ গোমেজ। এভাবে গারো অঞ্চলে ক্যাথলিক মণ্ডলীর অবস্থান সুদৃঢ় হয়। পরবর্তীতে ২০০৬ সালে ময়মনসিংহের ধর্মপ্রদেশের ফাদার পনেন পল কুবি বিশপ হিসেবে নিযুক্ত হন। তিনি বাংলাদেশে তথা বিশ্বে প্রথম গারো বিশপ। তিনি ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের উন্নয়নে অনেক অবদান রেখেছেন। এই ধর্মপ্রদেশে গির্জাসহ বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণে তার অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বিশপ ছাড়াও গারো জনগোষ্ঠীর অনেকেই খ্রিষ্ট ধর্মীয় যাজক হিসেবে বিভিন্ন সময়ে নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে শুরু করে ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর পর্যন্ত এদেশের মোট ৪৫ জন গারো যাজক পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। গারো নারীদের মধ্যে ব্রতধারিণির সংখ্যাও অর্ধশতাধিক। তাদের মধ্যে সালোসিয়ান সম্প্রদায়ের ব্রতধারীণির সংখ্যাই বেশি। তাছাড়া SMRA, RNDM, হলিক্রশ সংঘ, মাদার তেরেসা সম্প্রদায়, সাধ্বী ক্লারা সম্প্রদায়ের গারো ব্রতধারীণি রয়েছেন (Gedart and Jangcham, 2018 : 146-147)।

ময়মনসিংহের ক্যাথলিক ধর্মপ্রদেশ বর্তমান কালে বাংলাদেশে খ্রিষ্ট ধর্মীয় অন্যান্য সম্প্রদায় যেমন ব্যাপ্টিস্ট, প্রেসবাইটেরিয়ান, সেভেন ডে এ্যাড্ভেনটিস্ট প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নে ও ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতেও সচেষ্ট। ফলে তারা প্রায়ই নানা আন্ত: মণ্ডলীয় সংলাপ আয়োজন করে। এভাবে অতীতে বিদেশী মিশনারিদের মত বর্তমানে গারো অঞ্চলে দেশী মিশনারিরাও খ্রিষ্টধর্মের প্রচার ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যাচ্ছে।

৫.৩। শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন ও তার প্রসার :

খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণের আগে মান্দিরা ছিল একটি অনক্ষর সমাজ। ব্রিটিশ সরকার গারো হিলসের শাসনভার গ্রহণ করার পর মান্দিদের শিক্ষিত ও সভ্য করে গড়ে তোলার জন্য মিশনারিদের আহ্বান জানিয়েছিল। গারো হিলসে প্রথম আগত মিশনারি গোষ্ঠী আমেরিকান ব্যাপ্টিস্ট মিশনারিগণই গারোদের মধ্যে প্রথম শিক্ষার প্রবর্তন করে (Marak, 2018 : 44-45)। এই মিশনারিদের প্রচেষ্টায়ই মান্দি ভাষা রোমান হরফে একটি লিখিত ভাষায় পরিণত হয়েছে। বর্তমানে গারো হিলস এবং বাংলাদেশেও প্রায় শতকরা ৯৯ জনই খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী।

ব্যাপ্টিস্ট মিশনারি গোষ্ঠী পরবর্তীতে বাংলাদেশে ক্যাথলিক মিশনারি গোষ্ঠী গারোদের ধর্মান্তরে এবং তাদের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। ব্যাপ্টিস্ট মিশানারীরাই বিড়ইডাকুনীতে প্রথম প্রাইমারী ও হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিল। এরপর ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে ক্যাথলিক মিশনারিগণ বিড়ইডাকুনীতে উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন করেছিল। এভাবে ইংরেজ শাসনামল থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের খ্রিষ্টান মিশনারিদের শিক্ষাব্যবস্থা প্রসারে ভূমিকা রাখার জন্য মান্দিরা দ্রুত শিক্ষিত হয়েছে।

বাংলাদেশের গারো অধ্যুষিত এলাকার ধর্মপল্লীগুলোতে মিশনারিরা বহু স্কুল, কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছে। ক্যাথলিক মিশনারিরাই মান্দি অঞ্চলে শিক্ষাব্যবস্থা ব্যাপকভাবে প্রসারে ভূমিকা রেখেছে। ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশে ক্যাথলিক মণ্ডলীর প্রায় প্রতিটি ধর্মপল্লীতে একটি করে হাইস্কুল এবং অনেকগুলো প্রাইমারী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ক্যাথলিক মিশনারিদের মধ্যে হলিক্রশ সম্প্রদায় শিক্ষা ক্ষেত্রে মান্দি অঞ্চলে অনেক অবদান রেখেছে এবং তারাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দে পোপ দ্বিতীয় জন পল বাংলাদেশে এসেছিলেন এবং এর এক বছরের মধ্যেই তিনি গারো অধ্যুষিত ময়মনসিংহ অঞ্চলে একটি নতুন ধর্মপ্রদেশ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। এই ধর্মপ্রদেশের প্রথম বিশপ পনেন পল কুবি। তিনিই গারোদের শিক্ষালাভে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। প্রতিটি গারো পরিবারকে শিক্ষিত করার ইচ্ছা ছিল তাঁর। তাঁর চেষ্টার ফলশ্রুতিতেই ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দে ময়মনসিংহ শহরে নটরডেম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

নটরডেম কলেজ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে (Gedart and Jangcham, 2018 : 234-235)।

গারোদের ক্ষেত্রে একটি বিষয় অনস্বীকার্য যে, তাদের খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তর এবং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অতপ্রোতভাবে জড়িত। এ প্রসঙ্গে রবিন্স বার্লিং (Burling, 1997 : 177) এর বক্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে[১৬]।

বার্লিং তাঁর গ্রন্থে গারোদের সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব কিছু পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেছেন। ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মধুপুর এলাকায় লক্ষ্য করেছেন, শিক্ষালাভ এবং খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তর প্রায় সমার্থক হলেও পিতা-মাতা তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে উদ্বিগ্ন হয়নি। বরং দেখা গিয়েছে একই বাড়িতে খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী শিক্ষিত ছেলে মেয়ে এবং সাংসারেক ধর্মাবলম্বী বয়স্করা শান্তিপূর্ণ ভাবে বসবাস করছে। তাঁদের মনোভাব এমন যে মনে হয় তাঁদের মতে সাংসারেক ধর্ম ত্যাগ করার অর্থ এই নয় যে তারা গারো নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর সদস্য থাকবে না। তবে বার্লিং মনে করেন তারা যে প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করছে তা অনেকটাই মুখস্থ বিদ্যার উপর নির্ভরশীল এবং তা ব্যবহারিকভাবে কাজে লাগে না।

মান্দিরা শিক্ষালাভের জন্য যতটা অর্থ এবং শ্রম ব্যয় করছে সে তুলনায় তাদের সফলতা উৎসাহব্যঞ্জক নয়। তাদের শিক্ষা অনেকটাই পুঁথিগত এবং অনেক সময় তারা যা শেখে তা সার্বিকীকরণ করে ব্যবহারিকভাবে কাজে লাগাতে পারেনা। তাদের মধ্যে কারিগরী শিক্ষার অভাব আছে। বাস্তবে দেখা যায় কেবল নার্সিং ছাড়া অন্য কোন ব্যবহারিক শিক্ষায় গারোদের তেমন সফলতা নেই। তাদের মধ্যে যারা উচ্চশিক্ষা লাভ করে না তারা তাদের গ্রামে কাজের ক্ষেত্রে বা কৃষি ব্যবস্থায় তাদের প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা কোন কাজে লাগাতে পারে না।

প্রকৃতপক্ষে গারোদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য তাদের শিক্ষালাভের লক্ষ্য স্থির করা প্রয়োজন। তাদের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাহার অনেক বেশি কিন্তু অনেক সময়ই তা কর্মমূখী শিক্ষা নয়। তাদের অনেকেই সেমিনারীতে মিশনারি কর্মী হওয়ার জন্য ভর্তি হয় কিন্তু অল্পকজন ছাড়া অধিকাংশই শিক্ষা সমাপ্ত করতে পারেনা। সুতরাং এই শিক্ষা তাদের কোন ব্যবহারিক কাজে লাগে না।

[১৬] "Conversion to Christianity became an almost automatic part of the new education, and virtually every educated Garo has been a Christian."

কিন্তু তারা যদি কোন 'ভোকেশনাল ট্রেনিং' লাভ করতো তাহলে তারা যে কোন একটা কাজে দক্ষতা অর্জন করে জীবিকা অর্জন করতে পারতো। তবে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে লেখা-পড়া শেখা ছাড়াও তারা ঐতিহ্যগতভাবে বিভিন্ন বিষয় শিশুকাল থেকেই শিখে থাকে, যেমন বিভিন্ন গাছের নাম, তাদের প্রাচীন গান ও উপকথাসমূহ, বিভিন্ন মিতের নাম ও তাদের ভূমিকা সম্পর্কে জ্ঞান। তবে মান্দিরা নিজেরা তাদের গোষ্ঠীগতভাবে অর্জিত এ বিষয়গুলোর গুরুত্ব আদৌ উপলব্ধি করেনা বলে বার্লিং মনে করেন।

৬.১। গারো সমাজ বিবর্তনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

সিনক্রেটিজমের উদাহরণ হিসেবে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে আচিক্ মান্দি বা গারোরা অন্যতম প্রধান গোষ্ঠী। সাধারণত: শহরাঞ্চলে বসবাসকারী গোষ্ঠীর থেকে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী উপজাতি বা আদিবাসী গোষ্ঠীর সামাজিক বিবর্তন ঘটে ধীর গতিতে। গারো সমাজকে আমরা উপজাতি বা আদিবাসী যে নামেই আখ্যায়িত করি না কেন আজকে গারো নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী একটি সভ্য সমাজে পরিণত হয়েছে বলা যায়। কিন্তু আজ থেকে মাত্র দু'শ বছর পূর্বে অষ্টাদশ শতাব্দীতেও গারো সমাজ সভ্যতার আলো থেকে ছিল অনেক দূরে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে গারো সমাজের চিত্র অত্যন্ত নিখুঁতভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে রেভারেন্ড উইলিয়াম কেরি (Carrey, 1919) কর্তৃক লিখিত *'The Garo Jungle Book'* নামক গ্রন্থে। আজকের গারো সমাজের সঙ্গে তখনকার গারো সমাজের তুলনা করলেই বিবর্তন ও অগ্রগতির মাত্রা নির্ণয় করা সম্ভব।

প্রাচীন কাল থেকেই আসাম উপত্যকায় বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ও ধর্মগোষ্ঠীর আবাসস্থল ছিল। এখানে আগত আদিম ও বর্বর জাতিরা ক্ষমতা ও প্রধান্য বিস্তার, জায়গা জমি দখল ইত্যাদি কারণে নিজেদের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাকতো, ফলে অনেক ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী এখানে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। এতদ্সত্ত্বেও কিছু কিছু প্রাচীন সংস্কৃতি ও ভাষার ধ্বংসাবশেষ এখনো পাওয়া যায়। সেখানকার সেই পরাজিত দলগুলো যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে এবং স্বতন্ত্র গোষ্ঠী হিসেবে বাস করার আশায় পাহাড়ের গহীন অরণ্যের মাঝে আশ্রয় নিয়েছিল। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, গারোরাও পরাজিত ও বিতাড়িত হয়ে গারো পাহাড়ের অরণ্যাঞ্চলে নিভৃতে আশ্রয়ের উদ্দেশে এসেছিল। বন্য জীব-জন্তুর আশ্রয়স্থল এবং বন্য ও আদিম মানুষের আবাসভূমি হিসেবে গারো পাহাড় দীর্ঘ দিন ধরে বহির্সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। গারোদের একটি বৃহদাংশ পাহাড়ে ও গভীর অরণ্যে বসবাস করতেই পছন্দ করতো। কেননা শিকার, বুনো ফলমূল সংগ্রহ ইত্যাদি তাদের জীবিকার একটি বড় অবলম্বন ছিল। মোঘল আমলে গারোদের বাসভূমি দখলের মোঘলদের কোন ইচ্ছা ছিল বলে মনে হয় না। সে আমলে গারোরা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল। এমনকি তাদের আক্রমণে সমতল ভূমির লোকেরাও তটস্থ থাকতো। বস্তুতঃ নিকটস্থ সমতল ভূমির অধিবাসীদের কাছ থেকে তারা অনিয়িমিতভাবে কর আদায় করতো। মাঝে মাঝে এর চেয়েও বেশি নৃশংস ঘটনা ঘটত। পার্বত্য অঞ্চলের গারোরা সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোতে আতর্কিতে হামলা চালিয়ে নিরীহ মানুষের, বিশেষ করে হিন্দুদের মাথা কেটে নিয়ে যেত। গারোরা একে 'শির-শিকার' বলতো।

এই 'শির-শিকার' করার কয়েকটি কারণ ছিল। প্রথমত; নর-করোটি ঘরে সারি সারি সাজিয়ে রাখা তাদের শৌর্য-বীর্য ও আভিজাত্যের লক্ষণ বলে মনে করা হতো। এছাড়াও ধর্মীয় কাজেও এর প্রয়োজন ছিল বলে তারা মনে করতো। অতীতে গারোরা বিশ্বাস করতো মৃত্যুর পর তাদের অত্মা 'চিকমাং' অর্থাৎ কৈলাশ পর্বত চূড়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে। তারা যদি কোন প্রাণীকে হত্যা করতে পারে তবে তার আত্মা হত্যাকারী ব্যক্তির আত্মাকে শক্তিশালী করে। মৃত ব্যক্তি যেন সুউচ্চ 'চিকমাং' পর্বত চূড়ায় সহজে উঠতে পারে সেজন্য মৃত ব্যক্তির শবের সাথে সদ্য নিহত ব্যক্তির মস্তক দাহ কিংবা সমাধিস্থ করা হতো। পার্বত্য গারোরা মাঝে মাঝে সমভূমি থেকে স্বাস্থ্যবান যুবক-যুবতীদের অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে মজুর বা দাস-দাসীর কাজ করাতো। মালিকের মৃত্যু হলে দাস-দাসীকেও হত্যা করে সাথে দিয়ে দেওয়া হতো, যাতে মৃত্যুর পরও তারা মৃত মালিকের সেবা শুশ্রুষা করতে পারে। এ প্রসঙ্গে প্লেফেয়ার (Playfair, 1909 : 84-85) বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য[১]।

ব্রিটিশ শাসনামলে গারো পাহাড় সংলগ্ন জেলাগুলোতে গারোদের আক্রমণ ক্রমশ তীব্র আকার ধারণ করে চলছিল। গারোদের আক্রমণ বন্ধ করার জন্য তৎকালীন ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিশ ঢাকা বিভাগের কমিশনার জন ইলিয়টের কাছে নির্দেশ পাঠান। সরেজমিনে বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে জন ইলিয়ট ১৭৮৮ ও ১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দের শীতকালে দু'বার গারো পাহাড় সীমান্তে গিয়েছিলেন। ইলিয়ট তাদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেন এবং নানাবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। এমনকি একটি বিয়ের অনুষ্ঠানসহ অন্যান্য অনুষ্ঠানে যোগ দেন এবং তাদের ভোজ ও নৃত্যানুষ্ঠান উপভোগ করেন। ঢাকায় ফিরে তিনি গারো পাহাড়ে তার অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে একটি মূল্যবান রিপোর্ট লিখেন এবং ১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দে সরকারের কাছে দাখিল করেন। এছাড়াও Asiatic Researches ম্যাগাজিনের তৃতীয় সংখ্যায় গারোদের সম্পর্কে তাঁর একটি প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়। জন ইলিয়ট গারোদের সম্পর্কে লিখেছেন-"গারোরা সাধারণত খুবই বলিষ্ঠ ও সুঠাম দেহের অধিকারী। অত্যন্ত

[১] "Less than half a century ago, the Garos were looked upon as cruel and blood-thirsty savages, who inhabited a tract of hills covered with almost impenetrable jungle, the climate of which was considered so deadly as to make it impossible for a white man to live there. The Garos were notorious as the perpetrators of numerous raids into the plains at the foot of the hills in the districts of Goalpara and Mymensingh. On each occasion a number of defenseless *ryots* were killed, but it was rarely possible to bring the offenders to book owing to the difficulty experienced in moving troops through such a densely wooded tract of mountainous country…

The first few years of our administration of the Garo Hills furnished ample proof that besides raiding a common foe in the plains, the Garos were also addicted to internal warfare, and that many blood-feuds existed between individuals and villages."

পরিশ্রম ও কষ্ট সহিষ্ণু বলেও তাদের খ্যাতি আছে।" নাচ-গান ও মদ্যপান তাদের সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। মদ্যপানের সময় তারা নাচ-গান ও আমোদ প্রমোদে মেতে উঠে। নারী পুরুষ ও শিশু সকলেই যতক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, ততক্ষণই নাচতে থাকে। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ-সংক্রান্ত অনুষ্ঠান, অন্যান্য যেকোন সমাজিক অনুষ্ঠান,সভা-সমিতি বা বিবাহানুষ্ঠান প্রায় প্রত্যেক অনুষ্ঠানেই ভোজন ও মদ্যপান অপরিহার্য। এই মদ তারা নিজেরা ভাত থেকে তৈরী করে। তাদের প্রায় সব অনুষ্ঠানই দু' থেকে তিনদিন চলে।

ইলিয়টের মতে, এই অরণ্যচারী ও আদিম লোকদের স্বাভাবিক জীবন হিংস্র, ক্রুর বা রুক্ষ মেজাজী ছিল না। তাদের মধ্যেও মানবিক গুণাবলী বিদ্যমান ছিল। দয়া দেখালে তারা অবশ্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করত এবং সাত্যি কথা বলতে কি তাদের কথা-বার্তায় আচার-অনুষ্ঠানে একটা আনুগত্য বোধও পরিলক্ষিত হত। ১৮৬৬ সালে গারোয়ানায় ভিন্ন প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা হয় এবং লেঃ ডব্লিউ. জে. উইলিয়ামসন (Lieutenant W. J. Williamson) ১৭৬৭ খ্রিষ্টাব্দে তুরার পাহাড়ী আঞ্চলে তাঁর হেড কোয়ার্টার স্থাপন করেন। তিনি ছিলেন গারো পাহাড়ের প্রথম ডেপুটি কমিশনার। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তাদেরকে তিনি শান্ত করেন এবং আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল প্রজাগোষ্ঠীতে রূপান্তরিত করেন (Playfair, 1909 : 85)। কিছু রীতি-নীতি ও কুসংস্কারে বিশ্বাস ছাড়া 'শির-শিকার'-এর মতো ভয়ঙ্কর ও নৃশংস আচার ও প্রথা বন্ধ হয় এবং ক্রমশ গারো সমাজ থেকে এই আচরণ একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে যায়।

উপরিউক্ত গারো সম্প্রদায় থেকে বেশ কিছুটা ভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সমতল ভূমিতে বসবাসকারী গারোদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর গবেষকদের মধ্যে অনেকেই এদের সমাজ ও ব্যক্তি জীবনের বর্ণনায় নানাবিধ সৎগুণের উল্লেখ করেছেন যা প্রাথমিক গবেষকদের মনযোগ আকর্ষণ করেছিল; এহেন একজন গবেষক ছিলেন ডেল্টন (Dalton, 1872 : 75) যিনি তাদের সম্পর্কে মন্তব্য করেন[২]:

[২] "They are lively, good natured, hospitable, frank and honest in their dealings, till contaminated by their intercourse with Bengalis and they possess that pearl of great price so rare among the Eastern Nations-a love of truth. They will not hastily make engagements, because when they make them, they intend to keep them. They are affectionate fathers and kind husbands, and their conduct generally towards the weaker sex in marked by consideration and respect. Notwithstanding the lavish exposure of their persons the women are chaste and make good steady wives."

> *"তারা সেই মহামূল্যবান মুক্তার অধিকারী, যা সাধারণত প্রাচ্যের মানুষের মাঝে বিরল। আর সেই মহামূল্যবান মুক্তা হচ্ছে সত্যের পূজা, সত্যকে ভালোবাসা। আসলেই গারোরা অত্যন্ত সহজ ও সরল; ছলনা, মিথ্যা, কপটতা কি তারা জানতো না"।*

যুগের পরিবর্তনের সাথে আচিক্ মান্দি সংস্কৃতিরও পরিবর্তন এসেছে। এক্ষেত্রে যে বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে তা হচ্ছে তাদের খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তর। ইংরেজ শাসনামলে শাসকবর্গ গারোদের কোনভাবে দমন না করতে পেরে তারা নতুন নীতি গ্রহণ করে। তা হচ্ছে খ্রিষ্টান মিশনারী দ্বারা খ্রিষ্টধর্ম প্রচার ও তাদের মধ্যে সাংস্কৃতিক অনুপ্রবেশ। কিন্তু তা সহজ ছিল না। কেননা গারোরা শিক্ষা দীক্ষায় আদৌ আগ্রহী ছিল না। প্রথমাবস্থায় কেবল ক'জন গরীব যুবক ধর্মান্তরিত হয়। কিন্তু ক্রমে গোত্রপতিগণ ধর্মান্তরিত হতে শুরু করলে অবস্থার পরিবর্তন হয় (Nawaj, 1985 : 65-74)।

১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে রাধানাথ ভৌমিক প্রথম শিক্ষিত আচিক্ মান্দি, যিনি খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। এর পর থেকে গারো সমাজে খ্রিষ্টধর্ম বিস্তার লাভ শুরু করে। ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে গারো ব্যাপ্টিস্ট ইউনিয়ন গঠিত হয় নেত্রকোণার দূর্গাপুরের বিরিশিরিতে। আশির দশকে এখানে ব্যাপ্টিস্ট ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা বিশ হাজারে পৌঁছায়। ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত জয়নাথ চৌধুরীর মাধ্যমে হালুয়া ঘাটে অ্যাংলিকান খ্রিষ্টানমণ্ডলীর অক্সফোর্ড মিশন স্থাপিত হয়। ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে তাদের সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার। ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে ক্যাথলিক খ্রিষ্ট মণ্ডলীর প্রথম মিশন স্থাপিত হয় রাণী খং-এ। আশির দশকে গারো ক্যাথলিক খ্রিষ্টান সংখ্যা আনুমানিক চল্লিশ হাজারের মতো মনে করা হতো। একই সময়ে সেভেন ডে এডভেনটিস্ট ও পেন্তেকস্ট্যাল মণ্ডলীভুক্ত খ্রিষ্টমধর্মাবলম্বীর সংখ্যা ধরা হয় প্রায় দশ হাজার। সে সময়ে এ হিসেবে অ-খ্রিষ্টান গারোর সংখ্যা দাঁড়ায় দশ থেকে পনের হাজার (Ritchil, 1985 : 110)।

কিছু সংখ্যক গারো হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে। ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দে গুরুচরণ সিমসাং নামক জনৈক গারোর নেতৃত্বে তারা বৈষ্ণব ধর্মমতে দীক্ষিত হন। টাঙ্গাইলের মধুপুর থানা জলছত্র এবং আশেপাশের কয়েকটি গ্রামে তারা বাস করে। কিন্তু বিগত শত বছরে এ ধর্ম বিস্তার লাভ করতে পারেনি। তবে সনাতন ধর্মাবলম্বী হিন্দু, এমনকি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সাথেও তারা একাত্মতা প্রকাশ করতে পারেনি।

আনুমানিক পঞ্চাশটি পরিবারের সাড়ে চারশো জনের মতো লোক নিয়ে এই গারো হিন্দু সমাজ (Jangcham, 1985 : 105)।

৬.২। আচিক্ মান্দি গোষ্ঠীর বর্তমান ধর্মবিশ্বাস- সিনক্রেটিস্টিক উপাদান চিহ্নিতকরণ :

গারোদের আদি ধর্ম বা সাংসারেক ধর্মকে অধিকাংশ নৃবিজ্ঞানী সর্বপ্রাণবাদ (Animism) বলে আখ্যায়িত করেছেন। মেজর এ প্লেফেয়ার তাঁর '*The Garos*' নামক গ্রন্থে গারোদের ধর্মকে সর্বপ্রাণবাদ বলে অভিহিত করে বলেছেন, অন্যান্য সর্বপ্রাণবাদী বিশ্বাসের মত গারোরাও অসংখ্য অশরীরি শক্তিতে বিশ্বাস করে। এসব অধ্যাত্মিক সত্ত্বাগুলো কেউ কেউ জগৎ সৃষ্টি করেছে, কেউ প্রকৃতিক শক্তিগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করছে, কেউ আবার মানুষের জীবনের অন্যান্য দিক নিয়ন্ত্রণ করছে। তিনি আরও বলেন, গারোরা পুনর্জন্মেও বিশ্বাস করে এবং যে যার কর্মফল অনুযায়ী আবার জন্মগ্রহণ করবে। মৃত্যু পরবর্তী জীবনে পুরষ্কার ও শাস্তি সম্পর্কেও তাদের ধারণা আছে। অন্যান্য অনেক আদিবাসীর মতই তাদের বিশ্বাসও মূলত: মিথোলজি বা উপকথা নির্ভর। গারো মিথোলজি অনুসারে তাতারা রাবুগা দাগগিপা বা প্রধান দেবতা যিনি বিশ্ব ও মানুষ সৃষ্টি করেছেন। নন্তু-নপান্তু এবং মাচি নামক ক্ষুদ্র দু'জন দেবতা তাকে সৃষ্টিকর্মে সহায়তা করেছে। তাতারা পৃথিবী সৃষ্টি করার পর চন্দ্রের দেবী সুসিমেকে পৃথিবীতে পাঠালেন পৃথিবীকে মানুষের আবাসযোগ্য করার জন্য। এরপর তিনি প্রথম নর-নারী সৃষ্টি করেন, যাদের নাম সানি এবং মুনি। এছাড়া অন্যান্য দেবতাদের মধ্যে আছে শক্তির দেবতা সালজং, ব্রারা এবং দগ্নি– যাদেরকে তাতারা নক্ষত্রগুলো তৈরী করতে পাঠিয়েছিলেন, পিং পাং এবং নক্ষত্রের দেবতাগণ– যারা ঋতু ও বছর নিয়ন্ত্রণ করে, গোয়েরা বজ্র ও বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ করে, কালকেম– গ্রামদেবতা বা গ্রামগুলোকে রক্ষণাবেক্ষণ করে। এছাড়া অসংখ্য অশরীরি শক্তি বা মিতে আছে যারা গারো গ্রামে, পাহাড়ে, নদীতে বা গাছে বাস করে ও ঘুরে বেড়ায়। গারো মিথোলজি বিশ্লেষণ করে আধুনিককালের লেখকদের অনেকে একে সর্বপ্রাণবাদ না বলে বহুঈশ্বরবাদ বলা শ্রেয় বলে মনে করেন। রেভাঃ ক্লেমেন্ট রিছিল মনে করেন হিন্দু, গ্রীক বা রোমান মিথোলজির মত গারো মিথোলজিতেও জগত ও মানুষ সৃষ্টি ও পরজীবনের ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। তিনি মনে করেন গারো মিথোলজিকে 'আদিম ধর্মতত্ত্ব' (Primtive Theology) বলা যেতে পারে। ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে রাধানাথ ভৌমিকের খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তরের মাধ্যমে তাদের ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। আধুনিক কালের কোন কোন খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী মান্দি খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষাকেই তাদের

দ্রুত ও সহজে ধর্মান্তরিত হওয়ার কারণ বলে মনে করেন। গারোদের আদি ধর্মে বহু অসামঞ্জস্য ও অযৌক্তিক বিষয় রয়েছে। প্রথমত: তাতারা যদি প্রধান দেবতা হয়ে থাকেন, তবে তাকে নপান্ত্র ও মাচি এই উপদেবতাদের সাহায্য নিয়ে জগৎ সৃষ্টি করতে হল কেন? এই উপদেবতারাও আবার কাকড়ার সাহায্য গ্রহণ করলেন পৃথিবী গঠন করার জন্য। কাকড়া সমুদ্রের তলদেশ থেকে মাটি এনে দিলে তা দিয়ে উপদেবতাগণ পৃথিবী সৃষ্টি করলেন। প্রশ্ন হল পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বে সমুদ্র, মাটি ও কাঁকড়া এলো কোথা থেকে। এরকম বহু অসামঞ্জস্য গারো আদি ধর্ম শিক্ষার মধ্যে আছে।

অপর পক্ষে খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষা দিচ্ছে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর একজনই আছেন। তিনিই বিনা উপাদানে এই বিশ্বজগত ও মানুষ সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টির কাজ হল সর্বশক্তিমত্তার কাজ। কোন সৃষ্ট জীব তা করতে পারে না। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন ও রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন। তাঁর মধ্যে শ্বাশ্বত জীবন রয়েছে, ঐ জীবন থেকে জীবন দিয়ে তিনি মানুষকে অমর করে সৃষ্টি করেছেন। তাই, মানুষের অন্তস্তলে নিহিত আছে অনন্ত সুখ ও অনন্ত জীবনের আকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্ণ তৃপ্তি লাভের উপায়ও নির্দেশ করছে খ্রিষ্টধর্ম। তা শিক্ষা দিচ্ছে যে, মানুষ যত দিন পৃথিবীতে থাকবে তাকে তার বুদ্ধি ও স্বাধীন ইচ্ছা শক্তির সদ্ব্যবহার করতে হবে ঈশ্বরের গৌরব ও মানুষের সেবার কর্মে। মানুষের সেবার দ্বারা ঈশ্বরের প্রতি প্রেম প্রমাণ করতে হবে, তার প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম পালন করতে হবে। তাহলে মানুষের আত্মা স্বর্গে যাবে মৃত্যুর পরে, সেখানে অনন্ত সুখ ও অনন্ত জীবন ভোগ করবে। কিন্তু মানুষ যদি পৃথিবীতে থাকতে ঈশ্বরকে প্রেম ও সেবা না করে, অর্থাৎ মানুষকে প্রেম ও সেবা না করে, এই ভাবে সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরকে তুচ্ছ করে, তবে তার জন্য রয়েছে নরক, নরকে গিয়ে সে অনন্তকালের জন্য শাস্তি ভোগ করবে।

খ্রিষ্টধর্ম অনুসারে মানুষকে অনন্ত সুখ ও অনন্ত জীবন দিতে চায় বলেই ঈশ্বর নিজ পুত্র যীশুখ্রিষ্টকে এই জগতে পাঠিয়ে দিয়েছেন, যিনি ক্রুশবিদ্ধ হলেন, দুঃখ ভোগ ও মৃত্যুবরণ করলেন, তাঁর পুনরুত্থান হলো, এইরূপে পাপ ও মৃত্যুর উপর জয়লাভ করলেন, মানুষকে পাপ থেকে পরিত্রাণ করলেন, স্বর্গের পথ দেখিয়ে দিলেন। যীশু খ্রিষ্টে যে বিশ্বাস করবে সেই পরিত্রাণ লাভ করবে, স্বর্গে যাবে। অনন্ত সুখ ও অনন্ত জীবন লাভ করবে। খ্রিষ্টের এই মহৎ শিক্ষা ও তাঁর জীবন কাহিনী পবিত্র বাইবেলে লেখা হয়েছে। এই বাইবেল গারো ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল। বোধ হয় গারো ভাষার বাইবেলই প্রথম পুস্তক যা গারো ভাষায় মুদ্রিত হয়েছে। এইভাবে যে মহৎ শিক্ষা গারোরা প্রচারকদের

মুখে মুখে শুনেছে ও গারো ভাষার বাইবেলেও পাঠ করতে পেরেছে, তাতে তারা খ্রিষ্টে বিশ্বাস করেছে, দলে দলে খ্রিষ্টান হয়েছে।

খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণের পর আচ্ক মান্দিরা পূর্ব-পুরুষদের দেবতাগণকে বা মিত্তেদের ত্যাগ করেছে। তাঁদের নিকট আর পাঠাবলি ও মোরগবলি উৎসর্গ করে না। অসুখ বিসুখ হলে দেবতাগণের তুষ্টি বিধানের জন্য পূর্ব পুরুষদের মত আর ব্যতিব্যস্ত হয় না। এখন গারোরা বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের বিশ্বাস করে, প্রভু যীশুখ্রিষ্টকে ঈশ্বরের পুত্র ও মানবের ত্রাণকর্তা বলে স্বীকার করেছে। প্রতি রবিবারে গির্জা ঘরে সমবেত হয়ে খ্রিষ্টিয় উপাসনায় যোগদান করে। কেউ যদি পীড়িত হয় তার বাড়িতে একত্র হয়ে রোগীর আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা করে, বাড়ির লোকেরা ঔষধের জন্য ডাক্তারের কাছে বা কবিরাজের কাছে যায়।

খ্রিষ্টিয় উৎসব ও পার্বণ এখন পূর্বেকার সাংসারেক গারোদের উৎসব পার্বণাদির স্থান অধিকার করেছে। সবচেয়ে বড় সাংসারেক উৎসব ছিল ওয়ানগালা উৎসব। সমস্ত আশ্বিন কার্তিক মাস ব্যাপী প্রতি বৎসর দেবতাদের তুষ্টি বিধানার্থে ওয়ানগালা উৎসব পালন করা হত। তদুপলক্ষে গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে চলত পান আহার ও নাচ-গান। সাংসারেক পার্বণ উৎসব হল খ্রিষ্টের জন্মোৎসব, যাকে বলা হয় বড় দিন বা ইংরেজিতে 'ক্রিসমাস'। ঐদিনে গারোরা সকলেই গির্জা ঘরে সম্মিলিত উপাসনা করে, পূর্বরাত্রে কোন কোন গির্জায় মধ্যরাত্রির উপাসনা হয় এবং পরবর্তী সারাটা রাত্রি খোল করতালসহ ঘরে ঘরে কীর্তন হয়। অতঃপর সমস্ত গারো খ্রিষ্টানদের জন্য বাৎসরিক ধর্মীয় সম্মিলন হয়, বিপুল উৎসাহ আনন্দ ও উদ্দীপনা নিয়ে দূর দূর অঞ্চলবাসী গারোরা এই সম্মিলনীতে যোগদান করে থাকে। তাছাড়া প্রত্যেকটি অঞ্চলে আঞ্চলিক গারোরা এই সম্মিলনীতে যোগদান করে থাকে। তাছাড়া প্রত্যেকটি অঞ্চলে আঞ্চলিক ধর্মীয় সভা বৎসরে তিন চারবার পালিত হয়। তারা এখন ছেড়ে দিয়েছে হাজিয়া, দরুয়া, বেরেগান ও সিরিজিং। তারা এখন তাল লয়যুক্ত বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর বাংলা গানে ও ইংরেজি সঙ্গীতে দক্ষতা অর্জন করেছে (Ritchil, 2006 : 115)।

খ্রিষ্টধর্মের আগমন গারোদের মধ্যে দ্রুত শিক্ষা বিস্তার এনেছে, যা পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে। শিক্ষিত গারোর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচেছ। বর্তমানে লেখাপড়া জানা লোকের হার শতকরা ষাটের বেশি হবে। গারো ভাষায় চর্চা হয়ে থাকে গারো হিসেবে। ভারতের টুরা কলেজে গারো ভাষায় পাঠ্যক্রম

আছে বি এ ডিগ্রি পর্যন্ত। গারো ভাষায় রচিত পুস্তকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, গারো ভাষারও উন্নতি সাধিত হয়েছে। বাংলাদেশের ও ভারতের বেতার অনুষ্ঠানে গারো ভাষা স্থান পেয়েছে।

৬.৩। আচিক্ মান্দিদের আচার অনুষ্ঠান বিবর্তনের স্বরূপ

গারোদের জীরনে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান হলো বিবাহ ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। তাই এই দু'টি অনুষ্ঠানের ধর্মীয় ও সামাজিক এই দু'টি ভাগ আছে। ধর্মীয় ভাগগুলি অবশ্য পরিবর্তিত হয়ে খ্রিষ্টিয় অনুষ্ঠান হয়েছে, কিন্তু সামাজিক ভাগগুলির কোন বিশেষ পরিবর্তন হয় নি।

সাংসারিক বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় তাদের সনাতন পদ্ধতিতে যা খামাল পুরোহিত তিনটি মোরগ দিয়ে সম্পন্ন করেন। কিন্তু খ্রিষ্টান বিবাহ সম্পন্ন হয় খ্রিষ্টিয় অনুষ্ঠানের দ্বারা। অনুষ্ঠান সম্পাদন করেন খ্রিষ্টান পালক বা পুরোহিত, তখন প্রার্থনাদি ও ধর্মোপদেশও হয়। বিবাহ ভোজ কিন্তু সম্পূর্ণই সামাজিক আচার বিশেষ, তার লৌকিকতা পূর্বের মতই রয়ে গেছে। যেমন বিবাহ ভোজে যারা আসেন তারা নিকট আত্মীয় হলে চিরাচরিত রীতি অনুযায়ীই শুকর, চাউল ইত্যাদি নিয়ে আসেন এবং খাওয়া দাওয়ার পর বাড়ি ফিরে যায় সঙ্গে বিবাহ বাড়ি থেকে কলাপাতায় মোড়া ভাত ও মাংসকারী নিয়ে। বিবাহের বন্দোবস্তও করা হয় পূর্বেকার রীতি অনুযায়ী। রেভাঃ মি. ডি বলডুইন তাঁর গারো আইনের পরিবার বিষয়ক ২নং ধারায় লিখেছেন "নকনা তার পিতৃগোত্রের একজনকে বিবাহ করতে বাধ্য।" ৪নং ধারায় আছে "নকনার ভগিনীগণকে বলা হয় আগাতি, আগাতিরা যদি পিতৃগোত্র ছাড়া অন্য গোত্রে বিবাহ করে, তারা মাতৃসম্পত্তির কিছুই দাবি করতে পারে না। বিবাহ বিষয়ক ৩নং ধারায় আছে "গারো পুরুষ সাধারণত প্রথম সম্পর্কের মামাতো ভগিনীকে বিবাহ করে। মামাতো ভগিনী প্রথম সম্পর্কের না হলে দ্বিতীয় বা তৃতীয় ইত্যাদি যতদূর সম্ভব নিকটবর্তী সম্পর্কের হবে।" বিবাহ বিষয়ক এই রীতিগুলি এবং গোত্র-আত্মীয়তা কুটুম্বিতার রীতিগুলি সাংসারেক গারোদের মধ্যে যেমন তেমনি খ্রিষ্টান গারোদের মধ্যেও পূর্ববৎ বলবৎ রয়েছে।

খ্রিষ্টান গারোর মৃত্যু হলে অন্যান্য খ্রিষ্টানগণ মৃত ব্যক্তির বাড়িতে গিয়ে প্রার্থনা করে। অতঃপর পুরোহিত পরিচালিত অন্ত্যেষ্টি অনুষ্ঠানসহ মৃতদেহ গির্জা ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। খ্রিষ্টিয় রীতি অনুযায়ী অনুষ্ঠান সহকারেই মৃতদেহ কবর স্থানে নিয়ে গিয়ে কবরস্থ করা হয়। পূর্বে এবং এখনও সাংসারেক গারোরা মৃতদেহ জাঁকজমক সহকারে অগ্নিদাহ করে, মৃত্যুর শেষ বা ভস্ম দেলাং এর মধ্যে রক্ষা করে। ওয়ানগালা উৎসব উপস্থিত হলে আরম্ভেই গরু বলি দিয়ে নাচগান সহকারে প্রেতাত্মাকে

শুভ বিদায় দেয়। মৃত ব্যক্তির আত্মা যেন রাক্ষস দেবতা নাওয়াং এর গ্রাস থেকে রক্ষা পায়, নিরাপদে চিকমাং-এ গিয়ে পৌঁছাতে পারে, তজ্জন্যই ঐ গরুবলী ব্যবস্থা করা হত। কিন্তু খ্রিষ্টানেরা বিশ্বাস করে যে, যে লোক ঈশ্বরে বিশ্বাস করেছে, তাঁকে উপাসনা করেছে, তার আত্মা মৃত্যুর পরে সোজা স্বর্গে যায়, স্বর্গে গিয়ে অনন্ত সুখ ও অনন্ত জীবন ভোগ করে। নাওয়াং রাক্ষসের ভয় তার নেই, পুনর্জন্মের প্রয়োজনও তার নেই। ধর্মীয় অনুষ্ঠান ব্যতীত আরও যে লৌককতা অন্তেষ্টির আনুষাঙ্গিক রূপে আছে তা কি সাংসারেক কি খ্রিষ্টান সকল গারোর জন্য সমান বলবৎ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ্য যে, সাংসারেক হোক বা খ্রিষ্টান হোক মৃত ব্যক্তির বিধবাকে মৃত স্বামীর স্ত্রী গোত্রের নিকট গিয়ে কাঁদতে হবে এবং জানাতে হবে তার স্বামী ইহলোক ত্যাগ করেছে। এই আনুষ্ঠানিকতা না করলে স্বামীর গোত্রপক্ষ ঐ বিধবাকে নতুন স্বামী দেবে না। তদ্রূপ সাংসারেক হোক বা খ্রিষ্টান হোক, মৃত ব্যক্তির একজন আত্মীয়া মৃতদেহ স্নান করাবে, যে স্নান করায় তাকে মৃত ব্যক্তির স্বামী গোত্র বা স্ত্রী গোত্র কাপড়, থালা ও ঘটি দান করবে। এই রীতি এবং পূর্বকালের আরও নানাবিধ রীতি খ্রিষ্টান গারোরা আজও পালন করে থাকে (Ritchil, 1985 : 117-118)।

৬.৪। আচিক্ মান্দি পরিবার ও সমাজের বিবর্তন :

মান্দি জ্ঞাতি সম্পর্কের ক্ষেত্রে খ্রিষ্টধর্ম সামান্যই পরিবর্তন এনেছে। তবে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণের সাথে সাথে মান্দি সমাজে বহুবিবাহ সীমিত হয়ে পড়েছে। ধর্মান্তরিত খ্রিষ্টানদের মধ্যে জোরপূর্বক বিয়ে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণের সাথে সাথে বন্ধ হয়েছে। মাতৃতান্ত্রিক গারো সমাজে ছেলেরা কোন মেয়েকে জোর করে বিয়ে করতে পারতো না। মেয়েরা চাইলে জোর করে ছেলেদের বিয়ে করত। গারোদের মধ্যে বিবাহের বিভিন্ন বৈচিত্র্যময় ও আকষর্ণীয় প্রথা ছিল। ভিন্ন ভিন্ন দলের মধ্যে বিবাহ প্রথার মধ্যেও ভিন্নতা লক্ষ্য করা যেত। গারোদের বিবাহ ব্যবস্থার পরিবর্তন ধীর গতিতে ঘটেছে। তবে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণের সাথে তাদের বিবাহের ধরনের পরিবর্তন আসলেও পূর্বের সাংসারেক ধর্ম পালন করার সময়ের মানসিকতা অনেকটাই তাদের বিবাহ ও পারিবারিক জীবনে লক্ষ্য করা যায়। বিবাহের ক্ষেত্রে অনেক সময়ই কনেকে সপ্রতিভ দেখা যায় এবং বরকে সে তুলনায় অপ্রতিভ লাজুক বলে মনে হয়। মান্দি সমাজের ধারাবাহিক পরিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে পরিবারের বাসস্থানের পরিবর্তন। অল্প সংখ্যায় হলেও কোন কোন মান্দি বিবাহের পর স্ত্রীর পরিবারের সাথে বসবাসে আগ্রহী নয়। উল্লেখ্য মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় গারো সমাজে বিবাহের পর স্ত্রীর পরিবারে বাস করলেও পুরুষরা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পেত, এবং সনাতন বাঙালী সমাজের স্ত্রীর মতো গারো সমাজের পুরুষদের কঠোর নিয়ন্ত্রণ

এবং গৃহবন্দী হিসেবে থাকতে হতো না। সমাজে নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও পুরুষের মুখ্য ভূমিকা লক্ষ্য করা যেত। প্রকৃত পক্ষে সনাতন গারো সমাজের মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুরুষদের উপর পূর্বেও কোন কঠোর নিয়ন্ত্রণ বা বাধা আরোপ করতো না, যা সনাতন বাঙালী পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীদের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করাা যায়।

গারো সমাজের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য তাদের মাহারীর নিয়ন্ত্রণ এবং নৈতিক বাধ্যবাধকতার বিধান। অতীতে গারো সমাজে সরকার ব্যবস্থা, লিখিত আইন বা বিচার প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি কিছুরই অস্তিত্ব ছিলনা। কিন্তু তাদের সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকতো। তাদের অলিখিত নৈতিক আইন ও প্রথা-পদ্ধতিসমূহ লিখিত আইনের চেয়েও শক্তিশালী ছিল। মাহারীর কেউ কোন অপরাধ করলে তা পুরো মাহারীর অপরাধ বলে গণ্য হতো। একারণে প্রত্যেক মাহারীই নিজ নিজ সদস্যদের নিয়ন্ত্রণে রাখতো। অতীতে তাদের সামনে কেউ অপরাধ করলে তাদের নিজস্ব বিচার পদ্ধতি ও শাস্তির বিধান ছিল। গারোরা খুবই কর্মঠ ও সৎ হওয়ায় তাদের চুরি করার প্রবনতা কম ছিল। তারপরও কেউ চুরি করলে তাকে চুরি করা জিনিস বা তার মূল্য এবং সেই সাথে জরিমানা দিতে হতো। খুনের বিচারে সাধারণত নিয়ম ছিল 'রক্তের বদলে রক্ত, খুনের বদলা খুন'। কোন গোত্রের ব্যক্তিকে অন্য কোন গোত্রের ব্যক্তি খুন করলে নিহত ব্যক্তির গোত্র সেই খুনের প্রতিশোধ নিত। এক পুরুষে প্রতিশোধ নেওয়া সম্ভব না হলে পুরুষানুক্রমে প্রতিশোধের চেষ্টা অব্যাহত থাকতো। গারো সমাজে ব্যভিচারকে খুব খারাপ চোখে দেখা হতো এবং এর জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থাও ছিল। তবে অনেক সময় অপরাধী নির্ধারণ অসুবিধা হয়ে দাড়াতো। তখন তাদের প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী পরীক্ষা করে অপরাধী নির্ধারণ করা হতো।

চি-রিপ্পা: অপরাধী নির্ধারণের জন্য একটি বাঁশ কেটে প্যানির নীচে মাটিতে পুতে দেওয়া হতো। অভিযোগকারী ও অভিযুক্ত ব্যক্তি বা তাদের প্রতিনিধিকে ঐ বাঁশ ধরে একই সময়ে পানির মধ্যে ডুব দিতে বলা হত। ডুব দেওয়া লোকের মধ্যে যে আগে পানির উপর মাথা তুলতো তাকেই অপরাধী বলে ধরা হতো। পানির মধ্যে বসবাসকারী দেবদেবী অপরাধীকে ঠাঁই দেয়নি বলে তারা বিশ্বাস করতো।

ওয়াল-শওয়া: এ পরীক্ষা করার জন্য একটি নতুন পাত্রে তিন আঁটি জ্বালানী কাঠ মন্ত্র পড়ে আগুন জ্বালানো হতো। পাত্রের পানি ফুটলে অভিযুক্তকে অপরাধী মনে করা হতো, অন্যথায় নির্দোষ বলে গণ্য করা হতো।

আখ্রম: যে জায়গায় বাঘের আক্রমন হয় সেখানে কোন মোরগ বা ছাগল বেঁধে রাখা হতো। সকালে মোরগ বা ছাগলকে অক্ষত পাওয়া গেলে অভিযুক্ত ব্যক্তি নির্দোষ বলে ধরা হতো।

শপথ করানো: অভিযুক্ত ব্যক্তি গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সামনে এই বলে শপথ করতো– "যদি আমি অন্যায় করে থাকি তাহলে আমি যেন বাঘ বা হাতির আক্রমণে মারা যাই।" এই শপথ করার পরে অপরাধের মাত্রানুযায়ী সাতদিন, পনেরদিন কিংবা খুব বেশি হলে এক বছর সময় নির্ধারণ করা হত এবং এ সময়ের মধ্যে যদি শপথকারী বাঘ বা হাতি দ্বারা আক্রান্ত হত তাহলে তাকে অপরাধী বলে সাব্যস্ত করা হত, অন্যথায় নির্দোষ বলে ঘোষণা করা হত।

গারোরা এখন আর পুরোপুরি আগের মত নেই। শতকরা ৯৫ ভাগেরও বেশি লোক তাদের পুরানো ধর্ম (সাংসারেক) ছেড়ে দিয়ে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে। বর্তমান যুগে অনেকেই লেখাপড়া শিখছে। আশে-পাশের বাঙালিদের সঙ্গে তাদের হাটে-বাজারে, মাঠে-ঘাটে প্রতিনিয়তই যোগাযোগ হচ্ছে। ধর্মান্তর, আধুনিক শিক্ষার প্রসার ও পার্শ্ববর্তী সমাজ ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসার দরুণ গারোদের জীবন যাত্রার প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই কিছু না কিছু পরিবর্তন এসেছে। জটিল সমাজ ও সংস্কৃতির অনেক কিছু দ্বারা তারা প্রভাবিত হয়েছে। তাদের নৈতিকতার ক্ষেত্রেও জটিল সমাজের প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। এখনকার গারোদের কেউ কেউ অল্প-স্বল্প মিথ্যে কথা বলা শিখেছে। গারোদের সৎ থাকার ঐতিহ্যের মূলে কিছুটা নাড়া পড়েছে। তবে গারো সমাজ এখনও পরিপূর্ণভাবে জটিল সমাজে রূপান্তরিত হয়নি। জটিল সমাজের তুলনায় অপরাধ প্রবণতা এখনও কম এবং এখনও বেশির ভাগ গারোই নৈতিক দিক থেকে বেশ শক্তিশালী। বস্তুত ধর্ম ও সংস্কৃতির পরিবর্তন গারো সমাজের ভিত্তিমূলকে সামগ্রিকভাবে পরিবর্তিত করতে পারেনি, গারো সমাজের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো মোটামুটিভাবে আগের মতই আছে।

গারোদের অন্যায় অপরাধের বিচার এখনও তাদের সমাজের মধ্যেই সীমিত। সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সাথে সাথে আত্মীয়তার বন্ধন আগের তুলনায় কিছুটা শিথিল হয়েছে বটে, কিন্তু তবু বিচার-আচার শান্তি-শৃঙ্খলার দায়িত্ব এখনও মাহারীর হাতেই ন্যস্ত। সম্পত্তির ধরণ ও

মালিকানার ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসায় 'নক্মা'র ভূমিকা আগের তুলনায় খর্ব হয়েছে, কিন্তু এখনও 'নক্মা'কে গ্রামবাসীরা মান্য করে থাকে।

সাম্প্রতিককালে কিছু কিছু জটিল সমস্যার সমাধানের জন্য গারোরা আধুনিক আইন-আদালতের শরণাপন্ন হতে বাধ্য হয়। বিশেষ করে গারো এবং বাঙালিদের মধ্যে সম্পত্তি নিয়ে বা অন্য কোন রকম গোলযোগ দেখা দিলে যে জটিল সমস্যার উদ্ভব হয় তাতে বাংলাদেশ সরকারের আইন-আদালতের সাহায্য নেয়া ছাড়া উপায়ই থাকেনা। নিজেদের মধ্যেও সম্পত্তি নিয়ে গণ্ডগোল হলে আজকাল আদালতে যাওয়াটা বিরল নয়। শিক্ষিত গারোদের মধ্যে আদালতে যাওয়ার প্রবণতাটা বেশি দেখা যায়।

গারোরা এখনও আগের মতই চুরি করাটাকে ঘৃণা করে। তবে লোভের বশবর্তী হয়ে আগের মতই কেউ কেউ চুরি করে থাকে। অভাব-অভিযোগ এবং সমাজের জটিলতা যতই বাড়ছে, চুরির সংখ্যাও ততই বাড়ছে। ডাকাতি, রাহাজানি, লুণ্ঠন, ছিনতাই ইত্যাদি অপরাধ থেকে গারোরা এখনও বিরত। আগের মত যুদ্ধ-বিগ্রহ নেই বলে খুন বা হত্যার ঘটনা আগের তুলনায় অনেক কম। হঠাৎ করে কোন খুন হয়ে গেলে আগের মত 'খুনের বদলা খুন' এর পরিবর্তে গারোরা এখন সরকারের আইন ও বিচার ব্যবস্থার সাহায্য নিয়ে থাকে। আগের সেই ভয়াবহ জিঘাংসার মনোবৃত্তি এখন আর নেই। বস্তুত এখনকার গারোদের অনেকেই তাদের অতীত দিনের জিঘাংসা চরিতার্থ করার কঠোর সংকল্পের কথা জানেইনা। ব্যভিচার ও যৌন অপরাধের দায়ে অপরাধীকে হত্যা করার বিচার-ব্যবস্থা অনেক আগেই চলে গেছে। তবে ব্যভিচারীকে এখনও ঘৃণার চোখে দেখা হয় এবং শাস্তি হিসেবে জরিমানা দিতে বাধ্য করা হয়। নিকট সম্পর্কে আবদ্ধ বা যৌন সম্পর্ক নিষিদ্ধ এমন কোন স্ত্রী পুরুষের মিলন এখনও অবৈধ বলে গণ্য এবং এ ধরনের অপরাধে অপরাধীদেরকে এখনও সমাজ থেকে বহিষ্কার করার রীতি প্রচলিত আছে।

গারোরা এখনও সরল বিশ্বাসে বিশ্বাসী এবং এই আধুনিক যুগেও অপরাধী নিরূপণের জন্য আগের মত পরীক্ষায় বিশ্বাস করে। তবে এ ধরনের পরীক্ষার ঘটনা ক্রমশই হ্রাস পাচ্ছে। অনেক জটিল সমস্যার ক্ষেত্রে ইদানিং আধুনিক আইন ও পুলিশের সাহায্য নেয়া হয়ে থাকে। কখনো কখনো খ্রিষ্টধর্ম প্রচারকের পরামর্শও নেয়া হয়ে থাকে।

গারো সমাজের বিচার-আচার ও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে 'মাহারী' বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। গারোদের মধ্যে 'ব্যক্তি'র চেয়ে 'সমষ্টি'কে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়, 'সমষ্টি'র কাছে 'ব্যক্তি' তুচ্ছ। 'ব্যক্তি'র অপরাধ 'সমষ্টি'র অপরাধ বলে পরিগণিত। কাজেই 'সমষ্টি' ও 'সমষ্টি' চেতনাই 'ব্যক্তি'কে নিয়ন্ত্রণে রাখে। জনমতই শেষ সিদ্ধান্ত, চূড়ান্ত বিচার। অপরাধের শাস্তি হিসেবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই জরিমানা আদায় করা হয়। জরিমানার পরিমাণটা বড় কথা নয়, জরিমানা দেওয়াটা যে লজ্জার কাজ সেটাই অপরাধ থেকে গারোদেরকে দূরে রাখে। অন্য যে দিকটি উল্লেখযোগ্য তা হচ্ছে গারোদের নৈতিকতা ও মূল্যবোধ। নৈতিক দিক থেকে শক্তিশালী ছিল বলেই গারোদের মধ্যে অন্যায়-অপরাধ কম সংঘটিত হত। বিচারের ব্যবস্থা ছিল বলে গারো সমাজে 'অরাজকতা' বা নৈরাজ্যের অবস্থা ছিল না। গারোরা এখনও নৈতিক দিক থেকে শক্তিশালী বলে তাদের মধ্যে অপরাধের পরিমাণ অনেক কম এবং শান্তি-শৃঙ্খলা আছে (Khalek, 2006 : 119-126)।

৬.৫। আচিক্ মান্দিদের সমাজ ব্যবস্থায় উত্তরাধিকার প্রথার বিবর্তন :

গারো সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান অঙ্গ হচ্ছে মাতৃতন্ত্র। গারো মাতৃতন্ত্র খ্রিষ্টান, অ-খ্রিষ্টান সকল গারোর মধ্যে পূর্বের মতো আজও প্রচলিত আছে। তার কিছুমাত্র পরিবর্তন হয়নি। তাতে বোঝা যায় খ্রিষ্টধর্মের প্রভাব তার উপর কিছুমাত্রও কার্যকর হয়নি। তিনটি ভিত্তিমূলক প্রথাকে নিয়ে এই মাতৃতন্ত্র। সেই তিনটি প্রথা হচ্ছে- প্রথমত: পুত্র-কন্যাগণ হবে মাতৃগোত্রের অন্তর্ভূক্ত, তারা মাতৃগোত্রের নাম গ্রহণ করবে। দ্বিতীয়ত: মাতৃতান্ত্রিক বিবাহ প্রথা, এ প্রসঙ্গে পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে। তৃতীয়ত: মাতৃতান্ত্রিক সম্পত্তি প্রথা। এই তিনটি মাতৃতান্ত্রিক প্রথা প্রায় সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত অবস্থায় আজও গারো সংস্কৃতির উপর শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করছে।

মাতৃতন্ত্র গারো সমাজের একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রথা। খ্রিষ্টধর্মকে মাতৃতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষক বলা যায় না। এ প্রথা প্রাচীন গারো সংস্কৃতির এতই গভীরে প্রোথিত যে খ্রিষ্টধর্ম মাতৃতন্ত্রের তেমন কোনো পরিবর্তন করতে পারেনি। গারো পুত্র কন্যাগণ আজও মাতৃগোত্রের নামে পরিচিত হয়, পিতৃগোত্রের পরিচয় তারা দেয় না। আজও শিক্ষিত যুবকেরা শ্বশুর বাড়িতে যায়, স্ত্রীর বাড়ির ঘর-সংসার করে, সেই ঘর থেকে তারা বিতাড়িত হতে পারে স্ত্রী বিয়োগ ঘটলেই, তবু আপন সম্পত্তি স্বত্বকে বিসর্জন দিয়ে স্ত্রীর কর্তৃত্বকে শিরোধার্য করে নেয়। এই মাতৃতান্ত্রিক সম্পত্তি প্রথা রেভাঃ সি. ডি. বলডুইনের গারো আইনে এইরূপে লিপিবদ্ধ (Ritchil, 1985 : 117-118) হয়েছে যে:

> *"গারোদের মধ্যে প্রচলিত মাতৃতন্ত্র অনুযায়ী কোন পুরুষ কোন প্রকার সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারে না। পুরুষ সন্তান বয়োপ্রাপ্ত হউক বা না হউক, সে যাহা অর্জন করে বা অন্যের নিকট হইতে লাভ করে, সমস্তই তাহার মাতার বা ভগ্নীদের সম্পত্তি হইবে। বিবাহিত পুরুষ যাহা কিছু অর্জন করে সমস্তই তাহার পত্নীর সম্পত্তি হইবে বা পত্নী বিয়োগ ঘটিয়া থাকিলে তাহার কন্যার সম্পত্তি হইবে। মাতা বা পত্নী বা কন্যা বা ভগ্নীদের মৃত্যু ঘটিয়া থাকিলে পুরুষের অর্জিত সম্পত্তি তাহার* মাতৃগোত্রের নিকটতমা আত্মীয়ার হইবে"।

গারোদের মধ্যে প্রচলিত উত্তরাধিকার আইনকে সাংসারিক বলা সংগত নয়। তা হল উপজাতীয় আইন। খ্রিষ্টান ও সাংসারিক সকল গারো জাতির মধ্যেই তা প্রচলিত ছিল। রেভা. সি. ডি. বলডুইন গারো আইন সম্পর্কে বিস্তারিত অলোচনা করেন। গারো উত্তরাধিকার আইনকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়: (ক) সাধারণ আইন, (খ) পরিবার বিষয়ক আইন, (গ) পৌষ্য কন্যা বিষয়ক আইন, (ঘ) স্বত্বচ্যুত সম্পত্তি বিষয়ক আইন এবং (ঙ) বিবাহ বিষয়ক আইন। এই আইনগুলো এখনো অনেকটা অপরিবর্তিতভাবে গারো সমাজে প্রচলিত আছে (Ritchil, 2018 : 18-38)।

৭.১। বাংলাদেশে আচিক্ মান্দিদের বিভিন্ন বাসস্থানের ইতিহাসঃ

বাংলাদেশে মান্দিদের আগমনের সঠিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। তবে বিট্রিশ যুগে জমি সংক্রান্ত সরকারী দলিলপত্রে দেখা যায় ১৭০০ খ্রিষ্টাব্দে মান্দিদের নামে নথিপত্র রয়েছে। তবে অনেকে মনে করেন, তারা সুদীর্ঘকাল থেকে বাংলাদেশে বসবাস করছে। ঐতিহাসিকগণ মনে করেন তাদের আদি নিবাস ছিল চীনের ইয়াংসিকিয়াং ও হোয়াংহো নদীর অববাহিকায়। প্রতিকূল পরিবেশের কারণে তারা তাদের আদি নিবাস ছেড়ে প্রথমে তিব্বতে, তারপর ভুটান অতিক্রম করে ভারতের কোচবিহারে বসবাস করে। পরে সেখান থেকে ব্রক্ষ্মপুত্র নদীর তীর ঘেষে তারা বর্তমান কারূপকামাখ্যায় বসতি স্থাপন করে। পরবর্তীকালে বিভিন্ন রাজনৈতিক গোলযোগের কারণে তারা আসামের পশ্চিম দিকে বর্তমান গোয়ালপাড়ার হাবরাঘাটে বসতি স্থাপন করে। কথিত আছে, গারোদের বিভিন্ন দলের মধ্যে বিবাদের কারণে দূর্বল গোষ্ঠী দক্ষিণে সরে এসে সমতল ভূমিতে বর্তমান বাংলাদেশে বসবাস শুরু করে। তারাই বর্তমান বাংলাদেশের মান্দি জনগোষ্ঠী। অন্যদিকে কোন কোন নৃবিজ্ঞানী ধারাণা করেন যে, গারো পাহাড়ে গারোদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং বর্ধিত জনসংখ্যার তুলনায় জুম চাষের উপযোগী জমির অপ্রতুলতার কারণে গারো পাহাড় ছেড়ে কিছু সংখ্যক গারো বর্তমান বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার উত্তরাঞ্চলে পাহাড়ের পাদদেশে সমতল ভূমিতে এবং আরো দক্ষিণে টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর গড়ে বসতি স্থাপন করে। খুব কম হলেও একশ বছর আগে তারা এসব এলাকায় এসেছে (Nakne, 1967; Khaleque, 1982)।

বর্তমান বিশ্বে গারোদের জনসংখ্যা কত তার কোন সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। ভারতের ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দে আদম শুমারিতে মেঘালয়ে এক লাখ নব্বই হাজার, আসামে পঞ্চাশ হাজার এবং পূর্ব পাকিস্তানে চল্লিশ হাজার জন গারো জনসংখ্যা দেখানো হয়েছিল। বাংলাদেশে ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দের আদম শুমারি অনুসারে এক লাখ ষোল হাজার, পরবর্তীতে ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের আদম শুমারিতে এক লাখ দুই হাজার জন গারো জনসংখ্যা দেখানো হয়েছিল। থিওফিল নকরেকের মতে বর্তমানে বাংলাদেশে গারোদের জনসংখ্যা দুই লাখেরও বেশী (Theophil, 2015 : 22)। মধুপুরে গারোদের জনসংখ্যা প্রায় বিশ হাজার। একমাত্র মধুপুরে গারোরা একই এলাকায় বসবাস করে। অন্যান্য জায়গায় বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন গ্রামে বসবাস করে। বর্তমানে প্রায় পঁচিশ হাজার গারো ঢাকায় বসবাস করছে।

ভারতের মেঘালয় রাজ্য, আসামের কামরূপ, গোয়ালপাড়া, দরং, নওগাঁ, পশ্চিম বঙ্গের কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি প্রভৃতি জেলা, পার্বত্য ত্রিপুরা রাজ্যের বেশ কিছু এলাকায় এবং বাংলাদেশের ময়মনসিংহ, জামালপুর, শেরপুর, নেত্রকোণা জেলার আন্তর্জাতিক সিমানা বরাবর টাঙ্গাইল জেলার কিছু এলাকায়, সাবেক সিলেট জেলার কতিপয় অংশে গারোদের বসবাস। তবে ভারতের মেঘালয় রাজ্যকেই গারোদের মূল বাসভূমি হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। কারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ গারো এখানেই বসবাস করে থাকে। মেঘালয়ে বর্তমানে আনুমানিক সাড়ে পাঁচ লাখের মত গারো বসবাস করে এবং পশ্চিম বঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা প্রভৃতি রাজ্যে দেড় লাখের মতো গারোর বসবাস করে এবং পশ্চিম বঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা প্রভৃতি রাজ্যে দেড় লাখের মতো গারোর বসবাস সেই সঙ্গে বাংলাদেশে সোয়া লাখ গারোসহ সব মিলিয়ে সমগ্র পৃথিবীতে বর্তমান গারো জনসংখ্যা আনুমানিক সোয়া আট লাখ (Jangcham, 2010 : 14-23) ।

৭.২। ঢাকার নর্দা-কালাচাঁদপুর এলাকার মান্দি গোষ্ঠীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় :

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় বহুদিন ধরে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর লোকজন বসবাস করে আসছে। তার মধ্যে গারো জনগোষ্ঠী অন্যতম। কেউবা কাজের সূত্রে, কেউবা পড়াশোনার তাগিদে ছুটে এসেছে ঢাকায়। ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলেও গারো জনগোষ্ঠীদের বসবাস সবচেয়ে বেশি ঢাকা কালাচাঁদপুরে। আবার নর্দা ও কালাচাঁদপুরের যে সকল পাড়ায় এই সকল জনগোষ্ঠীরা বাস করে সেই পাড়াগুলো হল: পশ্চিম-পাড়া পাকা মসজিদ, আকন-পাড়া, উত্তর-পাড়া, গিরিংগি-রোড, মিন্টু-রোড, মোরল-বাজার খান-বাড়ি, কবর-স্থান, সাথে গুলশান ২ এর বউ-বাজার ইত্যাদি এই জনগোষ্ঠীর বসবাস। এসকল পাড়ার সকল গারো জনগোষ্ঠী খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী হলেও একেকজন একেকটি চার্চের অধীনে থেকে যে যার ধর্ম স্বাধীন ও শান্তিপূর্ণভাবে পালন করে আসছে। সেই চার্চ গুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় চার্চ হলো ডিভাইন মারসি ক্যাথলিক চার্চ (সাইয়েদ নগর, নতুনবাজার, বাড্ডা)। এই চার্চের অধীনে অন্তর্ভূক্ত প্রায় ৮-৯ হাজার জনসংখ্যা। প্রতি রবিবার সকলে একত্রিত হয়ে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করে। গির্জা প্রার্থনা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো পরিচালনা করে সেই চার্চের কতিপয় অবলেট ফাদার, ব্রাদার ও মিশন কমিটির লোকজনদের মাধ্যমে।

ক্যাথলিক চার্চ ছাড়া এ এলাকায় রয়েছে সিনয় ব্যাপ্টিস্ট মণ্ডলী। এই মণ্ডলী কালাচাঁদপুর, নর্দা সরকার বাড়ি পাড়ায় অবস্থিত। এই মণ্ডলীতে প্রায় ৪৫-৫০ টি পরিবার অন্তর্ভূক্ত। এই পরিবার

গুলো থেকে মণ্ডলী পরিচালনার জন্য কমিটি গঠন করে বিভিন্ন পদ দেওয়া হয়। তারা সকলে সমাজের আচার-অনুষ্ঠানের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। তারা প্রতি শুক্রবার স্কুল গঠনের মাধ্যমে ধর্মীয় শিক্ষা, প্রার্থনা সভা করে থাকেন। আর প্রার্থনা সভার মূল দায়িত্ব থাকে পাস্টরের ওপর। এরকম ভাবে আরো কয়েকটি চার্চ আছে কালাচাঁদপুর ও তার কাছাকাছি এলাকায়, যেখানে এভাবে কমিটি গঠনের মাধ্যমে আচার অনুষ্ঠান পালন ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো পরিচালনা করে কমিটির লোকজন এবং প্রার্থনা সভার মূল অনুষ্ঠান পাস্টরগণ পরিচালনা করে থাকেন। সেই চার্চ গুলো হলো নঙরিমা গারো খ্রিষ্টিয়ান চার্চ (৬১/১ সি, কালাচাদপুর, গুলশান, ঢাকা)। ২০০ জনেরও অধিক গারো জনগোষ্ঠী এই চার্চে অন্তর্ভূক্ত।

তারপর আছে কালাচাঁদপুর, সরকার বাড়ি পাড়ায় অবস্থিত চার্চ অব বাংলাদেশ। এই চার্চটির অধীনেও রয়েছে ৩০-৪০টি পরিবার। তারা প্রতি সপ্তাহে কাউন্সিলের মাধ্যমে তাদের সামাজিক কার্যক্রম গুলো করে থাকেন।

এছাড়াও রয়েছে কালাচাঁদপুর, মিন্টু সড়ক সংলগ্ন এ্যাডভেন্টিস চার্চ। এখানেও ৩৫ থেকে ৪০ টি পরিবার অন্তর্ভূক্ত। তারা রবিবারের বদলে প্রতি শনিবারে তাদের ধর্মীয় কাজ গুলো করে থাকেন। তবে এই চার্চ গুলোর একটি বিশেষত্ব হলো, সবাই সবার চার্চে যেতে পারে, অংশগ্রহণ করতে পারে। কালাচাঁদপুরের গারো জনগোষ্ঠীরা ধর্মের সাথে সাথে কর্মও সমান তালে করে যাচ্ছে। ছেলে মেয়ে (মহিলা বেশি) উভয়ই বিউটি পার্লারে কাজ করে জীবীকা নির্বাহ করছে। অনেকে আবার বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, এনজিওতে কাজ করে পরিবারের জন্য রোজগার করছে। যারা পড়াশোনা করছে পড়াশোনার পাশাপাশি টিউশনির কাজ করছে। তাছাড়া মান্দিদের অনেকে বাংলাদেশে বসবাসরত বিভিন্ন বিদেশিদের বাসায় এ কাজ করছে, কেউ সুপার-ভাইজার পোস্টে, কেউ সিকিউটিটি গার্ড হিসেবে আবার অনেক মহিলাগণ আছেন যারা তাদের বাসায় গৃহস্থালির কাজও করছে। অনেকে আবার বিভিন্ন এ্যাম্বাসি, ক্রেডিট কার্ড বুথ গুলোতে চাকুরি করছে। তারা কেউ বসে নেই, মূল জনগোষ্ঠীর সাথে তাল মিলিয়ে সমাজে টিকে থাকতে অনবরত সংগ্রাম করেই যাচ্ছে।

শত ব্যস্ততার মাঝেও তারা সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে, বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান গুলোও পালন করছে। প্রতি বছর ওয়ানগালায় ঢাকায় অবস্থানরত সকল গারো জনগোষ্ঠী একত্রিত হয়ে উৎসবটি পালন করে। তাছাড়াও বড়দিন, স্টার সানডে এক সাথে উদযাপন করে থাকে। এককথায়

বলা যায়, সুখে ও দু:খে সকলে একে অপরের সাথে পারস্পরিক বন্ধনে একত্রিত হয়ে সমাজে বসবাস করে চলছে।

৭.৩। ময়মনসিংহের টংনাপাড়া গ্রামের আচিক্ মান্দি গোষ্ঠীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় :

প্রাকৃতিক মনোরম সৌন্দর্যে ঘেরা টংনাপাড়া গ্রামটি ধোবাউরা (আয়তন ২৫১.৮৮ বর্গ কিলোমিটার ও জনসংখ্যা প্রায় ৪,২৭,৯১৩ জন) থানার অন্তর্ভূক্ত। চিনামাটির দেশ নামে প্রসিদ্ধ ধোবাউরা থানাটি ময়মনসিংহ শহরের উত্তরে ৭০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। ধোবাউরা থানার বিভিন্ন গ্রামে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বসবাস, যেমন, বাঙালী, গারো, কোচ, হাজং, বানাই, বংশী ইত্যাদি। এই সকল জনগোষ্ঠীর মধ্যে গারো জনগোষ্ঠীর বাস টংনাপাড়া গ্রামে। এই গ্রামটির আয়তন প্রায় ০.৪৫ বর্গ কিলোমিটার। আবার প্রায় ১.৩৩ বর্গ কিলোমিটার বিশিষ্ট কাশিপুর গ্রামের ছোট্ট একটি গারো পল্লী হল টংনাপাড়া। গ্রামটি ধোবাউড়া থানার ১ নং দক্ষিণ মাইজপাড়া ইউনিয়নে (আয়তন ৩৮,৯৮২ বর্গ কিলোমিটার ও জনসংখ্যা প্রায় ৭০,০০০ জন) অবস্থিত। টংনাপাড়া গ্রামের মোট জনসংখ্যা ২০০-২৫০ জন এবং পরিবারের সংখ্যা ৩৫টি। তারা সবাই খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী। এখানে পৃথক দুটি চার্চ রয়েছে এবং তারা সবাই যে যার ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করে। এই দুটি চার্চের মধ্যে একটি হলো, ব্যাপ্টিস্ট চার্চ অপরটি ক্যাথলিক চার্চ।

ব্যাপ্টিস্ট চার্চের সাথে যুক্ত রয়েছে ১৮টি পরিবার। এটি পরিচালিত হয় গ্রামের নির্বাচিত কমিটির মাধ্যমে। প্রতি রবিবার তারা আলোচনা সভায় বসে সেই সাথে প্রার্থনা করে পরমেশ্বরের কাছে। আর গ্রামের পাস্টর এই প্রার্থনা সভাটি পরিচালনা করে থাকেন। ক্যাথলিক চার্চে যুক্ত রয়েছে ১৭টির মতো পরিবার, এই চার্চটির মূল চার্চ হলো ভালুকা পাড়া মিশনের চার্চ। ঐ চার্চ থেকে প্রতি মাসে একবার, এবং বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে ফাদার, সিস্টারগণ আসেন টংনাপাড়া গীর্জাতে। এছাড়াও প্রতি রবিবার গ্রাম কাউন্সিলের মাধ্যমে প্রার্থনা ও বিভিন্ন বিষয়াদি গুলো আলোচনা করে থাকেন। তাছাড়া দুই-একজন আছে যারা সেভেন ডে এ্যাডভন্টিস্ট, কিন্তু তাদের কোন চার্চ গ্রামে নেই। টংনাপাড়া গ্রামে দু'টি চার্চ হলেও মূলত তারা এক সাথে ধর্মীয় উৎসব যেমন- বড়দিন, ওয়ানগালা, ইস্টারসানডে, বড়সভায় সবাই মিলেমিশে পালন করে থাকে। এখানে শিক্ষার হার প্রায় ৭০% এবং তা দিন দিন বাড়ছে ।

এখানকার বেশিরভাগ মানুষ কৃষি কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। কৃষি ছাড়াও কেউ কেউ, সরকারি বেসরকারি এনজিও তে কাজ করে। এছাড়া বেশিরভাগ সামর্থবান পুরুষ ইটের ভাটায় কাজ করে, কেউবা ছোট খাটো ব্যবসা করে জীবন নির্বাহ করে। ১৬ বছরের নীচে প্রায় সব ছেলে-মেয়ে স্কুলে যায়। এই গ্রামে আরো একটা বিষয় লক্ষ্য করলে দেখা যায়, সব পরিবারেরই কেউ না কেউ পরিবার চালানোর উদ্দেশ্যে জীবিকার জন্য ছুটে এসেছে ঢাকায়, কেউবা এসেছে পড়াশোনা করার জন্য। তারা ঢাকাতে বিভিন্ন পেশায় যুক্ত। গ্রামের ৫০% মানুষ বিভিন্ন কাজ আরো পড়াশোনা তাগিদে গ্রামের বাইরে থাকে। গ্রাম ছেড়ে দূর দুরান্তে গিয়ে যারা পড়াশোনা বা চাকুরী করে তারা সবাই বছরে দুইতিন বার একত্রিত হয় বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান যেমন, বিয়ে, শ্রাদ্ধ, বড়দিন ইত্যাদি অনুষ্ঠানে। তখন তারা একে অপরের সাথে আনন্দ ভাগাভাগি করে নেয়।

তারা শুধু নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, মূল ধারার জনগোষ্ঠী বা অন্যান্য সম্প্রদায়দের সাথেও জোটবদ্ধভাবে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলাফেরা করে আসছে যুগ যুগ ধরে।

৭.৪। ব্যাপ্টিস্ট ও রোমান ক্যাথলিক মূল ধর্মের থেকে আধুনিক কালের মান্দিদের ধর্মের দ্বিবিধ ভিন্নতা :

বর্তমানে আচিক্ মান্দি জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই ক্যাথলিক ধর্মের অনুসারী। আচিক্ মান্দি জনগোষ্ঠীর বর্তমান ধর্মবিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান পর্যালোচনা করে ব্যাপ্টিজম ও রোমান ক্যাথলিক মূল ধর্ম থেকে যে পার্থক্যগুলো লক্ষ্য করা যায় সেগুলোকে নিম্নোক্ত দুইভাবে আলোচনা করা যায়:

৭.৪.১। গারোদের খ্রিষ্ট ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের উপর তাদের সাংসারিক ধর্ম ও আদিবাসী কৃষ্টির প্রভাব :

আধুনিক খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী শিক্ষিত মান্দিদের মধ্যে কেউ কেউ সংস্কারপন্থী। তারা মনে করেন, গারোদের আদিধর্ম সাংসারেক ধর্ম ও তাদের ঐতিহ্যবাহী আচার অনুষ্ঠান এখন পরিত্যাগ করা উচিত। তারা তাদের মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থারও পরিবর্তন করা প্রয়োজন মনে করেন। অন্যদিকে অনেক মান্দিই ভিন্নমত পোষন করেন। তারা মনে করেন খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণের সাথে সাথে গারোদের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি বিসর্জন দেওয়া আবশ্যিক ছিল না (Drang, 2001 : 25)। সাম্প্রতিক কালে খ্রিষ্ট ধর্মীয় মিশনারীদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন খ্রিষ্টধর্ম পালন করেও গারোরা তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ধরে রাখতে পারে। এই মিশনারাই তাদের আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসব পালনের জন্য এখন সহায়তা করছেন। এরকম প্রগতিশীল ও উদারমনা খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীদের একজন ড: জেমস তেজস শঙ্কর দাশ। তিনি বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষে খ্রিষ্টধর্ম প্রচার সম্পর্কে তার মতামত তার পুস্তকে আলোচনা করতে

গিয়ে বলেছেন, এদেশে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের শুরু থেকেই পাশ্চাত্যের অনুকরণে খ্রিষ্টধর্ম প্রচার করা হচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে খ্রিষ্টধর্মের মৌলিক শিক্ষা অক্ষুন্ন রেখেও এদেশের ভাষা, সংস্কৃতি, মূল্যবোধের সাথে খাপ খাইয়ে ধর্ম অনুসরণ সম্ভব। আলোচনা প্রসঙ্গে তার (Das, 2016 : 359-362) বক্তব্যের কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হল:

> *"খ্রিষ্টধর্মতত্ত্ব, যা আজ বাংলাদেশের মণ্ডলীতে প্রচলিত ও ব্যবহার করা হচ্ছে – তার প্রায় সবটাই পাশ্চাত্যের ধ্যান-ধারণাপ্রসূত ও এই উপজীব্য সেদেশের মাটি, বাতাস, মানুষ আর সমাজের প্রয়োজন। তাতে অসুবিধা নেই, কিন্তু দরকার খ্রিষ্টদর্শনকে আমাদের দেশীয় উপযোগী করে তোলা, যাতে এদেশের মানুষ তার মধ্যে নিরাপদে আশ্রয় পায়।"*
>
> *"কাথলিক আর প্রটেস্ট্যান্ট মণ্ডলীর প্রচার পদ্ধতির এমন নিজস্ব নিয়ম আছে, আর তা থাকতেই পারে, আর এর কোনটা ঠিক আর কোনটা ঠিক না, তা হয়ত আলোচনা সাপেক্ষ, কিন্তু এদের দুটো ধারা যে সম্পূর্ণ আলাদা, তা বোধ হয় বলা যায়। প্রশ্ন হলো, কোনো মানুষ তার লালিত ও আচরিত বহুদিনের যে সামাজিক রীতি-নীতি তা কি মাত্র একটা নতুন ধর্ম গ্রহণের কারণে হঠাৎ করে বদলাতে পারে, না-কি বদলানো উচিত?"*

প্রকৃতপক্ষে গারো আঞ্চলে ক্যাথলিক ধর্মমত প্রচারের শুরু থেকেই ধর্মপ্রচারকদের উদার মনোভারের কারণে আজকের বাংলাদেশের গারো ক্যাথলিক ধর্মালবম্বীদের ধর্মবিশ্বাস ও আচার-আনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে বেশ কিছু ভিন্ন বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় যা বিশ্বে অন্যান্য আঞ্চলের ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাসী সমাজের থেকে তাদের স্বকীরতা দান করেছে। আজকের বাংলাদেশী গারোদের খ্রিষ্ট ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের উপর তাদের সাংসারেক ধর্ম ও আদিবাসী কৃষ্টির যে প্রভাব দেখা যায় তার মধ্যে সর্বপ্রথম তাদের জ্ঞাতি সম্পর্কের কথা উল্লেখ করতে হয়। গারোদের খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তরের হার বৃদ্ধির সাথে সাথে তাদের সংস্কৃতির অনেকগুলো বিষয়ই পরিবর্তন হলেও মাতৃতন্ত্র এখনও তাদের সংস্কৃতিতে জোড়ালো প্রভাব বিস্তার করে আছে। মাতৃতান্ত্রিক প্রথার কারণে তাদের সমাজের নারীরা বিশ্বের অনেক সমাজের নারীদের থেকে বেশী স্বাধীনতা পেয়েছে। শুধু তাই নয় তাদের সমাজে নারী-পুরুষের যে সমতা দেখা যায় তা আধুনিক পশ্চিমা সমাজেও দেখা যায় না।

গারোরা এখন ধর্মপ্রাণ খ্রিষ্টান বলা চলে। তাদের এখন নিজস্ব বিশপ, ধর্মযাজক, ব্রতধারিনী সবই রয়েছে। কিন্তু ক্যাথলিক ধর্মের মৌলিক শিক্ষা অনুসরণের পাশাপাশি তাদের মিদ্দি বা মিতে

সম্পর্কিত বিশ্বাস আছে। সাধারণত: গ্রামাঞ্চলেই মিদ্দির জন্য আ'মোয়া বা পূজার আয়োজন করা হয়। গত শতাব্দীতেও গারো সমাজে কেউ অসুস্থ হলে কোন মিতে বা অতিপ্রাকৃত শক্তিই তার কারণ হিসেবে ধরে নেওয়া হতো। সুতরাং তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী রোগমুক্তির জন্য দেবতা বা মিতের উদ্দেশ্যে আ'মোয়ার আয়োজন করা হতো। মান্দিদের অনেকে এখন স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে কাজ করছে এবং বর্তমানে তারা রোগমুক্তির জন্য হাসপাতালে যায়। তবে তাদের ঐতিহ্যবাহী ধারণা ও রোগমুক্তির জন্য আচার-অনুষ্ঠান এখনও দেখা যায়। তবে গত শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্তও দেখা গেছে তাদের সমাজে কেউ অসুস্থ হলে তার কারণে সবসময়ই কোন না কোন মিদ্দি বা মিতেকে দায়ী করা হতো। মিতের ধরণ অনুযায়ী খামাল আ-মোয়ার আয়োজন করতো। যদি এসব আচার অনুষ্ঠানে অসুখ ভালো না হতো তাহলে ধরা হতো ঠিকমত রোগ নির্ণয় হয়নি। তখন আবার নতুন করে যথাযথ রোগ নির্ণয়ের মাধ্যমে আ-মোয়ার আয়োজন করা হতো। বর্তমানেও যখন আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার মাধ্যমে রোগ নিরাময় হয় না বা রোগীর আরো অবনতি হতে থাকে তখন ধরে নেওয়া হয় কোন মিদ্দির কু-নজরে পড়েছে। এই আ-মোয়ার ফলে অনেক সময়ই রোগী সুস্থ হয়ে ওঠে। একারণে খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী গারোরাও তাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে আ-মোয়ার আয়োজন করে থাকে। গারোদের ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে মদ্যপান অবশ্যক। ব্যাপ্টিস্ট ধর্মবিশ্বাসীরা মদ্যপান ত্যাগ করতে বাধ্য হলেও ক্যথলিক গারোরা আগের মতই চুঁ বা পঁচুই মদ পান করতে পারে। কোন কোন সময় ব্যাপ্টিস্ট ও ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাসের প্রধান পার্থক্য মদ্যপান সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা বলে ধরে নেওয়া হয়। উপরোক্ত কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ছাড়াও আরো কিছু বৈশিষ্ট্য তাদের মধ্যে এখনও বিদ্যমান যা তাদের ঐতিহ্যবাহী ধর্মবিশ্বাস ও সমাজ ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত।

৭.৪.২। গারোদের খ্রিষ্ট ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের উপর বাংলাদেশের নাগরিক সভ্যতা তথা রাজধানী ঢাকার সামাজিক জীবনের প্রভাব:

বর্তমানে ঢাকা বা বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরে মোট কতজন মান্দি বসবাস করছে, তার সঠিক হিসাব করা কঠিন। তবে একথা বলা যায় রাজধানী ঢাকা বা অন্যান্য বড় শহরে তাদের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। মান্দিদের অনেকেই স্থায়ীভাবে ঢাকায় বসবাস করেনা। তবে কর্মসূত্রে বা পাড়াশোনার জন্য তাদের অধিকাংশ সময় এখানেই থাকতে হয়। ফলে নাগরিক সভ্যতা তথা বৃহত্তর রাজধানী ঢাকার সামাজিক জীবন তাদের ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মীয় আচার-আচরনে প্রত্যক্ষ ও পারোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করছে। বাংলাদেশের খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীদের জীবনযাত্রায় প্রভাব বিস্তারকারী একটি বিষয়

হল বিভিন্ন বিদেশী সংস্থা বা এন.জি.ও। স্বাধীনতার পর থেকে বিভিন্ন এন.জি.ও. বাংলাদেশে তাদের কর্মকান্ড বিস্তার করা শুরু করে। মান্দিদের একসময় শিক্ষালাভ করার অন্যতম মূল লক্ষ্য থাকতো চার্চের পালক বা পুরোহিত হিসেবে কাজ করা। কিন্তু চার্চের থেকে এন.জি.ও-তে চাকুরীর সুযোগ-সুবিধা ও বেতন-ভাতা বেশি। অনেক শিক্ষিত বাংলাদেশীর মতো মান্দিরাও এন.জি.ও-তে চাকুরীতে বেশি আগ্রহী। যদিও বিভিন্ন এন.জি.ও -এর উচ্চপদে এখনও মান্দিদের সংখ্যা খুব বেশি নয়। ঢাকা শহরে এখন যে মান্দিরা বসবাস করছে তারা সাধারণত বিভিন্ন কলকারখানা, অফিস বা বাসায় পাহাড়াদার হিসেবে অথবা বাংলাদেশে অস্থানরত বিদেশীদের বাসায় গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করে। অল্পকিছু গারো চাইনিজ রেস্তোরায় কাজ করে। কৃষিজীবি মান্দিরা ব্যবসা বানিজ্যে কখনই অভ্যস্ত ছিলনা। কিন্তু বর্তমানে বেশ কিছু মান্দি ঢাকা শহরে বিক্রেতা হিসেবে বিভিন্ন দোকানে কাজ করছে। বার্লিং প্রায় বিশ বছর পূর্বে দেখেছিলেন মান্দিদের মধ্যে কেউ ব্যবসা-বাণিজ্য করে না বা দোকান-পাটেও কাজ করে না (Burling, 1997 : 237)। বর্তমানে মান্দি নারীদের প্রধান পেশা সম্ভবত: বিউটি পার্লারের কাজ। নার্সিং পেশায় মান্দি নারীরা অন্যান্য পেশায় আসার আগেই এসেছিল। এখন অনেকে গার্মেন্টস্ ফ্যাক্টরীতে কাজ করে। শহরবাসী মান্দিদের কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ, সহকর্মী ও বাঙ্গালী বন্ধুদের সান্নিধ্য এবং সর্বোপরি নাগরিক সভ্যতার সাথে খাপ খাওয়াতে গিয়ে তাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে বেশ কিছুটা পরিবর্তন এসেছে।

রাজধানী ঢাকার নাগরিক সভ্যতা আচিক্ মান্দি গোষ্ঠীর সামাজিক জীবনে যে প্রভাব বিস্তার করে তা উপলব্ধির প্রয়াসে ঢাকার নর্দা এলাকার ১০ জন বাসিন্দার সাথে সরাসরি কথোপকথনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কথোপকথোনে অংশগ্রহণকারী এমনই এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাতকারের অভিজ্ঞতা এখানে পর্যালোচনা করা হলো।

অংশগ্রহণকারীর পরিচয়: কথোপকথোনে অংশগ্রহণকারী[১] কয়েক পুরুষ পূর্ব থেকেই ব্যাপ্টিস্ট ধর্ম পালন করে আসছে। তারা দুই ভাই দুই বোন। তার একজন ভাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিল এবং বর্তমানে চাকুরীজীবী। ছোটবোন ক্যাথলিক স্কুলের ছাত্রী এবং নিজ পছন্দে ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করেছে। অংশগ্রহণকারী নিজে ঢাকার অভিজাত গুলশান এলাকার একটি বিউটি পার্লারে কাজ করে। তার সাথে সাক্ষাতকারের কিছু অংশ নিম্নে উল্লেখ করা হল:

[১] গোপনীয়তা রক্ষার স্বার্থে কথোপকথোনে অংশগ্রহণকারীর নাম এখানে প্রকাশ করা হয়নি।

গবেষক: আপনাদের এলাকায় মোট কয়টি চার্চ রয়েছে? ক্যাথলিক না ব্যাপ্টিস্ট চার্চ?

অংশগ্রহণকারী: আমাদের এলাকায় মোট তিনটি চার্চ আছে–

১. সিনই চার্চ– নর্দা (ব্যাপ্টিস্ট চার্চ)
২. নানরুমা চার্চ– নর্দা (ব্যাপ্টিস্ট চার্চ)
৩. নয়ানগর নতুনবাজারে একটি ক্যাথলিক চার্চ আছে। এটি অপেক্ষাকৃত বড়।

গবেষক: আপনাদের এলাকায় আচিক্ মান্দি পরিবার কয়টি?

অংশগ্রহণকারী: আমাদের এলাকায় (নর্দা, কালাচাঁদপুর, জগন্নাথপুর) আচিক্ মান্দি পরিবার প্রায় দুইশত (২০০) এর উপরে।

গবেষক: আপনাদের এলাকার পরিবারগুলোর জনসংখ্যা কতজন?

অংশগ্রহণকারী: বেশিভাগ পরিবারের জনসংখ্যা ৪/৫ জন। বাবা-মা সন্তানসহ কিছু পরিবার আছে। ভাইবোনরা একসাথে কিছু পরিবার আছে।

গবেষক: সাধারণত আপনাদের এলাকায় পরিবারগুলোর উপার্জনক্ষম ব্যক্তি কতজন?

অংশগ্রহণকারী: সাধারণতঃ ২/৩ জন। নারী-পুরুষ সকলেই কাজ করে।

গবেষক: চার্চ সম্পর্কে আপনি আরো কি তথ্য দিতে পারেন?

অংশগ্রহণকারী: প্রতি রবিবার আমরা চার্চে যাই। অনেকে শুক্রবারও যায়। এছাড়া চার্চে কোন বিশেষ অনুষ্ঠান থাকলে যাই। যেমন ১লা এপ্রিল ইস্টার সানডেতে যাব। ব্যাপ্টিস্ট চার্চে মান্দি খ্রিষ্টানদের সংখ্যা বেশি। প্রায় সকলেই মান্দি। ক্যাথলিক চার্চে বাঙালী খ্রিষ্টানদের সংখ্যা বেশি। এপিসকোপাল চার্চ সম্পর্কে আমার ধারণা নেই।

গবেষক: আচিক্ মান্দিদের পূর্ববর্তী ধর্ম (সাংসারেক) সম্পর্কে আপনার ধারণা আছে কী?

অংশগ্রহণকারী: আচিক্ মান্দিদের পূর্ববর্তী ধর্ম সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নেই। আমরা কয়েক পুরুষ পূর্বে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেছি। আমি জন্ম থেকে খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী। মিতে বা মাইতে সম্পর্কে আমি কিছু জানি না। কোন মাইতের নাম বলতে পারবো না। (সুমাইম বা গোয়েরা এরকম কোন নাম তিনি কখনই শোনেননি)। আচিক্ মান্দি উৎসব সম্পর্কে জানি। ওয়ানগালা উৎসব ছোটবেলা থেকে আমাদের

গ্রামে পালন করেছি। ওয়ানগালা নভেম্বর মাসে পালন করা হয়। ঢাকায়ও এখন ওয়ানগালা একইভাবে পালন করা হয়।

গবেষক: গ্রামের সাথে আপনার যোগাযোগ আছে কী?

অংশগ্রহণকারী: ওয়ানগালা উৎসবের সময় গ্রামে যাওয়া হয়। ছোটবেলায় মিশনে যাওয়া হতো, নাচ-গান হতো। সেরানজিন নাচ (মিথলজি ভিত্তিক নাচ) হতো।

গবেষক: আপনাদের বিবাহব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু বলুন।

অংশগ্রহণকারী: আমাদের সমাজে চার্চের ফাদার বিবাহ পরান।

গবেষক: আপনাদের মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কোন বিষয়গুলো প্রভাব বিস্তার করছে?

অংশগ্রহণকারী: একক পরিবারের প্রভাব পড়ছে। শহরাঞ্চলে নকমা-নক্রমের উপর নির্ভর করে আমাদের সাংস্কৃতির পরিবর্তন। আমাদের সংস্কৃতির পরিবর্তনে বৈবাহিক ব্যবস্থার প্রভাব পড়ছে।

গবেষক: আপনাদের খ্যাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে কিছু বলুন?

অংশগ্রহণকারী: আমাদের খাবার ভাত, মাংস, মাছ। মাংসের মধ্যে আছে শুকর, গরু, মুরগী। আমরা ছোটমাছের চচ্চরি খাই। রান্নার প্রক্রিয়ার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বাঁশের মধ্যে রান্না। কাঁচাবাশের টুকরা কলাপাতায় মুড়িয়ে হালকা জ্বালে লাকরির চুলায় রান্না করা হয়। ছোটমাছ, মাংস সবই এভাবে রান্না করা যায়।

সাক্ষাতকারীর মতো তাদের এলাকার অন্যান্য কর্মজীবি নারীদের সাক্ষাৎকার থেকে বোঝা যায় যে শহরে গ্রামাঞ্চলের মতো ব্যাপক পরিসরে বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন করা হয় না কারণ শহরে তাদের সুযোগ-সুবিধার অভাব, কাজ বা পড়াশুনার কারণে অবসর সময়ের অভাব প্রভৃতি। তারা সকলেই খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী হওয়ায় তাদের মূল অনুষ্ঠান বড়দিন। তবে শহরাঞ্চলের মান্দিরা একটি পরিবর্তনশীল অবস্থার মধ্য দিয়ে চললেও একটি বিষয় লক্ষ্যনীয়। তা হল তাদের স্বজাত্যবোধ। মান্দিরা সবসময়ই চেষ্টা করে একত্রে বাস করতে এবং একজন মান্দি যেকোন পরিস্থিতিতে অন্য একজন মান্দিকে সহায়তা করতে প্রস্তুত। একজন মান্দির কাছে অন্য একজন মান্দির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিচয় হল তারা একই সম্প্রদায়ের সদস্য।

৮.১। সংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্য উপাত্তের বিশ্লেষণ :

আচিক্ মান্দি গোষ্ঠীর বর্তমান ধর্মবিশ্বাসের যৌগিক রূপটি চিহ্নিতকরণ এবং আচার-অনুষ্ঠানের বিবর্তনের স্বরূপ নির্ধারণের প্রয়োজনে যে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে তার ভিত্তিতে আচিক্ মান্দি নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর ধর্মবিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানসহ পরিবার, সমাজ ও উত্তরাধিকার প্রথার বিবর্তনের সিনক্রেটিজম পর্যবেক্ষণে গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের অবস্থা (জনতাত্ত্বিক অবস্থা থেকে শুরু করে ধর্মীয় বিশ্বাস, আচার অনুষ্ঠান, বিবর্তন এবং উত্তরাধিকার প্রথা) এখানে সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরিবেশিত করা হলো:

৮.১.১। জনতাত্ত্বিক পরিলেখ :

আচিক্ মান্দি নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর ধর্মবিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানে সিনক্রেটিজম পর্যবেক্ষণে গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের জনতাত্ত্বিক (Demographic Profile) অবস্থা নিচে তুলে ধরা হলো।

চিত্রলেখ ৮.১ : সামাজিক লিঙ্গভেদে অংশগ্রহণকারীর শতকরা হার

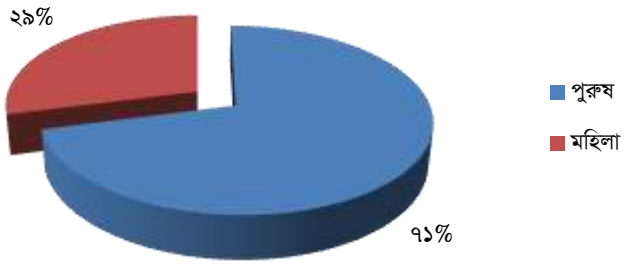

উৎস : গবেষকের জরিপ

আচিক্ মান্দিদের সিনক্রেটিজম প্রবণতা পর্যালোচনার জন্য অংশগ্রহণকারী হিসেবে মোট ১০০ জন উত্তরদাতাকে নমুনা হিসেবে নেয়া হয় যারা গবেষণার প্রশ্নমালার বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এদের সামাজিক লিঙ্গ পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় ৭১ শতাংশ পুরুষ এবং ২৯ শতাংশ মহিলা অংশগ্রহণকারী রয়েছে (পরিশিষ্ট: সারণি- ০১)।

চিত্রলেখ ৮.২ : বয়সভেদে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা

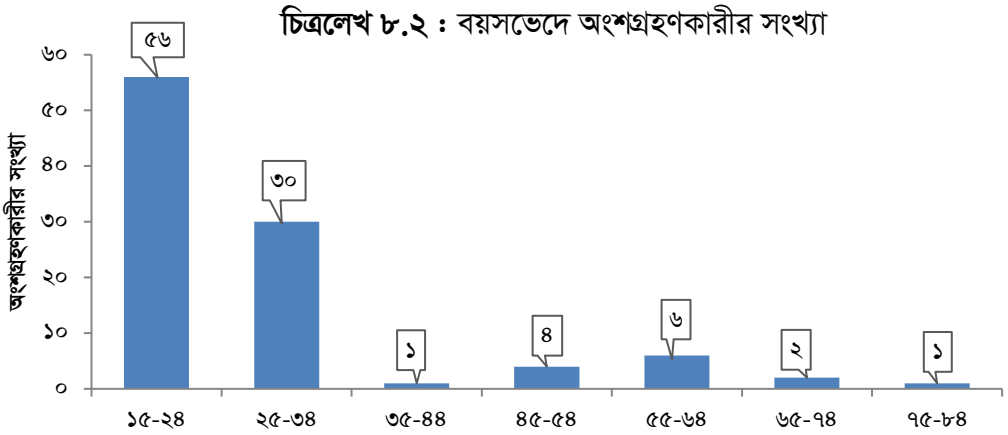

উৎস : গবেষকের জরিপ

অংশগ্রহণকারীদের বয়স বিশ্লেষণ করে দেখা যায় ১৫ থেকে ৮৪ বছর বয়স পর্যন্ত অংশগ্রহণকারীরা এই গবেষণায় অংশ নিয়েছে। এদেরকে ১০ বছর অন্তর অন্তর ৭টি গ্রুপে ভাগ করলে সবচেয়ে বেশি অংশগ্রহণকারী রয়ছে ১৫-২৪ বছর বয়সীদের মাঝে যাদের সংখ্যা ৫৬ শতাংশ। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে ২৫-৩৪ বছর বয়সীরা যা শতকরা অনুযায়ী ৩০ শতাংশ এবং ৩৫-৪৪ বছরের মাঝে আছে ১ শতাংশ। ৪৫-৫৪ বছরের মাঝে অংশগ্রহণকারী রয়েছে ৪ শতাংশ এবং তার উপরে ৫৫-৬৪ বছর বয়সী আছে ৬ শতাংশ। অংশগ্রহণকারীদের মাঝে ৬৫-৭৪ বছরের ভিতর আছে ২ শতাংশ এবং সর্বশেষ গ্রুপ ৭৫-৮৪ বছর বয়সীদের মাঝে আছে ১ শতাংশ অংশগ্রহণকারী (পরিশিষ্ট: সারণি- ০২)।

চিত্রলেখ ৮.৩ : এলাকা ভিত্তিক অংশগ্রহণকারীর শতকরা

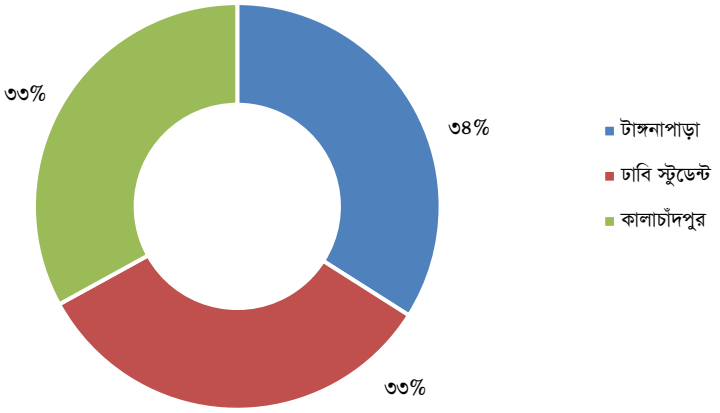

উৎস : গবেষকের জরিপ

বাংলাদেশের তিনটি এলাকা থেকে প্রায় সম অনুপাতে আচিক্ মান্দিদের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। যেখানে দেখা যায় ময়মনসিংহের টংনাপাড়া থেকে ৩৪ শতাংশ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের থেকে ৩৩ শতাংশ এবং ঢাকার কালাচাঁদপুর থেকে ৩৩ শতাংশ অংশগ্রহণকারী এই গবেষণায় অংশগ্রহণ করেছে (পরিশিষ্ট: সারণি- ০৩)।

৮.১.২। আচিক্ মান্দি গোষ্ঠীর বর্তমান ধর্মবিশ্বাস: সিনক্রেটিস্টিক উপাদান চিহ্নিত করণ :

চিত্রলেখ ৮.৪ : ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী আচিক্ মান্দিদের প্রকারভেদ

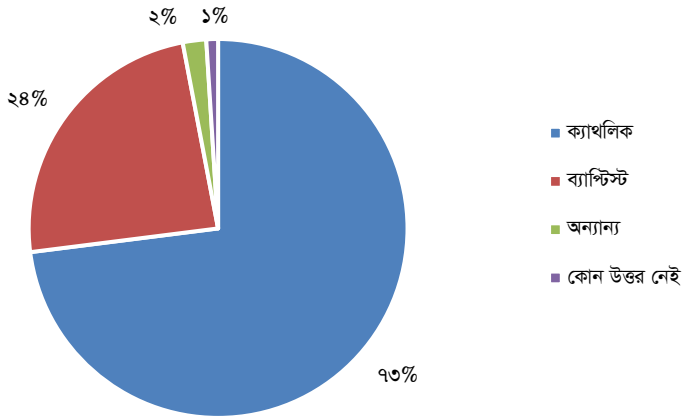

উৎস : গবেষকের জরিপ

ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী আচিক্ মান্দি জনগোষ্ঠীর প্রকারভেদে দেখা যায় ৭৩ শতাংশ অংশগ্রহণকারী ক্যাথলিক ধর্মে বিশ্বাসী যা সর্বোচ্চ। দ্বিতীয় অবস্থানে আছে ব্যাপ্টিস্ট ধর্মে বিশ্বাসীরা যাদের হার ২৪ শতাংশ এবং ২ শতাংশ অংশগ্রহণকারী অন্যান্য ধর্মে বিশ্বাস করে। এ সম্পর্কে কোন উত্তর প্রদান করেনি এমন অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ১ শতাংশ। অংশগ্রহণকারীদের তথ্য পুরো পপুলেশানকে কতটুকু উপস্থাপন করছে সেটা পরীক্ষা করার জন্য "ওয়ান স্যাম্পল প্রপোরশান টেস্ট" ব্যবহার করা হয়েছে যেখানে দেখা যায় টেস্ট ডিস্ট্রিবিউশান স্বাভাবিক (পরিশিষ্ট: সারণি- ০৪)।

চিত্রলেখ ৮.৫ : খ্রিষ্টধর্ম ও আচিক্ মান্দি ধর্মে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক

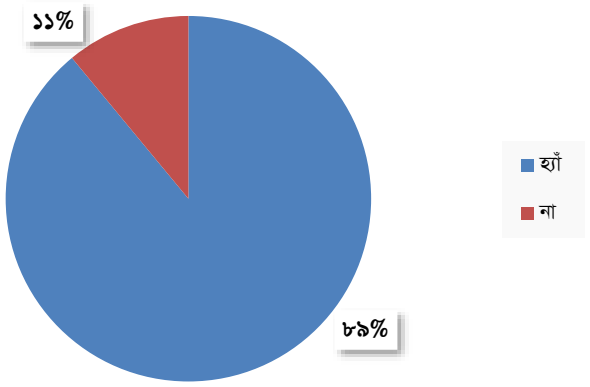

উৎস : গবেষকের জরিপ

আচিক্ মান্দি জনগোষ্ঠীর মাঝে খ্রিষ্টধর্ম ও আচিক্ মান্দিদের মধ্যে ধর্মীয় দ্বান্দ্বিকতা সম্পর্কে ৮৯ শতাংশ মানুষ ইতিবাচক উত্তর প্রদান করেছে এবং বাকি ১১ শতাংশ অংশগ্রহণকারী মনে করে দুটি ধর্মে কোন দ্বান্দিক সম্পর্ক নেই (পরিশিষ্ট: সারণি- ৫৫)।

চিত্রলেখ ৮.৬ : খ্রিষ্টধর্ম ও আচিক্ মান্দি ধর্মে বিদ্যমান দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের বিষয়বস্তু

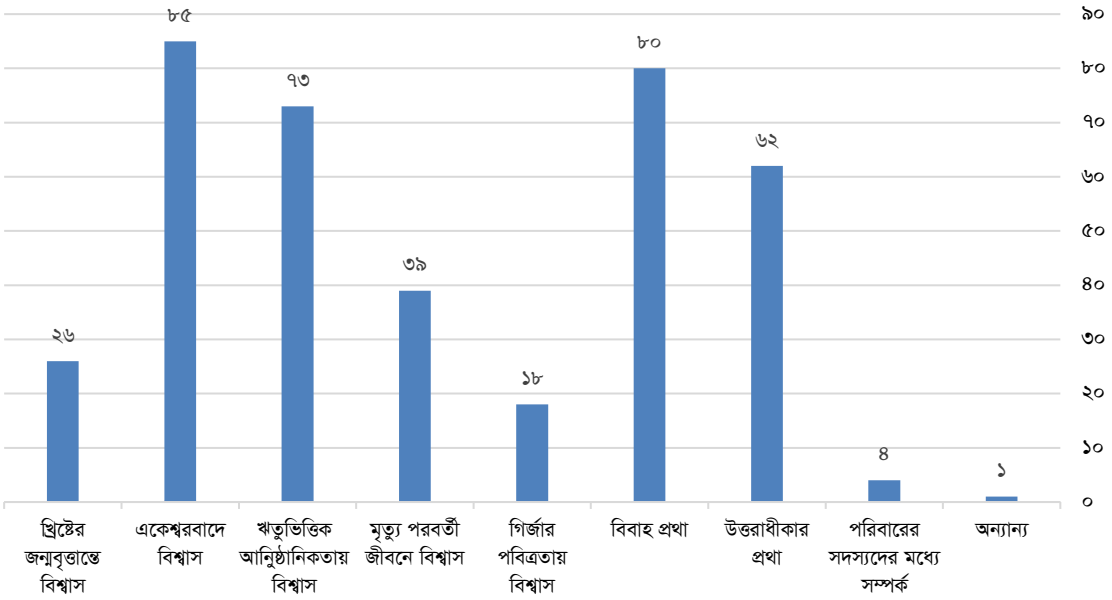

উৎস : গবেষকের জরিপ

খ্রিষ্টধর্ম ও আচিক্ মান্দি ধর্মে বিদ্যমান দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সবচেয়ে বেশি দ্বন্দ্ব রয়েছে একেশ্বরবাদে বিশ্বাসে যা ৮৫ জন অংশগ্রহণকারীরই মনে করেন। তারপর ঋতু ভিত্তিক আনুষ্ঠানিকতা বিশ্বাসে দ্বন্দ্ব রয়েছে এমন উত্তরদাতার সংখ্যা ৭৩ জন। দ্বান্দ্বিকতার বিষয়বস্তু হিসেবে মৃত্যু পরবর্তী জীবনে বিশ্বাসে দ্বন্দ্ব ৩৯ জন এবং খ্রিষ্টের জন্মবৃত্তান্তে বিশ্বাসে দ্বন্দ্ব রয়েছে ২৬ জন অংশগ্রহণকারীর মধ্যে। তাছাড়া বহুবিবিহ ও উত্তরাধীকার প্রথায় দ্বন্দ্ব রয়েছে যথাক্রমে ৮০ ও ৬২ জন অংশগ্রহণকারীর মধ্যে (পরিশিষ্ট: সারণি- ৩৫)।

চিত্রলেখ ৮.৭ : ধর্মীয় উপাসনায় আচিক্ মান্দিদের ধর্মবিশ্বাস

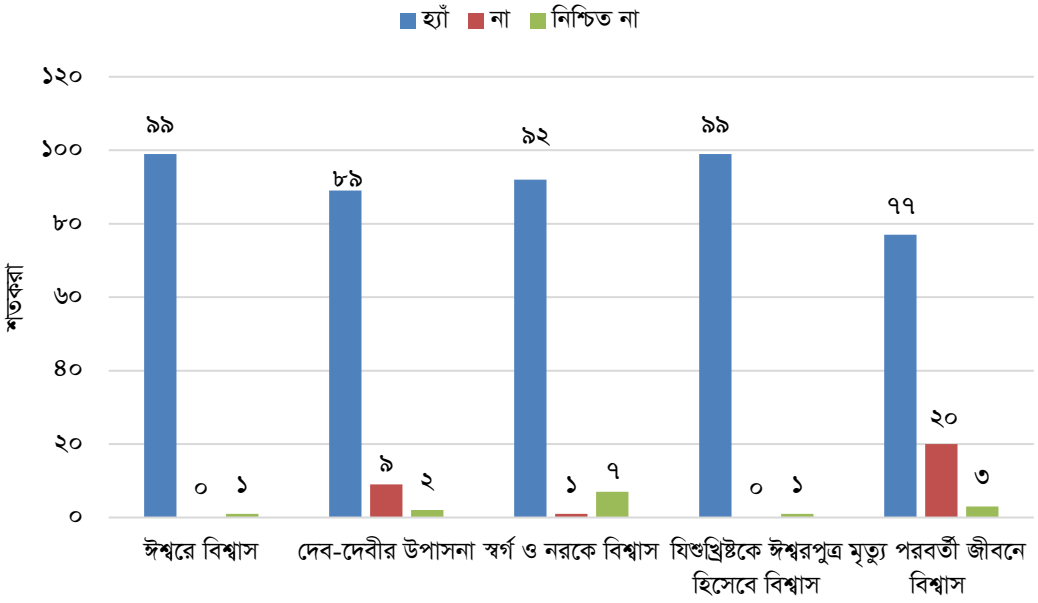

উৎস : গবেষকের জরিপ

ধর্মীয় উপাসনার উপাদান হিসেবে আচিক্ মান্দিদের ধর্মবিশ্বাস পর্যবেক্ষণে দেখা যায় শতকরা ৯৯ শতাংশ অংশগ্রহণকারী ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন এবং ১ শতাংশ এ ব্যাপারে নিশ্চিত নয় বলে উত্তর প্রদান করেছেন। তারপর অংশগ্রহণকারী আচিক্ মান্দিদের মধ্যে ৮৯ শতাংশ দেব-দেবীর উপাসনা আছে বলে ইতিবাচক উত্তর প্রদান করেছে এবং বাকি ৯ শতাংশ দেব-দেবীর উপাসনায় বিশ্বাস করেন না বলে উত্তর দিয়েছেন, এ ব্যাপারে নিশ্চিত নয় ২ শতাংশ। স্বর্গ ও নরকে বিশ্বাস করেন এমন অংশগ্রহণকারীর হার ৯২ শতাংশ আর ৭ শতাংশ অংশগ্রহণকারী মনে করেন এ ব্যাপারে তারা নিশ্চিত নয়, বাকি ১ শতাংশ স্বর্গ ও নরকে অবিশ্বাস করেন। যিশুখ্রিষ্টকে ঈশ্বরপুত্র হিসেবে বিশ্বাস করেন এমন

অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ৯৯ শতাংশ আর বাকি ১ শতাংশ এ ব্যাপারে নিশ্চিত নয়। অংশগ্রহণকারীদের মাঝে মৃত্যু পরবর্তী জীবনে বিশ্বাস আছে এমন মানুষের সংখ্যা ৭৭ শতাংশ আর মৃত্যু পরবর্তী জীবনে বিশ্বাস নেই এমন উত্তরদাতার হার ২০ শতাংশ বাকি ৩ শতাংশ মনে করেন এ ব্যাপারে তারা নিশ্চিত নয় (পরিশিষ্ট: সারণি- ০৫)।

চিত্রলেখ ৮.৮ : ধর্মীয় প্রকারভেদে ধর্মীয় উপাসনায় আচিক্ মান্দিদের বিশ্বাস

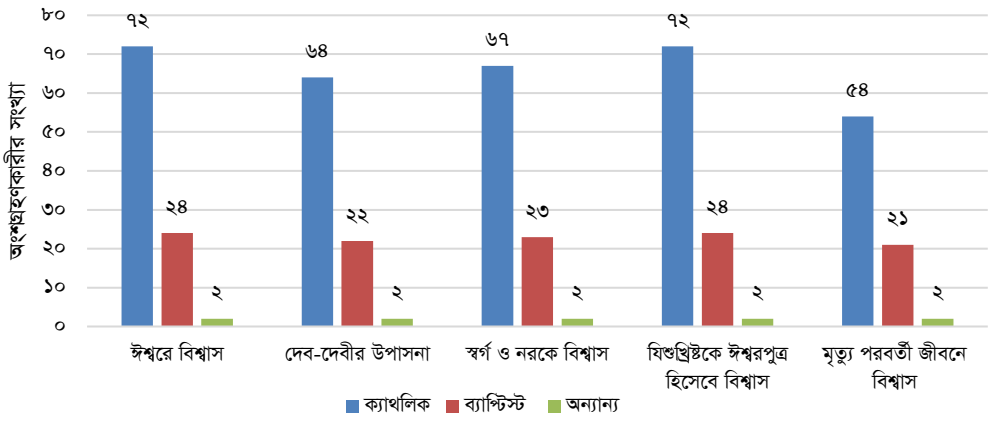

উৎস : গবেষকের জরিপ

ধর্মীয় উপাসনায় আচিক্ মান্দিদের ধর্মবিশ্বাসকে আরেকটু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণে আচিক্ মান্দিদের ধর্মীয় প্রকারভেদ অনুযায়ী ক্রসট্যাব করে দেখা যায় ক্যাথলিকদের মাঝে ঈশ্বরে বিশ্বাসের সংখ্যা ৭২, ব্যাপ্টিস্টদের মাঝে ২৪ এবং অন্যান্যদের মাঝে ২ শতাংশ। অংশগ্রহণকারীদের মাঝে দেব-দেবীর উপাসনায় ক্যাথলিক ৬৪, ব্যাপ্টিস্ট ২২ এবং অন্যান্য ধর্ম বিশ্বাসীদের সংখ্যা ২ শতাংশ। স্বর্গ ও নরকে বিশ্বাসে ক্যাথলিকদের সংখ্যা ৬৭, ব্যাপ্টিস্ট ২৩ এবং ২ শতাংশ অন্যান্য ধর্মের। তাছাড়া যিশুখ্রিষ্টকে ঈশ্বরপুত্র হিসেবে বিশ্বাসে ক্যাথলিক ৭২, ব্যাপ্টিস্ট ২৪ এবং অন্যান্য ধর্ম রয়েছে ২ শতাংশ। মৃত্যু পরবর্তী জীবনে বিশ্বাসে ক্যাথলিকদের সংখ্যা রয়েছে ৫৪ শতাংশ, ব্যাপ্টিস্ট ২১ এবং অন্যান্য ধর্ম রয়েছে ২ শতাংশ অংশগ্রহণকারী (পরিশিষ্ট: সারণি- ০৫)।

চিত্রলেখ ৮.৯ : ধর্মীয় ধারণা ও নীতিতে আচিক মান্দিদের বিশ্বাস

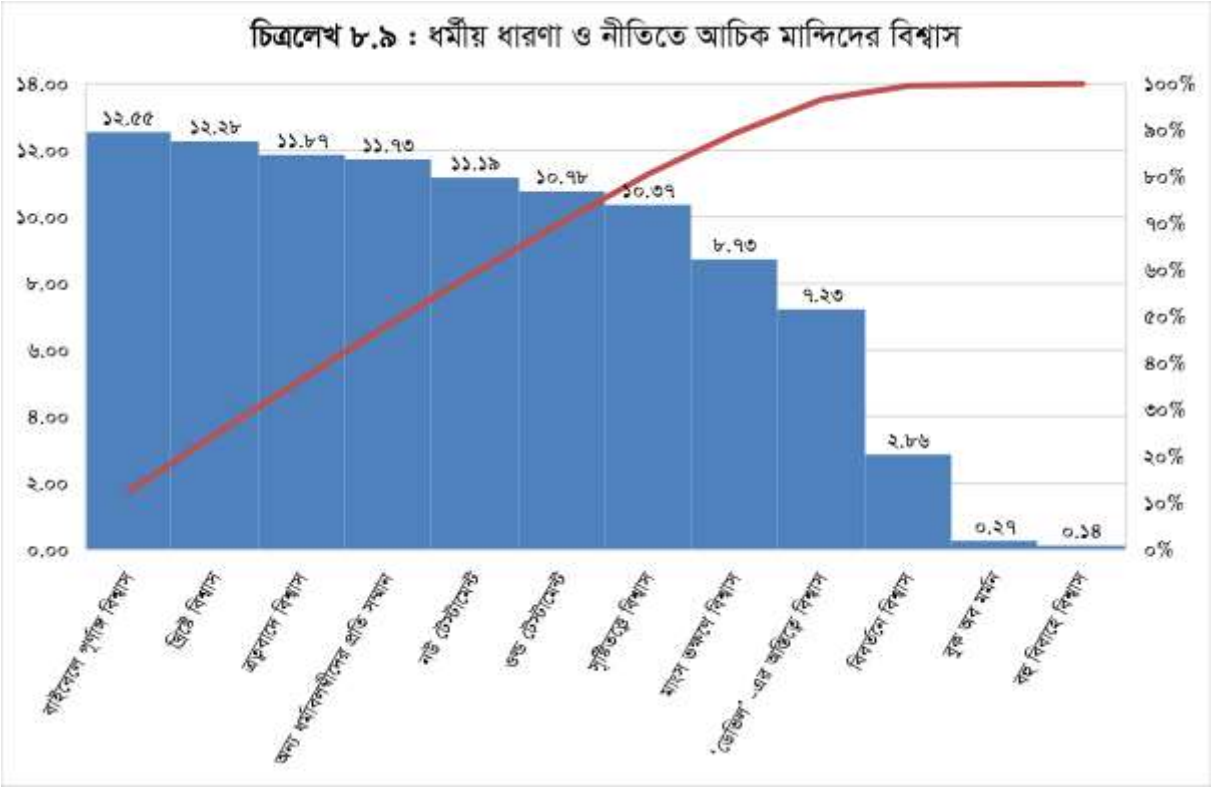

উৎস : গবেষকের জরিপ

আচিক্ মান্দি জনগোষ্ঠীর মাঝে ধর্মীয় ধারণা ও নীতিতে তাদের বিশ্বাসসমূহ বিশ্লেষণে পাওয়া যায় সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস রয়েছে বাইবেলে যা ১২.৫০ শতাংশ। ধারণা ও নীতিতে বিশ্বাসে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে খ্রিষ্টে বিশ্বাস যা ১২.২৮ শতাংশ। অংশগ্রহণকারীরা ধারণা ও নীতিতে বিশ্বাসের তৃতীয় অবস্থানে আছে ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস যা ১১.৮৭ শতাংশ। তারপর অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি সম্মানে বিশ্বাসে আছে ১১.৭৩ শতাংশ। নিউ টেস্টামেন্টে বিশ্বাস করে ১১.১৯ শতাংশ এবং ওল্ড টেস্টামেন্টে বিশ্বাস করে ১০.৭৮ শতাংশ। সৃষ্টিতত্ত্বে বিশ্বাস করে ১০.৩৭ শতাংশ যা ধারণা ও নীতিতে বিশ্বাসের সপ্তম অবস্থানে রয়েছে। তারপর অষ্টম অবস্থানে রয়েছে মাংস ভক্ষণে বিশ্বাস যার হার ৮.৭৩ শতাংশ। 'ডেভিল' -এর অস্তিত্বে বিশ্বাস করে ৭.২৩ শতাংশ এবং বিবর্তনে বিশ্বাস করে ২.৮৬ শতাংশ। বুক অব মর্মনে বিশ্বাসীদের হার ০.২৭ শতাংশ এবং বহুবিবাহে বিশ্বাস করছে ০.১৪ শতাংশ (পরিশিষ্ট: সারণি-০৬)।

চিত্রলেখ ৮.১০ : ধর্মীয় প্রকারভেদে ধর্মীয় ধারণা ও নীতিতে আচিক্ মান্দিদের বিশ্বাসের ধরণ

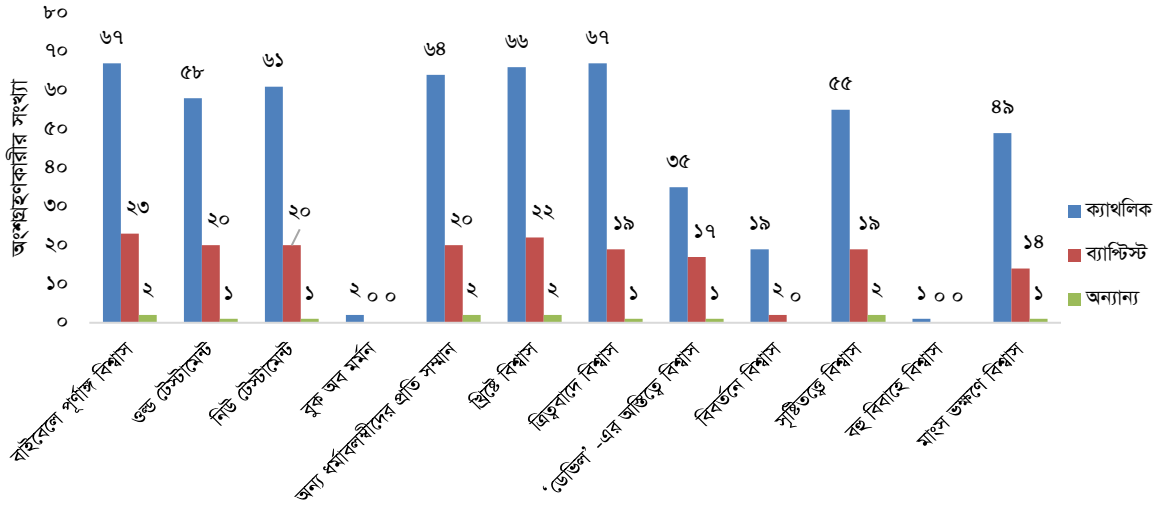

উৎস : গবেষকের জরিপ

আচিক্ মান্দিদের ধর্মীয় ধারণা ও নীতিতে বিশ্বাসের ধরণকে ধর্মীয় প্রকারভেদ ভিত্তিক বিশ্লেষণ করে দেখা যায় বাইবেলে পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাস রয়েছে এমন ক্যাথলিক রয়েছেন ৬৭ জন যা সর্বোচ্চ, ব্যাপ্টিস্ট ২৩ এবং অন্যান্য ধর্ম বিশ্বাসী আছে ২ জন। ওল্ড টেস্টামেন্টে বিশ্বাস করে ৫৮ জন ক্যাথলিক, ২০ জন ব্যাপ্টিস্ট এবং ১ জন অন্যান্য ধর্ম বিশ্বাসী। নিউ টেস্টামেন্টে বিশ্বাস করে এমন ক্যাথলিকের সংখ্যা ৬১, ব্যাপ্টিস্ট ২০ এবং অন্যান্য ধর্ম বিশ্বাসী আছে ১ জন। বুক অব মর্মনে বিশ্বাস করে শুধুমাত্র ২ জন। অন্য ধর্মের প্রতি সম্মানের বিশ্বাসে ক্যাথলিক রয়েছে ৬৪, ব্যাপ্টিস্ট ২০ এবং অন্যান্য ধর্ম বিশ্বাসী ২ জন। খ্রিষ্টে বিশ্বাস করে ৬৬ জন ক্যাথলিক, ২২ ব্যাপ্টিস্ট এবং ২ জন অন্যান্য ধর্ম বিশ্বাসী। ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস করে ক্যাথলিক ৬৭, ব্যাপ্টিস্ট ১৯ এবং অন্যান্য ধর্ম বিশ্বাসী আছে ১ জন। ডেভিল এর অস্তিত্বে বিশ্বাস করে এমন অংশগ্রহণকারীদের মাঝে ক্যাথলিক রয়েছে ৩৫ জন, ব্যাপ্টিস্ট ১৭ এবং অন্যান্য ধর্ম বিশ্বাসী আছে ১ জন। বিবর্তনে বিশ্বাস করে ১৯ জন ক্যাথলিক এবং ২ জন ব্যাপ্টিস্ট। সৃষ্টিতত্ত্বে বিশ্বাস করে এমন ক্যাথলিকের সংখ্যা ৫৫, ব্যাপ্টিস্ট ১৯ এবং অন্যান্য ধর্ম বিশ্বাসী আছে ২ জন। বহুবিবাহে বিশ্বাস করে শুধুমাত্র ১ জন ক্যাথলিক। মাংস ভক্ষণে বিশ্বাস করে এমন ক্যাথলিক সংখ্যা ৪৯ জন, ব্যাপ্টিস্ট ১৪ জন এবং অন্যান্য ধর্ম বিশ্বাসী আছে ১ জন অংশগ্রহণকারী (পরিশিষ্ট: সারণি- ০৬)।

চিত্রলেখ ৮.১১ : সামাজিক লিঙ্গভেদে ধর্মীয় ধারণা ও নীতিতে আচিক্ মান্দিদের বিশ্বাসের ধরণ

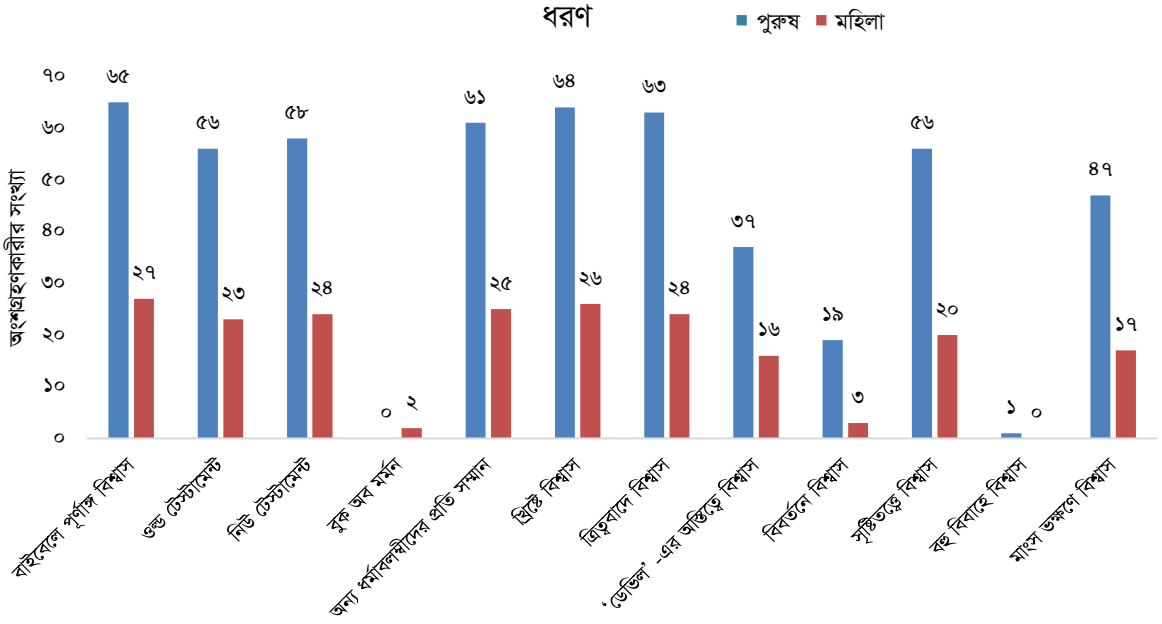

উৎস : গবেষকের জরিপ

ধর্মীয় ধারণা ও নীতিতে আচিক্ মান্দিদের বিশ্বাসের ধরণকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণের জন্য সামাজিক লিঙ্গ ভিত্তিক বিশ্লেষণ করে দেখা যায় বাইবেলে পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাস রয়েছে এমন পুরুষের সংখ্যা ৬৫ যেখানে মহিলা রয়েছে ২৭ জন। ওল্ড টেস্টামেন্টে বিশ্বাস করে ৫৬ জন পুরুষ এবং ২৩ জন মহিলা। নিউ টেস্টামেন্টে বিশ্বাস করে এমন পুরুষের সংখ্যা ৫৮ এবং মহিলা ২৪ জন। বুক অব মর্মনে বিশ্বাস করে শুধুমাত্র ২ জন মহিলা। অন্য ধর্মের প্রতি সম্মানের বিশ্বাসে পুরুষ রয়েছে ৬১ এবং মহিলা ২৫ জন। খ্রিষ্টে বিশ্বাস করে ৬৪ জন পুরুষ এবং ২৬ জন মহিলা। ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস করে পুরুষ ৬৩ আর মহিলা ২৪ জন। ডেভিল এর অস্তিত্বে বিশ্বাস করে এমন অংশগ্রহণকারীদের মাঝে পুরুষ রয়েছে ৩৭ জন এবং মহিলা ১৬ জন। বিবর্তনে বিশ্বাস করে ১৯ জন পুরুষ এবং ৩ জন মহিলা। সৃষ্টিতত্ত্বে বিশ্বাস করে এমন পুরুষের সংখ্যা ৫৬ এবং মহিলা ২০। বহুবিবাহে বিশ্বাস করে শুধুমাত্র ১ জন পুরুষ। মাংস ভক্ষণে বিশ্বাস করে এমন পুরুষ ৪৭ জন এবং মহিলা রয়েছে ১৭ জন (পরিশিষ্ট: সারণি- ০৭)।

চিত্রলেখ ৮.১২ : বয়সভেদে ধর্মীয় ধারণা ও নীতিতে আচিক্ মান্দিদের বিশ্বাসের ধরণ

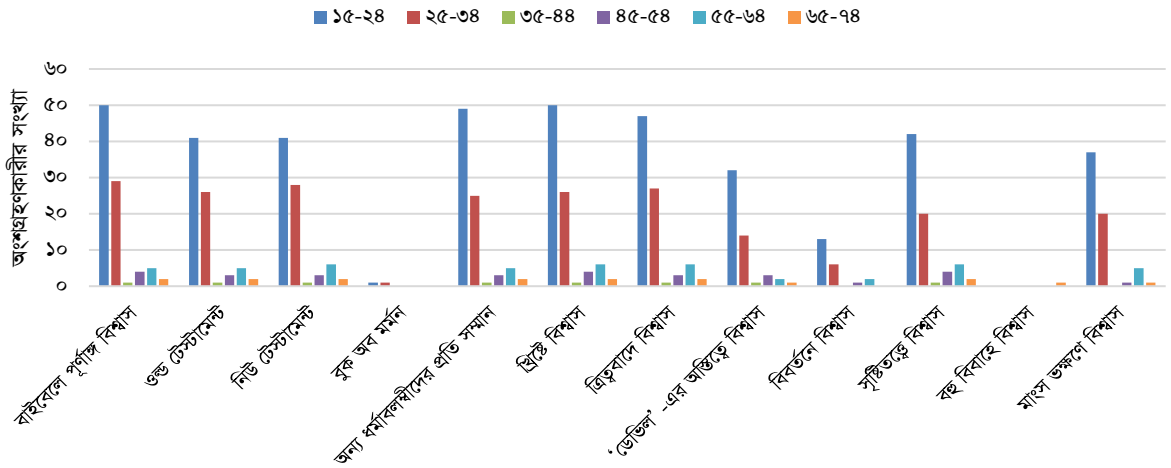

উৎস : গবেষকের জরিপ

ধর্মীয় ধারণা ও নীতিতে আচিক্ মান্দিদের বিশ্বাসের ধরণকে আরেকটু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণের জন্য বয়স ভিত্তিক বিশ্লেষণ করে দেখা যায় বাইবেলে পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাস রয়েছে ১৫-২৪ বছর বয়সীদের মাঝে সর্বোচ্চ যার সংখ্যা ৫০, ২৫-৩৪ এর মাঝে ২৯, ৩৫-৪৪ বছরে ১ জন, ৪৫-৫৪ তে রয়েছে ৪ জন, ৫৫-৬৪ বছর বয়সে ৫ জন এবং ৬৫-৭৪ বছরে ২ জন অংশগ্রহণকারী। ওল্ড টেস্টামেন্টে বিশ্বাস করে ১৫-২৪ বছরে ৪১, ২৫-৩৪ এর মাঝে ২৬, ৩৫-৪৪ বছরে ১ জন, ৪৫-৫৪ তে রয়েছে ৩ জন, ৫৫-৬৪ বছর বয়সে ৫ জন এবং ৬৫-৭৪ বছরে ২ জন। নিউ টেস্টামেন্টে বিশ্বাস করে ১৫-২৪ বছরে ৪১, ২৫-৩৪ এর মাঝে ২৮, ৩৫-৪৪ বছরে ১ জন, ৪৫-৫৪ তে রয়েছে ৩ জন, ৫৫-৬৪ বছর বয়সে ৬ জন এবং ৬৫-৭৪ বছরে ২ জন। বুক অব মর্মনে বিশ্বাস করে ১৫-২৪ বছরে ১ জন এবং ২৫-৩৪ বছরে ১ জন অংশগ্রহণকারী। অন্য ধর্মের প্রতি সম্মানে বিশ্বাস করে ১৫-২৪ বছরে ৪৯, ২৫-৩৪ এর মাঝে ২৫, ৩৫-৪৪ বছরে ১ জন, ৪৫-৫৪ তে রয়েছে ৩ জন, ৫৫-৬৪ বছর বয়সে ৫ জন এবং ৬৫-৭৪ বছরে ২ জন। খ্রিষ্টে বিশ্বাস করে এমন অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ১৫-২৪ বছরে ৫০, ২৫-৩৪ এর মাঝে ২৬, ৩৫-৪৪ বছরে ১ জন, ৪৫-৫৪ তে রয়েছে ৪ জন, ৫৫-৬৪ বছর বয়সে ৬ জন এবং ৬৫-৭৪ বছরে ২ জন। ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস করে ১৫-২৪ বছরে ৪৭, ২৫-৩৪ এর মাঝে ২৭, ৩৫-৪৪ বছরে ১ জন, ৪৫-৫৪ তে রয়েছে ৩ জন, ৫৫-৬৪ বছর বয়সে ৬ জন এবং ৬৫-৭৪ বছরে ২ জন অংশগ্রহণকারী। ডেভিল এর অস্তিত্বে বিশ্বাস করে এমন অংশগ্রহণকারীদের মাঝে ১৫-২৪ বছরে ৩২, ২৫-৩৪ এর মাঝে ১৪, ৩৫-৪৪ বছরে ১ জন, ৪৫-৫৪ তে রয়েছে ৩ জন, ৫৫-৬৪ বছর বয়সে ২ জন

এবং ৬৫-৭৪ বছরে ১ জন। বিবর্তনে বিশ্বাস করে ১৫-২৪ বছরে ১৩, ২৫-৩৪ এর মাঝে ৬, ৪৫-৫৪ তে রয়েছে ১ জন, ৫৫-৬৪ বছর বয়সে ২ জন। সৃষ্টিতত্ত্বে বিশ্বাস করে ১৫-২৪ বছরে ৪২, ২৫-৩৪ এর মাঝে ২০, ৩৫-৪৪ বছরে ১ জন, ৪৫-৫৪ তে রয়েছে ৪ জন, ৫৫-৬৪ বছর বয়সে ৬ জন এবং ৬৫-৭৪ বছরে ২ জন। বহুবিবাহে বিশ্বাস করে শুধুমাত্র ১ জন। মাংস ভক্ষণে বিশ্বাস করে ১৫-২৪ বছরে ৩৭, ২৫-৩৪ এর মাঝে ২০, ৪৫-৫৪ তে রয়েছে ১ জন, ৫৫-৬৪ বছর বয়সে ৫ জন এবং ৬৫-৭৪ বছরে ১ জন অংশগ্রহণকারী (পরিশিষ্ট: সারণি- ০৮)।

চিত্রলেখ ৮.১৩ : এলাকা ভিত্তিক ধর্মীয় ধারণা ও নীতিতে আচিক্ মান্দিদের বিশ্বাসের ধরণ

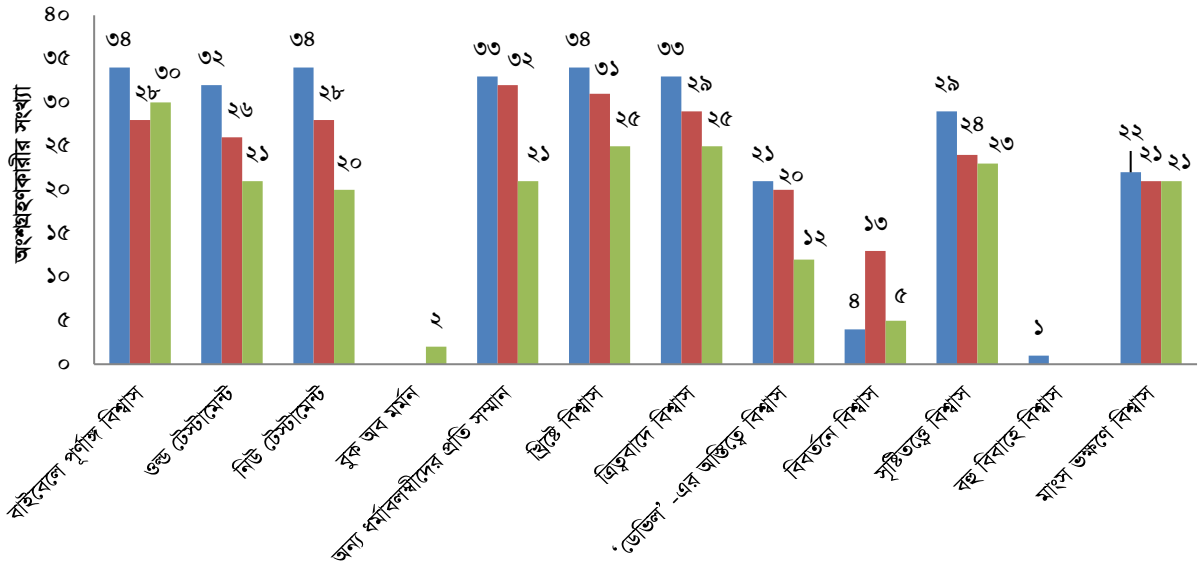

উৎস : গবেষকের জরিপ

ধর্মীয় ধারণা ও নীতিতে আচিক্ মান্দিদের বিশ্বাসের ধরণকে আরেকটু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করার জন্য এলাকা ভিত্তিক ক্রসট্যাব করে দেখা যায় টংনাপাড়ায় বাইবেলে বিশ্বাস রয়েছে সর্বোচ্চ যার সংখ্যা ৩৪, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্টদের মাঝে ২৮ এবং কালাচাঁদপুর এলাকায় ৩০। ওল্ড টেস্টামেন্টে টংনাপাড়ায় বিশ্বাস করে ৩২, ঢাবি স্টুডেন্টরা ২৬ এবং কালাচাঁদপুরে ২১ জন অংশগ্রহণকারী। নিউ টেস্টামেন্টে বিশ্বাস করে টংনাপাড়ায় ৩৪ ঢাবি স্টুডেন্ট ২৮ এবং কালাচাঁদপুর এলাকায় ২০। বুক অব মর্মনে বিশ্বাস করে শুধু কালাচাঁদপুর এলাকার ২ জন অংশগ্রহণকারী। অন্য ধর্মের প্রতি সম্মানে বিশ্বাস করে টংনাপাড়ায় ৩৩, ঢাবি স্টুডেন্ট ৩২ এবং কালাচাঁদপুর এলাকায় ২৫। খ্রিষ্টে বিশ্বাস করে এমন অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা টংনাপাড়ায় ৩৪, ঢাবি স্টুডেন্টদের মাঝে ৩১ এবং

কালাচাঁদপুরে ২৫। ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস করে টংনাপাড়ায় ৩৩, ঢাবি স্টুডেন্ট ২৯ এবং কালাচাঁদপুর এলাকায় ২৫ জন অংশগ্রহণকারী। ডেভিল এর অস্তিত্বে বিশ্বাস করে এমন অংশগ্রহণকারীদের মাঝে টংনাপাড়ায় ২১, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্ট ২০ এবং কালাচাঁদপুর এলাকার ১২ জন। বিবর্তনে বিশ্বাস করে টংনাপাড়ার ৪ জন, ঢাবি স্টুডেন্ট ১৩ জন এবং কালাচাঁদপুরে ৫ জন। সৃষ্টিতত্ত্বে বিশ্বাস করে টংনাপাড়ায় ২৯, ঢাবি স্টুডেন্ট ২৪, এবং কালাচাঁদপুরের ২৩ জন অংশগ্রহণকারী। বহুবিবাহে বিশ্বাস করে শুধুমাত্র টংনাপাড়ার ১ জন। মাংস ভক্ষণে বিশ্বাস করে টংনাপাড়ায় ২২, ঢাবি স্টুডেন্ট ২১ এবং কালাচাঁদপুরের ২১ জন অংশগ্রহণকারী (পরিশিষ্ট: সারণি- ০৯)।

চিত্রলেখ ৮.১৪ : গত দশ বছরের মধ্যে ধর্মবিশ্বাসে পরিবর্তন

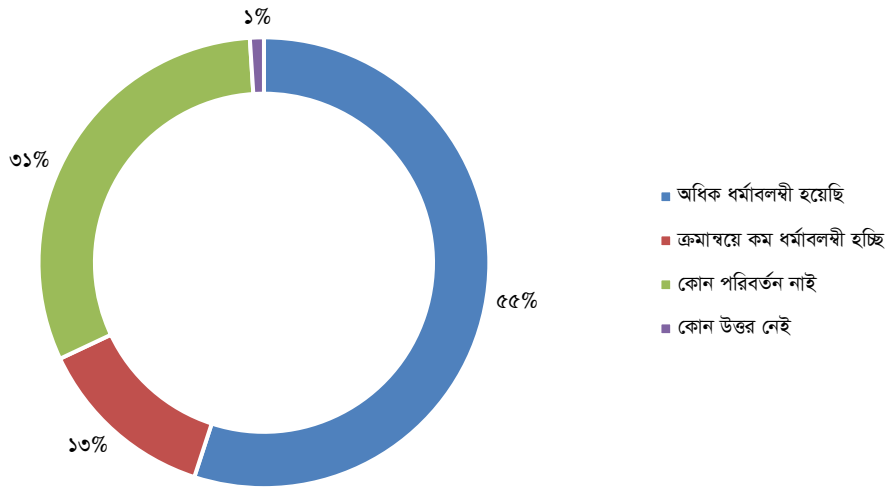

উৎস : গবেষকের জরিপ

আচিক্ মান্দি জনগোষ্ঠীর মাঝে গত দশ বছরের মধ্যে ধর্মবিশ্বাসে পরিবর্তন বিশ্লেষণ করে দেখা যায় অধিক ধর্মাবলম্বী হয়েছে ৫৫ শতাংশ এবং ক্রমান্বয়ে ধর্মাবলম্বী হচ্ছে ১৩ শতাংশ। পক্ষান্তরে কোন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়নি ৩১ শতাংশ অংশগ্রহণকারীর মধ্যে। তবে ১ শতাংশ অংশগ্রহণকারীর কাছ থেকে এ বিষয়ে কোন উত্তর পাওয়া যায়নি (পরিশিষ্ট: সারণি- ৫০)।

৮.১.৩। আচিক্ মান্দিদের আচার অনুষ্ঠানে বিবর্তনের স্বরূপ

চিত্রলেখ ৮.১৫ : খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী হয়ে গির্জায় উপাসনাকাল

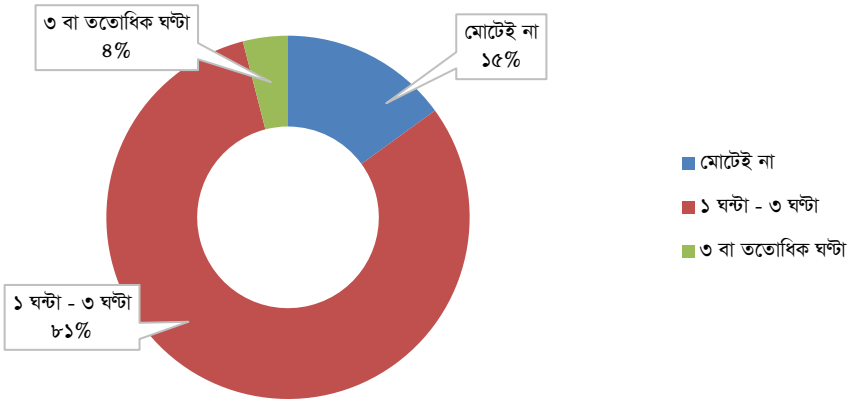

উৎস : গবেষকের জরিপ

আচিক্ মান্দিদের আচার অনুষ্ঠানের স্বরূপ বিশ্লেষণে খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী হয়ে গির্জায় উপাসনাকাল পর্যালোচনা করে দেখা যায়, ১৫ শতাংশ অংশগ্রহণকারী সপ্তাহে উপাসনায় কোন সময় ব্যয় করছেনা। ৮১ শতাংশ অংশগ্রহণকারী ১ থেকে ৩ ঘণ্টা সময় ব্যয় করছে এবং ৪ শতাংশ অংশগ্রহণকারী ৩ ঘণ্টা বা তার অধিক সময় উপাসনা করছে (পরিশিষ্ট: সারণি- ৫৩)।

চিত্রলেখ ৮.১৬ : ধর্মীয় প্রকারভেদে খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী হয়ে গির্জায় উপাসনাকাল

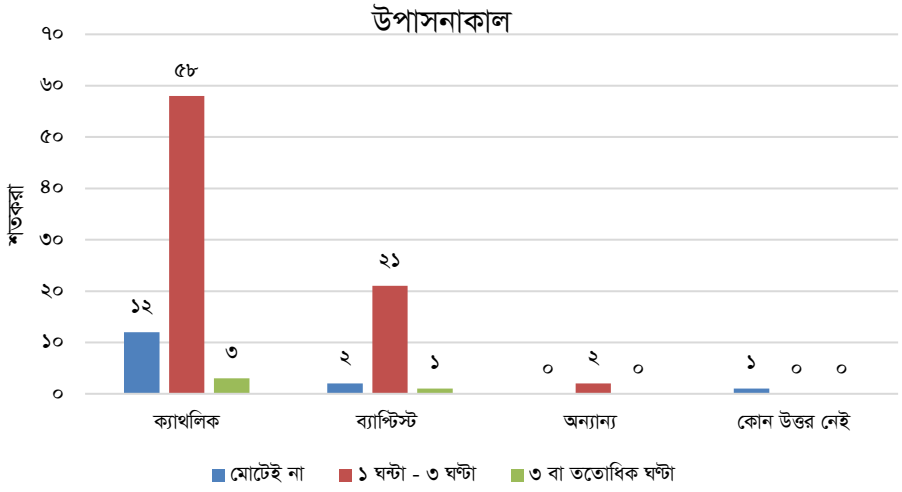

উৎস : গবেষকের জরিপ

আচিক্ মান্দিদের আচার অনুষ্ঠানকে আরেকটু গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ধর্মীয় প্রকারভেদে খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী হয়ে গির্জায় উপাসনায় অংশগ্রহণকারী সবচেয়ে বেশি ক্যাথলিকদের মাঝে (৫৮ শতাংশ) যারা সপ্তাহে ১-৩ ঘণ্টা সময় উপাসনায় ব্যয় করছে। ব্যাপ্টিস্টদের মাঝে এর পরিমাণ ২১ শতাংশ এবং অন্যান্য ধর্মে বিশ্বাসীদের মাঝে শতকরা ২ শতাংশ (পরিশিষ্ট: সারণি- ৫৩)।

চিত্রলেখ ৮.১৭ : এলাকা ভিত্তিক খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী হয়ে গির্জায় উপাসনাকাল

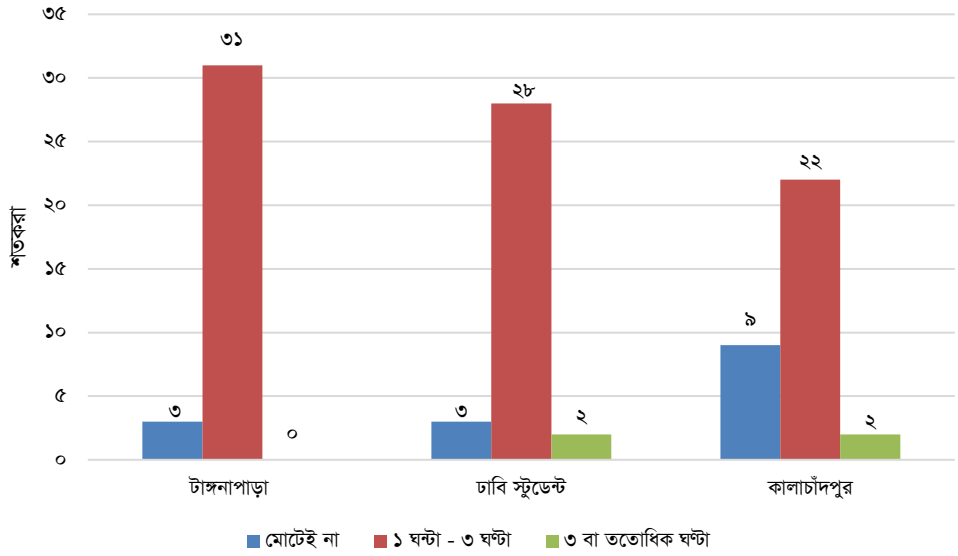

উৎস : গবেষকের জরিপ

আচিক্ মান্দিদের আচার অনুষ্ঠানকে এলাকা ভিত্তিক খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী হয়ে গির্জায় উপাসনার সাপ্তাহিক সময় পর্যালোচনায় দেখা যায়, টংনাপাড়ায় ১-৩ ঘণ্টা সময় ব্যয় করছে ৩১ শতাংশ। ঢাবি স্টুডেন্ট ২৮ শতাংশ এবং কালাচাঁদপুর এলাকায় ২২ শতাংশ (পরিশিষ্ট: সারণি- ২৭)।

চিত্রলেখ ৮.১৮ : আচার অনুষ্ঠান ও ধর্মীয় রীতি-নীতিতে আচিক্ মান্দি

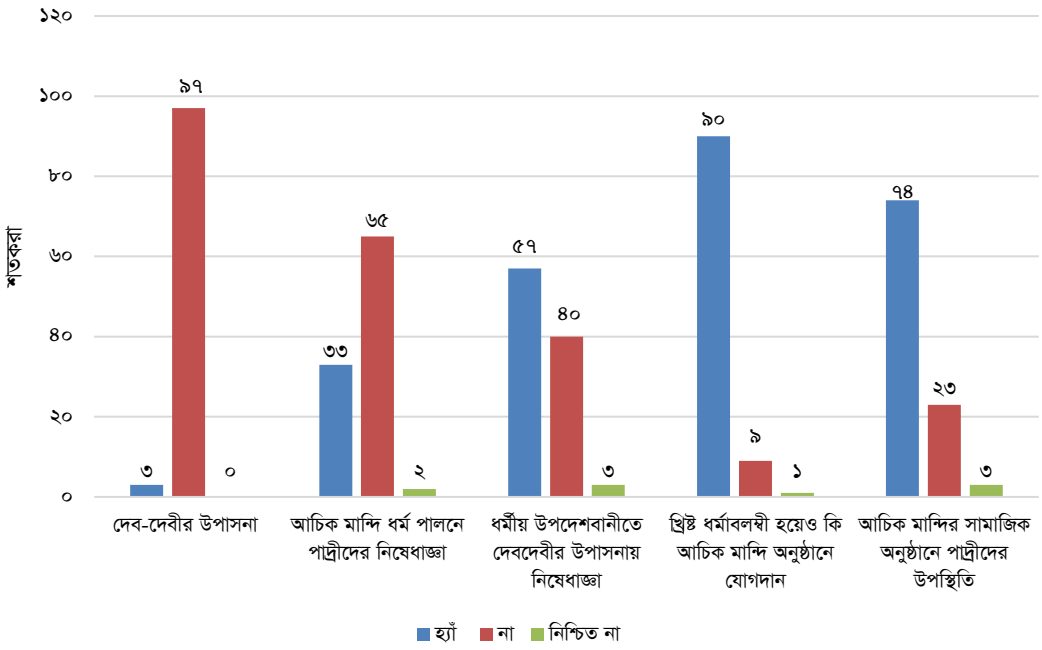

উৎস : গবেষকের জরিপ

আচিক্ মান্দিদের আচার অনুষ্ঠান ও ধর্মীয় রীতি-নীতি বিশ্লেষণে পাওয়া যায়, ৩ শতাংশ অংশগ্রহণকারী দেব-দেবীর উপাসনা করছে। আচিক্ মান্দিদের ধর্ম পালনে ৩৩ শতাংশ অংশগ্রহণকারীকে পাদ্রীরা নিষেধ করছে, কিন্তু ২ শতাংশ এ ব্যাপারে নিশ্চিত না বলে উত্তর দিয়েছে। ধর্মীয় উপদেশবানীতে দেব-দেবীর উপাসনায় নিষেধাজ্ঞা আছে বলে মনে করে ৫৭ শতাংশ অংশগ্রহণকারী কিন্তু ৪০ শতাংশ বলছে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই, বাকি ৩ শতাংশ এ ব্যাপারে নিশ্চিত নয়। খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী হয়েও আচিক্ মান্দিদের অনুষ্ঠানে যোগদান করে এমন অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ৯০ শতাংশ। আচিক্ মান্দিদের সামাজিক অনুষ্ঠানে ৭৪ শতাংশ অংশগ্রহণকারীর মতে পাদ্রী উপস্থিত থাকেন কিন্তু ২৩ শতাংশ বলেছে উপস্থিত থাকেন না, আর বাকি ৩ শতাংশ এ ব্যাপারে নিশ্চিত নয় (পরিশিষ্ট: সারণি- ৫৪)।

চিত্রলেখ ৮.১৯ : ধর্মীয় প্রকারভেদে দেব-দেবীর উপাসনায় আচিক্ মান্দি

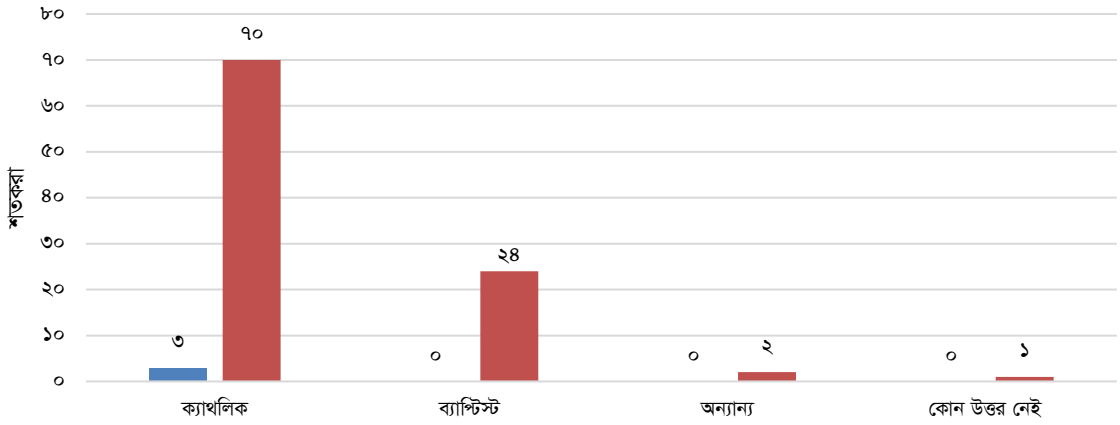

উৎস : গবেষকের জরিপ

আচিক্ মান্দিদের আচার অনুষ্ঠান ও ধর্মীয় রীতি-নীতি বিশ্লেষণে পাওয়া যায়, ৩ শতাংশ অংশগ্রহণকারী দেব-দেবীর উপাসনা করছে। এ বিশ্লেষণকে আরেকটু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণের জন্য ধর্মীয় প্রকারভেদে ক্রসট্যাব করে দেখা যায় দেব-দেবীর উপাসনাকারী ৩ শতাংশ অংশগ্রহণকারীই ক্যাথলিক ধর্মে বিশ্বাসী (পরিশিষ্ট: সারণি- ০৪)।

চিত্রলেখ ৮.২০ : ধর্মীয় প্রকারভেদে আচিক্ মান্দি ধর্ম পালনে পাদ্রীদের নিষেধাজ্ঞা

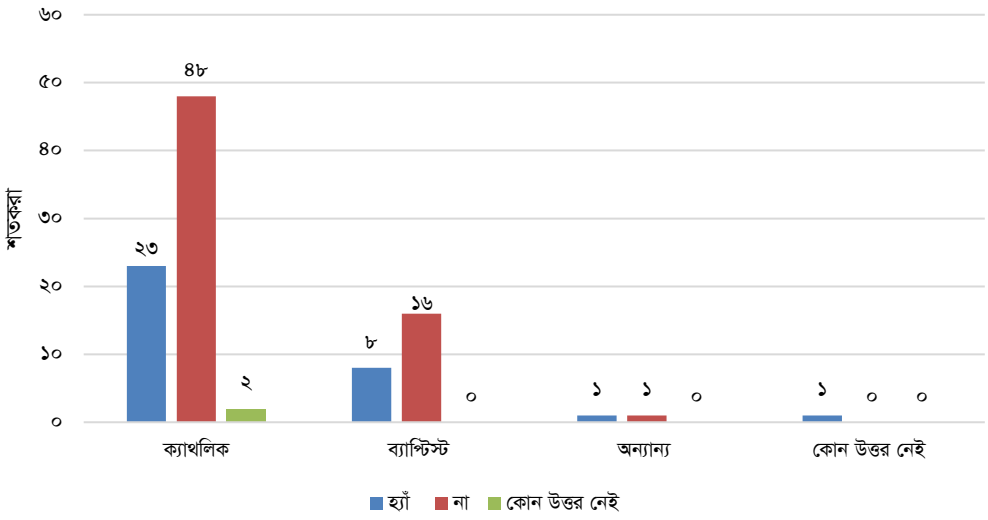

উৎস : গবেষকের জরিপ

আচিক্ মান্দি ধর্ম পালনে পাদ্রীদের নিষেধাজ্ঞা গভীরভাবে পর্যালোচনায় ধর্মীয় প্রকারভেদ ভিত্তিক ক্রসট্যাব করে দেখা যায় ক্যাথলিকদের মাঝে নিষেধাজ্ঞাটা সর্বোচ্চ যা ২৩ শতাংশ এবং ব্যাপ্টিস্টদের মাঝে ৮ শতাংশ। আর ১ শতাংশ রয়েছে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মাঝে (পরিশিষ্ট: সারণি- ৬০)।

চিত্রলেখ ৮.২১ : ধর্মীয় প্রকারভেদে গির্জার ধর্মীয় উপদেশবাণীতে আচিক্ মান্দিদের দেব-দেবীর উপাসনাকে নিষিদ্ধতা

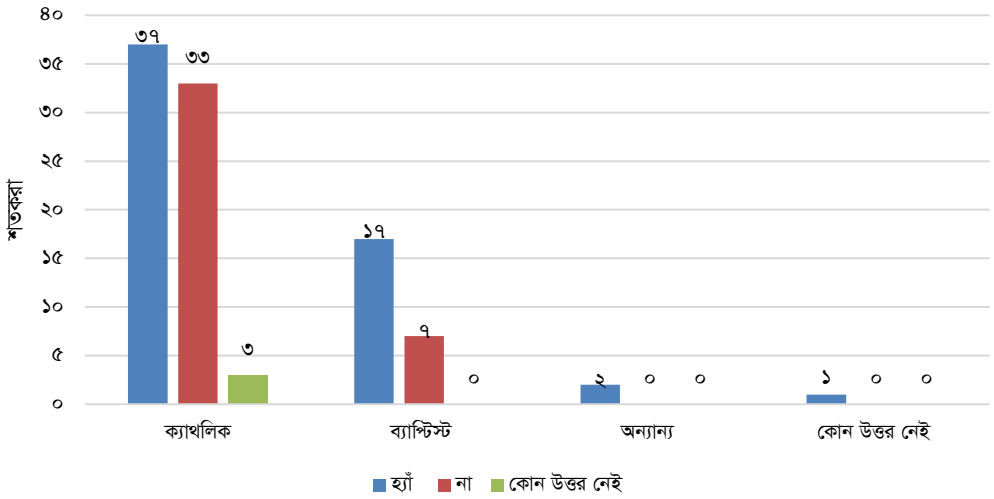

উৎস : গবেষকের জরিপ

গির্জার ধর্মীয় উপদেশবানীতে আচিক্ মান্দিদের দেব-দেবীর উপাসনাকে নিষিদ্ধতায় ধর্মীয় প্রকারভেদ ভিত্তিক ক্রসট্যাব করে দেখা যায়, ক্যাথলিকদের মাঝে নিষেধাজ্ঞাটা সর্বোচ্চ যা ৩৭ শতাংশ। ব্যাপ্টিস্টদের মাঝে ১৭ শতাংশ এবং অন্যান্য ধর্মের রয়েছে ২ শতাংশ। এ বিষয়ে উত্তর প্রদান করেনি ১ শতাংশ অংশগ্রহণকারী (পরিশিষ্ট: সারণি- ৬১)।

চিত্রলেখ ৮.২২ : ধর্মীয় প্রকারভেদে খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী হয়েও আচিক্ মান্দি অনুষ্ঠানে যোগদান

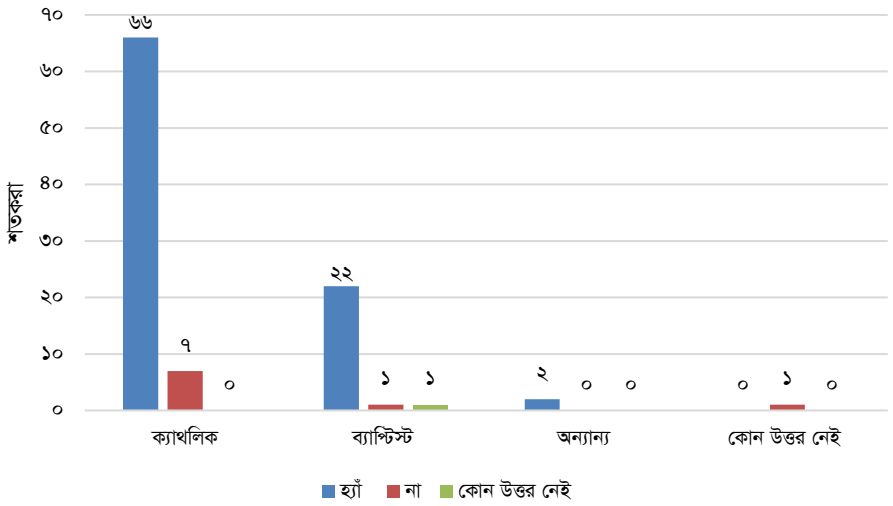

উৎস : গবেষকের জরিপ

খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী হয়েও আচিক্ মান্দি অনুষ্ঠানে যোগদান করেন এমন অংশগ্রহণকারীদেরকে ধর্মীয় প্রকারভেদে পর্যালোচনা করে দেখা যায়, ক্যাথলিকদের হার সর্বোচ্চ যা ৬৬ শতাংশ, ব্যাপ্টিস্ট ২২ শতাংশ এবং অন্যান্য ধর্মের ২ শতাংশ মানুষ (পরিশিষ্ট: সারণি- ৬২)।

চিত্রলেখ ৮.২৩ : ধর্মীয় প্রকারভেদে আচিক্ মান্দি সামাজিক অনুষ্ঠানে গির্জার পাদ্রীদের উপস্থিতি

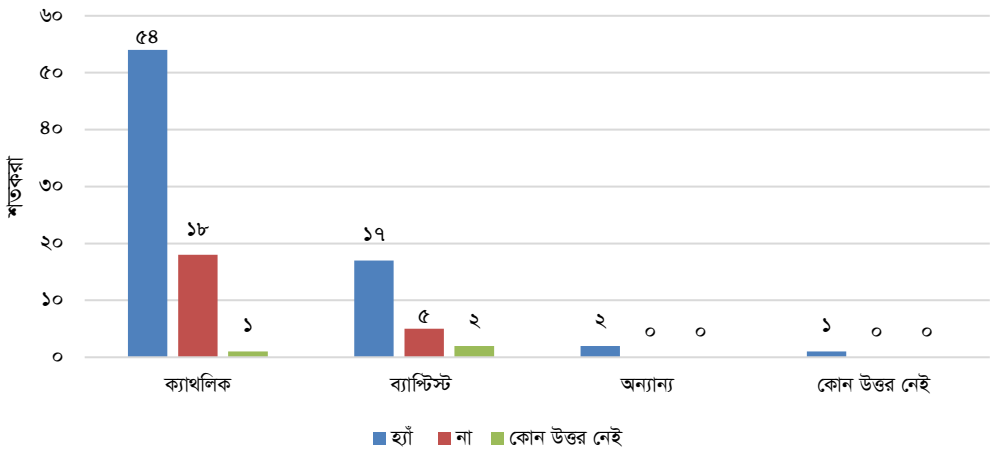

উৎস : গবেষকের জরিপ

আচিক্ মান্দি সামাজিক অনুষ্ঠানে গির্জার পাদ্রীদের উপস্থিতিকে ধর্মীয় প্রকারভেদে বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ক্যাথলিকদের ৫৪ শতাংশ যা সর্বোচ্চ, ব্যাপ্টিস্ট ১৭ শতাংশ এবং অন্যান্য ধর্মের ২ শতাংশ অংশগ্রহণকারী এমন উত্তর দিয়েছেন। এ বিষয়ে কোন উত্তর প্রদান করেনি এমন অংশগ্রহণকারী ১ শতাংশ (পরিশিষ্ট: সারণি- ৬৩)।

চিত্রলেখ ৮.২৪ : আচিক মান্দি সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহে গির্জার পাদ্রীর পরিচয়

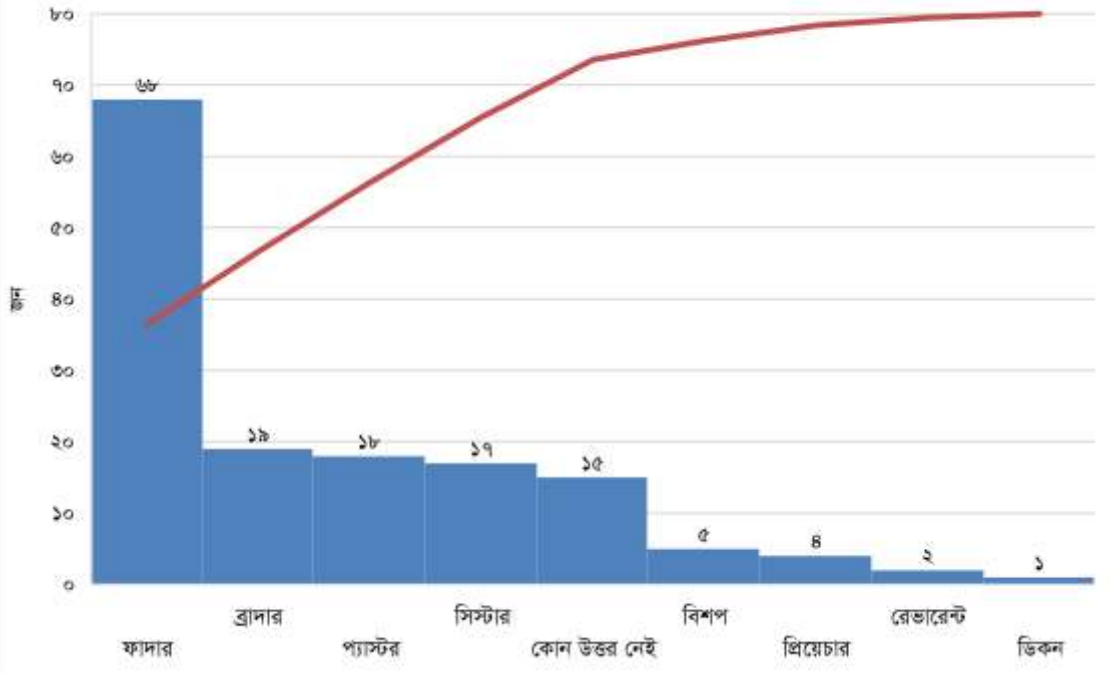

উৎস : গবেষকের জরিপ

আচিক্ মান্দি সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহে গির্জার পাদ্রীদের পরিচয় বিশ্লেষণ করে পাওয়া যায়, ৬৮ জন অংশগ্রহণকারী পাদ্রীদের পরিচয় ক্ষেত্রে বলেছে "ফাদার" যা সর্বোচ্চ। তারপর ১৯ জন অংশগ্রহণকারী বলেছে "ব্রাদার", ১৮ জন অংশগ্রহণকারী বলেছে "প্যাস্টর", ১৭ জন অংশগ্রহণকারী বলেছে "সিস্টার" এবং কোন উত্তর প্রদান করেনি ১৫ জন অংশগ্রহণকারী। এছাড়া ৫ জন অংশগ্রহণকারী বলেছে "বিশপ", ৪ জন অংশগ্রহণকারী বলেছে "প্রিয়েচার", ২ জন অংশগ্রহণকারী বলেছে "রেভারেন্ট" এবং ১ জন অংশগ্রহণকারী বলেছে ডিকন (পরিশিষ্ট: সারণি- ৫৬)।

৮.১.৪ ।আচিক্ মান্দি পরিবার ও সমাজের বিবর্তন :

চিত্রলেখ ৮.২৫ : পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের খ্রিষ্টধর্মের অবস্থা

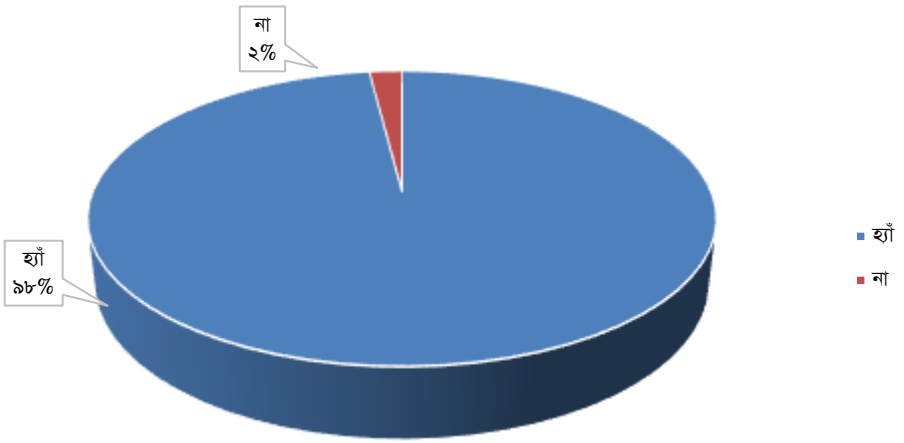

উৎস : গবেষকের জরিপ

পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী কি না সে সম্পর্কে জানা যায়, ৯৮ শতাংশ অংশগ্রহণকারীর পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী কিন্তু ২ শতাংশ অংশগ্রহণকারীর পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী নয় (পরিশিষ্ট: সারণি- ৫৭)।

চিত্রলেখ ৮.২৬ : ধর্মীয় প্রকারভেদে পরিবারের অন্য সদস্যদের খ্রিষ্টধর্মের অবস্থা

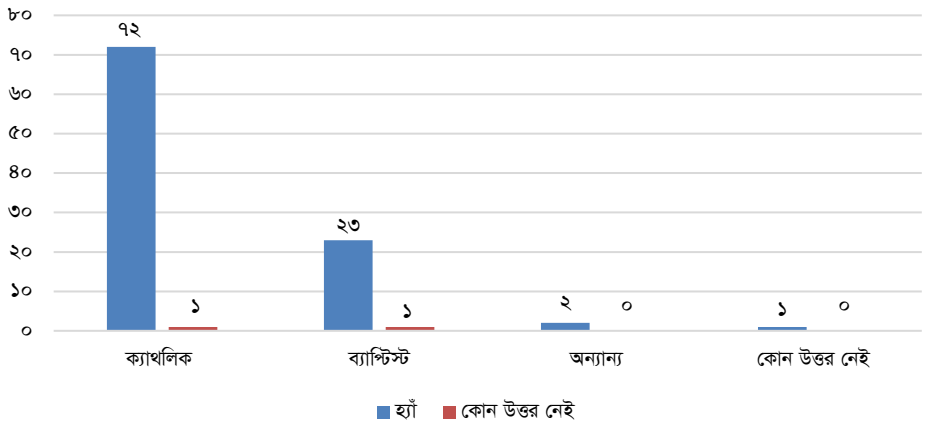

উৎস : গবেষকের জরিপ

পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের খ্রিষ্টধর্মের অবস্থা ধর্মীয় প্রকারভেদ ভিত্তিক আরেকটু গভীরভাবে বিশ্লেষণে পাওয়া যায়, ৭২ শতাংশ অংশগ্রহণকারীর পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী, ব্যাপ্টিস্ট ২৩ শতাংশ এবং অন্যান্য ধর্মের রয়েছে ২ শতাংশ অংশগ্রহণকারী। এ সম্পর্কে কোন উত্তর প্রদান করেনি এমন অংশগ্রহণকারী ১ শতাংশ (পরিশিষ্ট: সারণি- ৬৪)।

চিত্রলেখ ৮.২৭ : পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ধর্মীয় বাগবিতন্ডা

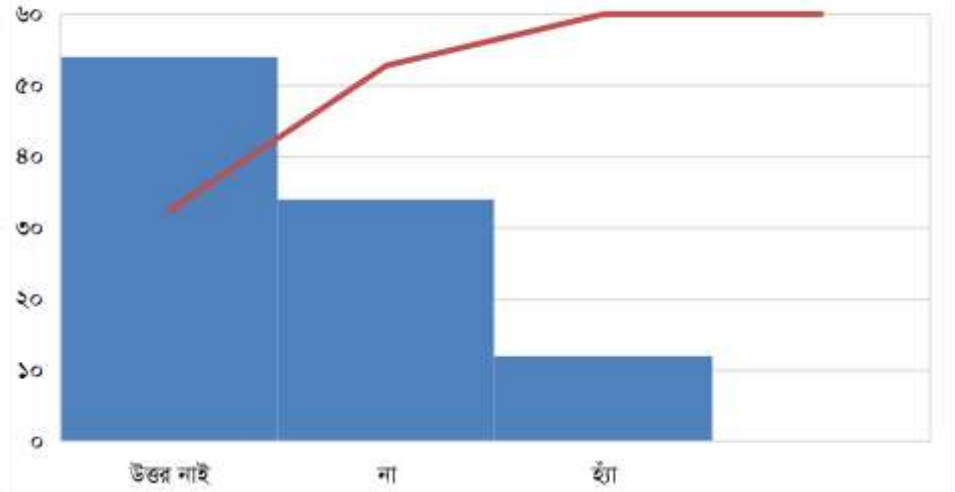

উৎস : গবেষকের জরিপ

পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ধর্ম নিয়ে কোন বাগবিতন্ডা হয় কি না সেটা পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, ১২ শতাংশ অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ধর্মীয় বাগবিতন্ডা বিরাজমান, কিন্তু ৩৪ শতাংশ এর সাথে কোন ধরণের ধর্মীয় বাগবিতন্ডা হয়না। এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেনি এমন অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ৫৩ শতাংশ যা সর্বোচ্চ (পরিশিষ্ট: সারণি- ৫২)।

চিত্রলেখ ৮.২৮ : সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে খ্রিষ্টধর্ম

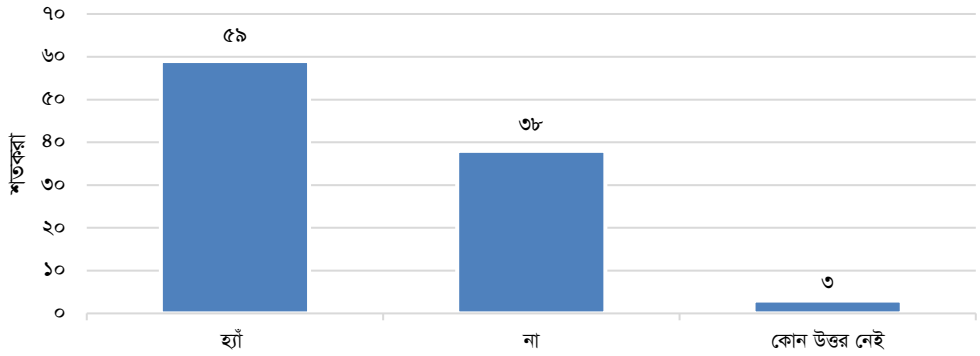

উৎস : গবেষকের জরিপ

অংশগ্রহণকারীদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য খ্রিষ্টধর্ম স্বীকার করে কি না তা বিশ্লেষণে দেখা যায়, ৫৯ শতাংশ অংশগ্রহণকারীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য খ্রিষ্টধর্ম স্বীকার করে এবং ৩৮ শতাংশ করেনা। কিন্তু এ ব্যাপারে উত্তর প্রদান করেনি এমন অংশগ্রহণকারী ৩ শতাংশ (পরিশিষ্ট: সারণি- ৫৮)।

চিত্রলেখ ৮.২৯ : সমাজে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা

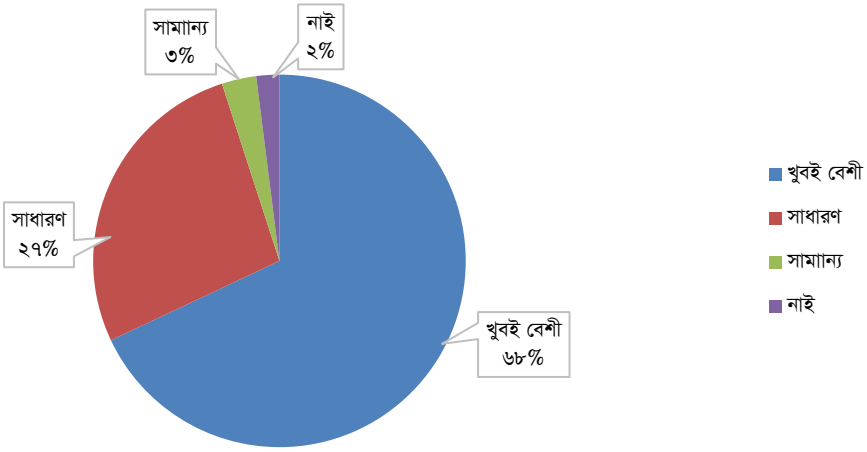

উৎস : গবেষকের জরিপ

অংশগ্রহণকারীদের থেকে সমাজে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানতে চেয়ে দেখা যায়, ৬৮ শতাংশ অংশগ্রহণকারী মনে করে খুব বেশি ধর্মের প্রয়োজন আছে, সাধারণভাবে ধর্মের প্রয়োজন লক্ষ্য

করা যায় ২৭ শতাংশ অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে এবং ৩ শতাংশ মনে করে সামান্য প্রয়োজন। একদম ধর্মের প্রয়োজনীয়তা নাই এমন বিশ্বাস করে ২ শতাংশ অংশগ্রহণকারী (পরিশিষ্ট: সারণি- ৫৯)।

চিত্রলেখ ৮.৩০ : সামাজিক কর্মকাণ্ডে আচিক্ মান্দি নৈতিকতার উপর আস্থা

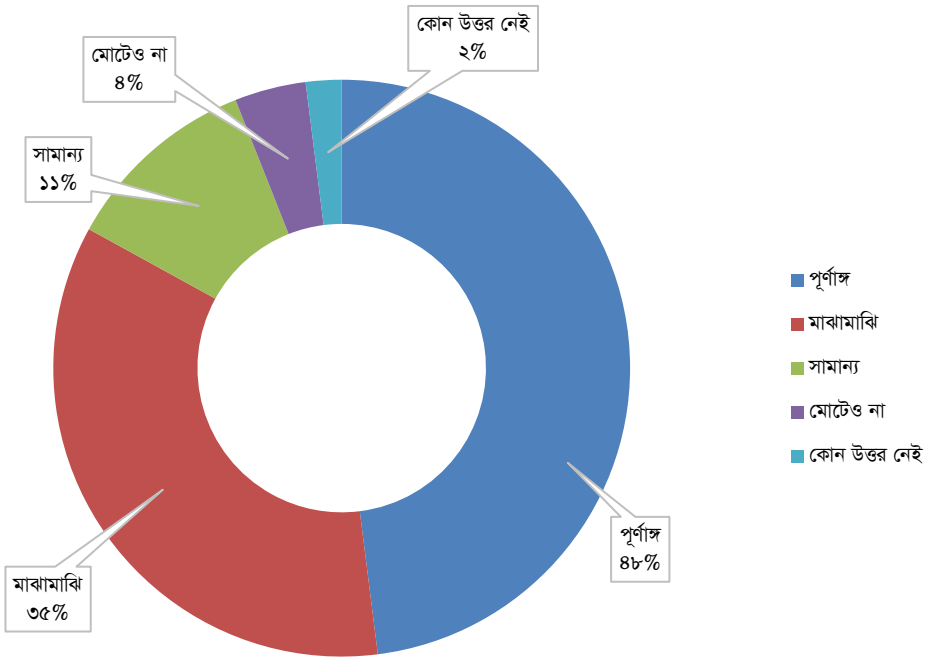

উৎস : গবেষকের জরিপ

সামাজিক কর্মকান্ডে আচিক্ মান্দির নৈতিকতার আস্থা সম্পর্কে জানা যায়, পূর্ণাঙ্গ আস্থা রাখে মনে করে ৪৮ শতাংশ অংশগ্রহণকারী যা সর্বোচ্চ। ৩৫ শতাংশ এর মতে মাঝামাঝি আস্থা রাখা যায়, ১১ শতাংশ সামান্য এবং ৪ শতাংশ এর মতে মোটেই না। এ সম্পর্কে কোন উত্তর প্রদান করেনি এমন অংশগ্রহণকারী ২ শতাংশ (পরিশিষ্ট: সারণি- ৩১)।

চিত্রলেখ ৮.৩১ : নৈতিক মানদণ্ডে খ্রিষ্টধর্মের প্রভাব

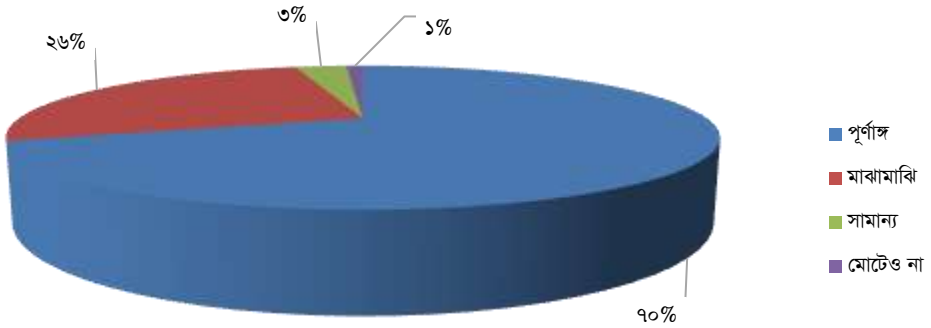

উৎস : গবেষকের জরিপ

নৈতিক মানদন্ডে খ্রিষ্টধর্মের প্রভাব সম্পর্কে জানা যায়, ৭০ শতাংশ অংশগ্রহণকারীর মতে পূর্ণাঙ্গ প্রভাব রয়েছে, ২৬ শতাংশ মনে করে মাঝামাঝি প্রভাব রয়েছে এবং ৩ শতাংশ এর মতে সামান্য। খ্রিষ্টধর্ম মোটেই নৈতিক মানদন্ডকে প্রভাবিত করেনা বলে মনে করা অংশগ্রহণকারীর হার ১ শতাংশ (পরিশিষ্ট: সারণি- ৩১)।

৮.১.৫। আচিক্ মান্দিদের সমাজ ব্যবস্থায় উত্তরাধিকার প্রথার বিবর্তন :

চিত্রলেখ ৮.৩২ : মাতা-পিতা ও প্রপিতামহগণের খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীতার অবস্থা

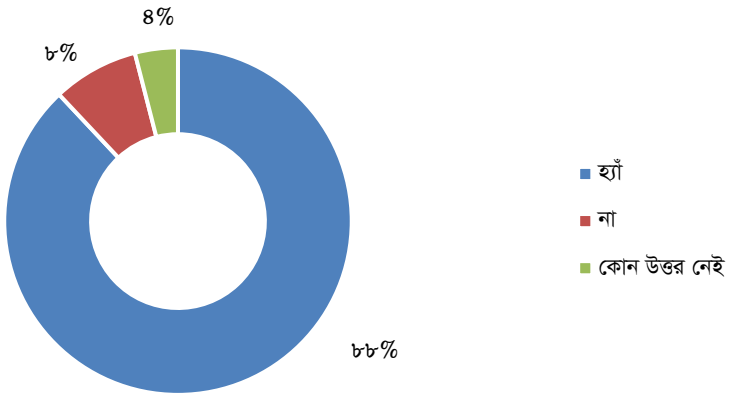

উৎস : গবেষকের জরিপ

মাতা-পিতা ও প্রপিতামহগণের খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী ছিলেন কি না সে বিষয়ে জানা যায়, ৮৮ শতাংশ অংশগ্রহণকারীর মাতা-পিতা এবং প্রপিতামহগণ খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী ছিলেন কিন্তু মাত্র ৮ শতাংশ অংশগ্রহণকারীর মাতা পিতা বা প্রপিতামহগণ খ্রিষ্টধর্মের ছিলেন না। এ সম্পর্কে কোন উত্তর প্রদান করেনি এমন অংশগ্রহণকারী ৪ শতাংশ (পরিশিষ্ট: সারণি- ৩৯)।

চিত্রলেখ ৮.৩৩ : ধর্মীয় প্রকারভেদে মাতা-পিতা এবং প্রপিতামহের খ্রিষ্টধর্মের অবস্থা

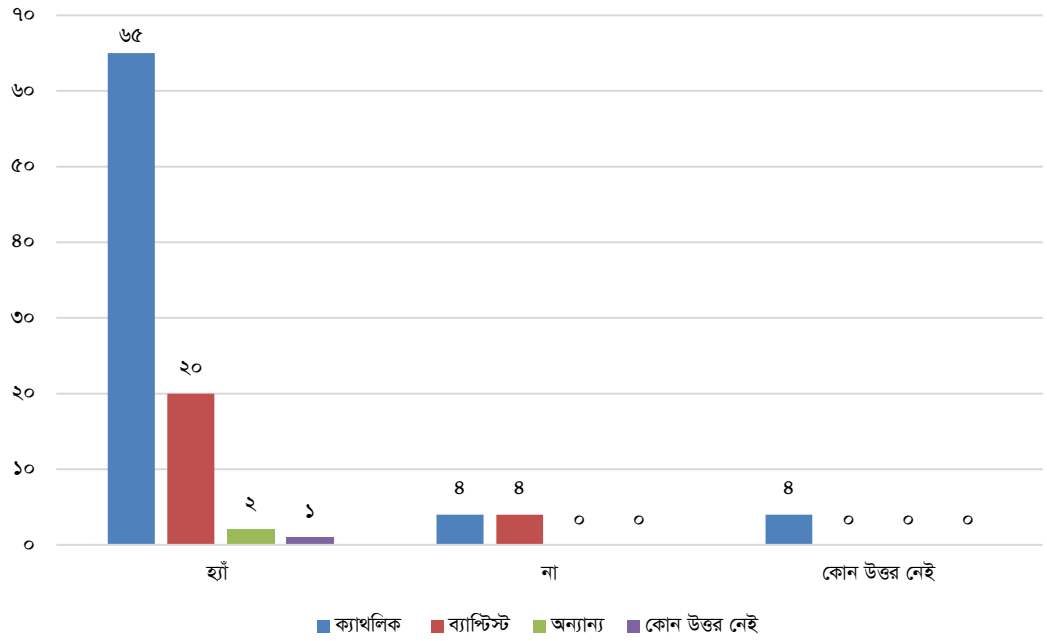

উৎস : গবেষকের জরিপ

মাতা-পিতা ও প্রপিতামহগণের খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী ছিলেন কি না বিষয়টিকে ধর্মীয় প্রকারভেদ ভিত্তিক বিশ্লেষণ করে জানা যায়, ক্যাথলিকদের ৬৫ শতাংশ অংশগ্রহণকারীর মাতা-পিতা ও প্রপিতামহগণ খ্রিষ্টধর্মের ছিলেন যা সর্বোচ্চ। ব্যাপ্টিস্টদের ২০ শতাংশ এবং অন্যান্য ধর্মের ২ শতাংশ অংশগ্রহণকারীর প্রপিতামহগণ খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী ছিলেন (পরিশিষ্ট: সারণি- ৩৬)।

চিত্রলেখ ৮.৩৪ : ধর্মান্তরিত হবার সময়কাল

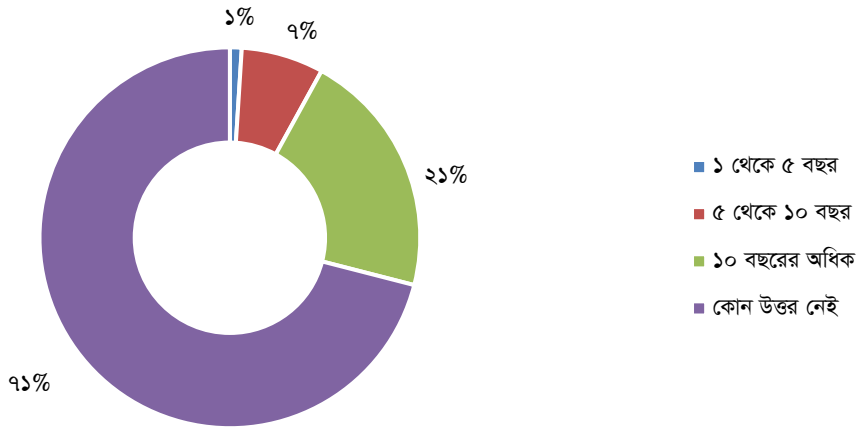

উৎস : গবেষকের জরিপ

অংশগ্রহণকারীদের ধর্মান্তরিত সময়কাল বিশ্লেষণে পাওয়া যায়, ১ থেকে ৫ বছরের মধ্যে ধর্মান্তরিত হয়েছে এমন অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ১ শতাংশ। ৫ থেকে ১০ বছরের মধ্যে ৭ শতাংশ এবং ১০ বছরের অধিক সময়ে ধর্মান্তরিত হয়েছেন ২১ শতাংশ অংশগ্রহণকারী। এ প্রশ্নে কোন উত্তর প্রদান করেনি ৭১ শতাংশ অংশগ্রহণকারী যা বুঝায় তারা ধর্মান্তরিত হয়নি (পরিশিষ্ট: সারণি- ৪৬)।

চিত্রলেখ ৮.৩৫ : পরিবারবর্গের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে ধর্মান্তরিত

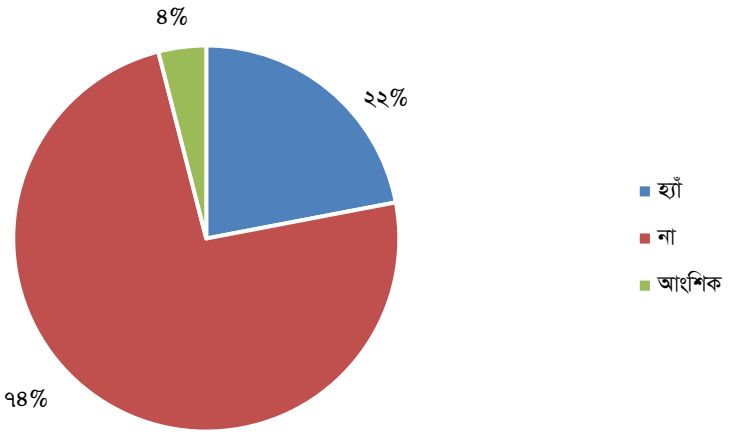

উৎস : গবেষকের জরিপ

অংশগ্রহণকারীরা পরিবারের সাথে সম্মিলিতভাবে ধর্মান্তরিত হয়েছে কি না সেটা বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২২ শতাংশ অংশগ্রহণকারী পরিবারের সাথে সম্মিলিতভাবে ধর্মান্তরিত হয়েছেন এবং ৪ শতাংশ আংশিকভাবে। ৭৪ শতাংশ অংশগ্রহণকারী সম্মিলিতভাবে ধর্মান্তরিত হয়নি বলে উত্তর প্রদান করেছেন (পরিশিষ্ট: সারণি- ৩৯)।

চিত্রলেখ ৮.৩৬ : ধর্মীয় প্রকারভেদে পরিবারবর্গের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে ধর্মান্তরিত

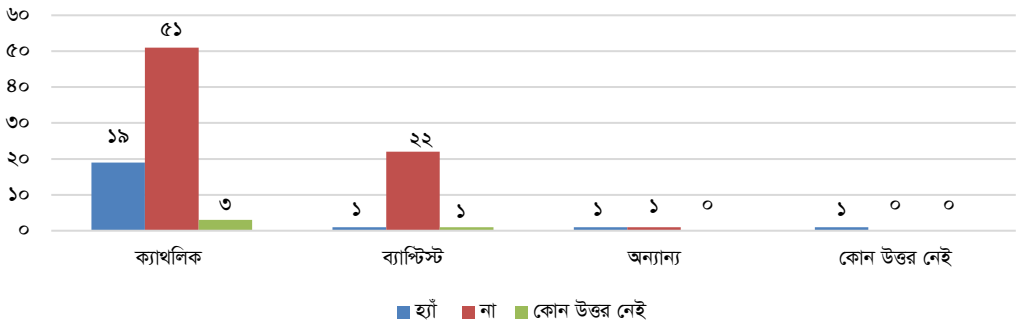

উৎস : গবেষকের জরিপ

পরিবারের সাথে সম্মিলিতভাবে ধর্মান্তরিতকে ধর্মীয় প্রকারভেদে বিশ্লেষণে পাওয়া যায়, ক্যাথলিকদের ১৯ শতাংশ অংশগ্রহণকারী পরিবারের সাথে সম্মিলিতভাবে ধর্মান্তরিত হয়েছেন এবং ব্যাপ্টিস্টদের ১ শতাংশ (পরিশিষ্ট: সারণি- ৬৫)।

চিত্রলেখ ৮.৩৭ : খ্রিষ্টধর্ম ও আচিক্ মান্দির মধ্যে দ্বন্দ্ব

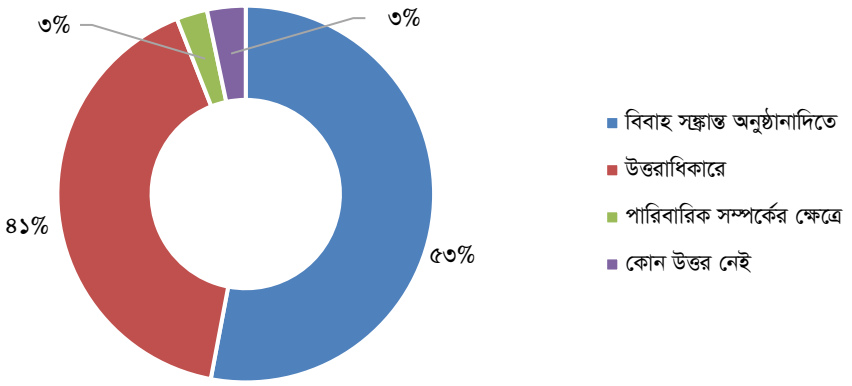

উৎস : গবেষকের জরিপ

খ্রিষ্টধর্ম এবং আচিক্ মান্দিদের মধ্যে পারিবারিক এবং উত্তরাধিকারে দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্কে দেখা যায়, বিবাহ সংক্রান্ত অনুষ্ঠানাদিতে ৫৩ শতাংশ দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক রয়েছে, ৪১ শতাংশ উত্তরাধিকারে, ৩ শতাংশ পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এবং কোন উত্তর প্রদান করেনি এমন অংশগ্রহণকারী রয়েছে ৩ শতাংশ (পরিশিষ্ট: সারণি- ৬৬)।

চিত্রলেখ ৮.৩৮ : ধর্মীয় প্রকারভেদে খ্রিষ্টধর্ম ও আচিক্ মান্দিদের মাঝে দ্বান্দ্বিকতা

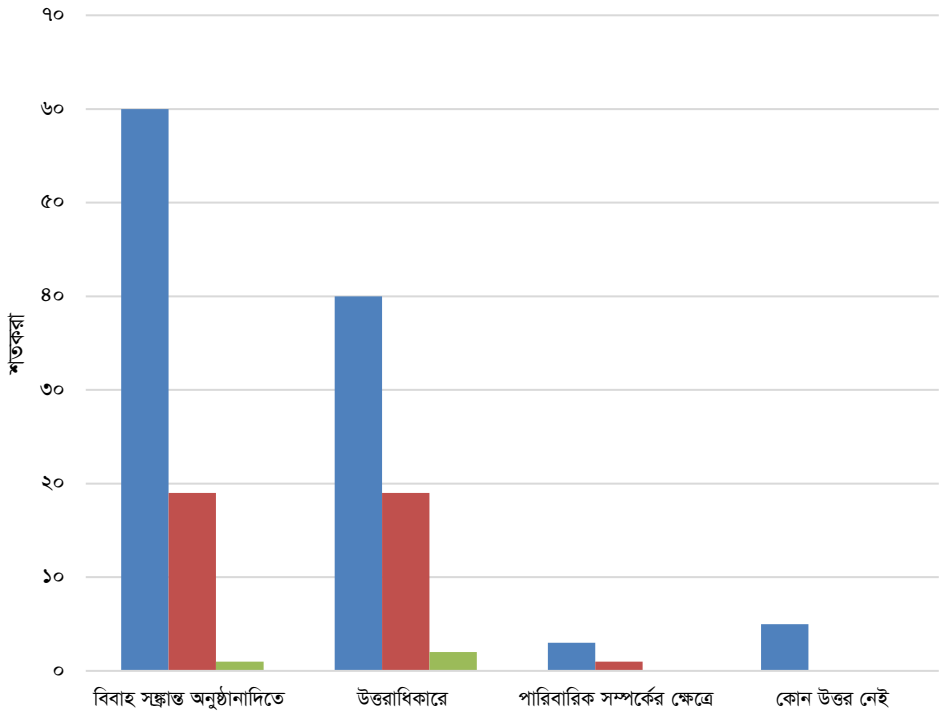

উৎস : গবেষকের জরিপ

খ্রিষ্টধর্ম এবং আচিক্ মান্দিদের মধ্যে পারিবারিক এবং উত্তরাধিকারে দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্ককে ধর্মীয় প্রকারভেদ ভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, বিবাহ সংক্রান্ত অনুষ্ঠানাদিতে ক্যথলিকদের মধ্যে ৬০ শতাংশ, ব্যাপ্টিস্ট ১৯ শতাংশ এবং অন্যান্য ধর্মে ১ শতাংশ দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক রয়েছে। উত্তরাধিকারে ক্যথলিকদের মধ্যে ৪০ শতাংশ, ব্যাপ্টিস্ট ১৯ শতাংশ এবং অন্যান্য ধর্মে ২ শতাংশ দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক বিরাজমান। পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ক্যথলিকদের মধ্যে ৩ শতাংশ, ব্যাপ্টিস্ট ১ শতাংশ এবং অন্যান্য কোন দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক নেই (পরিশিষ্ট: সারণি- ৬৭)।

৮.২। জনতাত্ত্বিক পরিলেখগুলোর সাথে আচিক্ মান্দিদের মধ্যে ধর্মীয় বিশ্বাস, আচার অনুষ্ঠান, বিবর্তন এবং উত্তরাধিকার প্রথার গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক নির্ণয় :

প্রাথমিক তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহকল্পে গবেষণায় অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের জনতাত্ত্বিক পরিলেখ (Demographic Profile) গুলোর সাথে আচিক্ মান্দিদের ধর্মীয় বিশ্বাস, আচার অনুষ্ঠান, ধর্মের বিবর্তন এবং উত্তরাধিকার প্রথার গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক নির্ণয় করার জন্য কাই-স্কয়ার (Chi-Square) পরীক্ষা ব্যবহার করা হয়েছে।

কাই-স্কয়ার পরীক্ষার মাধ্যমে বিশ্লেষণের জন্য সর্বপ্রথম এই মর্মে **প্রত্যাশিত ফলাফল** অনুমান করা হয়েছে যে **আচিক্ মান্দি গোষ্ঠীর বর্তমান ধর্মবিশ্বাস** (যথা: ধর্মীয় বিশ্বাসে ভিন্নতা), **আচিক্ মান্দিদের আচার অনুষ্ঠানে বিবর্তন** (যথা: দেব-দেবীর উপাসনা, পাদ্রিগণের নিষেধাজ্ঞা, দেব-দেবীর উপাসনাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা, আচার-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ, সামাজিক প্রথাসমূহে খ্রিষ্ট ধর্মীয় যাজকদের অংশগ্রহণ, প্রার্থনার জন্য সাপ্তাহিক সময় ব্যয়), **আচিক্ মান্দি পরিবার ও সমাজের বিবর্তন** (যথা: ধর্মের প্রয়োজনীয়তা, খ্রিষ্টধর্মের স্বীকৃতি ও ধর্মীয় দ্বন্দ্ব) এবং **আচিক্ মান্দিদের সমাজ ব্যবস্থায় উত্তরাধিকার প্রথার বিবর্তন** (যথা: মাতা-পিতা এবং প্রপিতামহগণের ধর্মীয় বিশ্বাস, পরিবারবর্গের সঙ্গে ধর্মান্তর ও ধর্মান্তরিতের সময়ব্যাপ্তি) -এর সাথে উত্তরদাতাদের জনতাত্ত্বিক পরিলেখের (যথা: জেন্ডার বা সামাজিক লিঙ্গ, বয়স এবং এলাকা) কোন অর্থবহ সম্পর্ক নেই। অতপর এই অনুমানের ভিত্তিতে সংগৃহীত তথ্য ও উপাত্ত ব্যবহার করে পর্যবেক্ষিত ফলাফলের তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণ করা হয়েছে যাতে করে প্রত্যাশিত ফলাফলের সাথে পর্যবেক্ষিত ফলাফলের পার্থক্য অর্থবহ ও তাৎপর্যপূর্ণ কিনা তা নির্ণয় করা যায় (Kothari, 2004 : 233)।

কাই-স্কয়ার পরীক্ষায় পর্যবেক্ষিত ফলাফল ও প্রত্যাশিত ফলাফলের মধ্যে কোন পার্থক্য না থাকলে Chi-Square (χ^2) -এর মান শূণ্য হয়। χ^2 -এর নির্ণিত মান যতই বৃদ্ধি পাবে প্রত্যাশিত ও পর্যবেক্ষিত মানের পার্থক্য ততই অর্থবহ হবে (Lind, Marchal, and Wathen, 2018 : 557)। পর্যবেক্ষিত মান প্রত্যাশিত মানের অনুরূপ হবে না। যদি Sig. value -এর মান .০৫ কিম্বা তার থেকে কম হয় তবেই পর্যবেক্ষিত ফলাফল অর্থবহ ও তাৎপর্যপূর্ণ হবে[১]। এই গবেয়ণায় কাই-স্কয়ার ভিত্তিক

[১] Since Chi-Square is testing the null hypothesis, the Sig value must be .05 or less for there to be a significant statistical for the relationship between the variables.

সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে Significance level ৫% ধরে ফলাফল পর্যালোচনা করা হয়েছে। তাই যে সকল ক্ষেত্রে Sig. value .০৫ এর সমান কিম্বা কম এসেছে সে সকল ক্ষেত্রেই পর্যবেক্ষিত ফলাফল অর্থবহ ও তাৎপর্যপূর্ণ পরিলক্ষিত হয়েছে।

আচিক্ মান্দিদের ধর্মের ধর্মীয় বিশ্বাস, আচার অনুষ্ঠান, বিবর্তন, এবং উত্তরাধিকার প্রথা ভিত্তিক কাই-স্কয়ার পলীক্ষার বিশ্লেষণ নিম্নে পর্যালোচনা করা হল:

৮.২.১। আচিক্ মান্দি গোষ্ঠীর বর্তমান ধর্মবিশ্বাস :

আচিক্ মান্দি গোষ্ঠীর বর্তমান ধর্মবিশ্বাস ভিত্তিক কাই-স্কয়ার পরীক্ষার ফলাফল নির্দেশ করে যে-

ধর্মীয় বিশ্বাসে ভিন্নতা: ধারণা ও নীতি-বিশ্বাসসমূহের বিপরীতে ধর্মীয় বিশ্বাসে ভিন্নতার ক্ষেত্রে জেন্ডার বা সামাজিক লিঙ্গ (পরিশিষ্ট: সারণি-০৭) ও বয়স (পরিশিষ্ট: সারণি-০৮) ভিত্তিক পর্যালোচনায় পর্যবেক্ষিত হয় যে সামাজিক লিঙ্গ ও বয়সের সাথে আচিক্ মান্দিদের ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিন্নতার সম্পর্ক তাৎপর্য বহন করে না; কেননা $\chi^2 =$ ১১.০৮৩ (Sig. = .৫২২) ও $\chi^2 =$ ২৯.১৫২ (Sig. = .২১৪)। পক্ষান্তরে এলাকার (পরিশিষ্ট: সারণি-০৯) সাথে আচিক্ মান্দিদের ধর্মী বিশ্বাসে ভিন্নতায় অর্থবহ সম্পর্ক পর্যবেক্ষিত হয়; কারণ $\chi^2 =$ ৯৪.৪৭৩ (Sig. = .০০০)।

৮.২.২। আচিক্ মান্দিদের আচার অনুষ্ঠানে বিবর্তনের স্বরূপ :

আচিক্ মান্দিদের আচার অনুষ্ঠানে বিবর্তন ভিত্তিক কাই-স্কয়ার পলীক্ষার ফলাফল নির্দেশ করে যে-

দেব-দেবীর উপাসনা: জেন্ডার বা সামাজিক লিঙ্গ (পরিশিষ্ট: সারণি-১০) ভিত্তিক পর্যালোচনায় পর্যবেক্ষিত হয় যে সামাজিক লিঙ্গের সাথে আচিক্ মান্দিদের ধর্ম দেব-দেবীর উপাসনা সম্পর্কিত; যেহেতু $\chi^2 =$ ৭.৪২২ (Sig. = .০২৪)। পক্ষান্তরে বয়স (পরিশিষ্ট: সারণি-১১) এবং এলাকা (পরিশিষ্ট: সারণি-১২) ভিত্তিক পর্যালোচনায় পর্যবেক্ষিত হয় যে আচিক্ মান্দিদের ধর্ম দেব-দেবীর উপাসনার সাথে সম্পর্কিত নয়; কারণ $\chi^2 =$ ২.৫৩০ (Sig. = .২৮২) এবং $\chi^2 =$ ৩.১৪০ (Sig. = .৫৩৫)।

পাদ্রিগণ কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা: আবার সামাজিক লিঙ্গ (পরিশিষ্ট: সারণি-১৩) ও বয়স (পরিশিষ্ট: সারণি-১৪) মোতাবেক পাদ্রিগণ কর্তৃক আচিক্ মান্দিদের সনাতনী ধর্মের রীতি-নীতি পালনের বিধি-নিষেধের সাথে সম্পর্কিত নয়; χ^2 = ৫.০৩৫ (Sig. = .২৮৪) এবং χ^2 = ৪.৯৯৬ (Sig. = .২৮৮)। কিন্তু এলাকার সাথে (পরিশিষ্ট: সারণি-১৫) রীতি-নীতি পালনের বিধি-নিষেধ সম্পর্কিত; যেমন χ^2 = ১৫.২১১ (Sig. = .০০৪)।

গির্জায় উপদেশবাণীতে দেব-দেবীর উপাসনাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা: সামাজিক লিঙ্গ (পরিশিষ্ট: সারণি-১৬), বয়স (পরিশিষ্ট: সারণি-১৭) ও এলাকা (পরিশিষ্ট: সারণি-১৮) সাথে গির্জার ধর্মীয় উপদেশবাণীর মধ্যে আচিক্ মান্দি ধর্মের দেব-দেবীর উপাসনাকে নিষিদ্ধ ঘোষণার এইমত প্রকাশের কোন সম্পর্ক পর্যবেক্ষিত হয়নি; যথা χ^2 = ৪.১২৭ (Sig. = .১২৭), χ^2 = ১.৩৪৯ (Sig. = .৮৫৩) এবং χ^2 = ৯.৩৯৮ (Sig. = .০৫২)।

আচার-অনুষ্ঠান পালন/ অংশগ্রহণ: সামাজিক লিঙ্গ (পরিশিষ্ট: সারণি-১৯), বয়স (পরিশিষ্ট: সারণি-২০) ও এলাকা (পরিশিষ্ট: সারণি-২১) ভিত্তিক অলোচনায় খ্রিষ্টান হিসেবে আচিক্ মান্দি আচার-অনুষ্ঠান পালনে/ অংশগ্রহণের কোন সম্পর্ক পর্যবেক্ষিত হয়নি; যেহেতু χ^2 = ৩.৭২৯ (Sig. = .১৫৫), χ^2 = ৮.০৮৬ (Sig. = .০৮৮) এবং χ^2 = ২.৭০২ (Sig. = .৬০৯)।

সামাজিক প্রথাসমূহে খ্রিষ্ট ধর্মীয় যাজকদের অংশগ্রহণ: সামাজিক লিঙ্গ (পরিশিষ্ট: সারণি-২২), বয়স (পরিশিষ্ট: সারণি-২৩) এবং এলাকা (পরিশিষ্ট: সারণি-২৪) ভিত্তিক পর্যালোচনা মোতাবেক আচিক্ মান্দিদের সামাজিক প্রথাসমূহে খ্রিষ্ট ধর্মীয় যাজকদের অংশগ্রহণের কোন সম্পর্ক পর্যবেক্ষিত হয়নি; কারণ স্বরূপ χ^2 = ১.৪৭৬ (Sig. = .৪৭৮), χ^2 = ৬.৯৬৮ (Sig. = .১৩৮) এবং χ^2 = ৩.৭২১ (Sig. = .৪৪৫) ।

প্রার্থনার জন্য সাপ্তাহিক সময় ব্যয়: কাই-স্কয়ার পলীক্ষার ফলাফল আরো নির্দেশ করে যে সামাজিক লিঙ্গ (পরিশিষ্ট: সারণি-২৫), বয়স (পরিশিষ্ট: সারণি-২৬) ও এলাকার (পরিশিষ্ট: সারণি-২৭) ভিত্তিক পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী হয়ে খ্রিষ্টধর্মের গির্জায় ধর্মীয় উপাসনায় প্রার্থনার জন্য সাপ্তাহিক সময় ব্যয় সম্পর্কিত নয়; χ^2 = ৫.৭২৩ (Sig. = .০৫৭), χ^2 = .৫০৭ (Sig. = .৯৭৩) এবং χ^2 = ৮.৩৩৯ (Sig. = .০৮০)।

৮.২.৩ ।আচিক্ মান্দি পরিবার ও সমাজের বিবর্তন :

আচিক্ মান্দি পরিবার ও সমাজের বিবর্তন ভিত্তিক কাই-স্কয়ার পরীক্ষার ফলাফল নিদের্শ করে যে-

ধর্মের প্রয়োজনীয়তা: এলাকা (পরিশিষ্ট: সারণি-৩০) ভিত্তিক পর্যালোচনায় আচিক্ মান্দিদের সমাজে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা পর্যবেক্ষিত হয়; অর্থাৎ χ^2 = ১৫.৭২৬ (Sig. = .০১৫)। পক্ষান্তরে জেন্ডার বা সামাজিক লিঙ্গ (পরিশিষ্ট: সারণি-২৮) এবং বয়সের (পরিশিষ্ট: সারণি-২৯) সাথে আচিক্ মান্দিদের সমাজে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত নয়; যেহেতু χ^2 = ৫.০৮৫ (Sig. = .১৬৬) এবং χ^2 = ৫.৫৪৩ (Sig. = .৪৭৬)।

খ্রিষ্টধর্মের স্বীকৃতি: সামাজিক লিঙ্গ (পরিশিষ্ট: সারণি-৩২), বয়স (পরিশিষ্ট: সারণি-৩৩) এবং এলাকার (পরিশিষ্ট: সারণি-৩৪) সাথে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে খ্রিষ্টধর্মের স্বীকৃতির কোন সম্পৃক্ততা পাওয়া যায়নি যেহেতু χ^2 = ১.৮৮১ (Sig. = .৩৯১), χ^2 = ৬.৩০১ (Sig. = .৯০০) এবং χ^2 = ৪.০৪১ (Sig. = .৪০১)।

ধর্মীয় দ্বন্দ্ব: সামাজিক লিঙ্গ ও বয়স ভিত্তিক পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে খ্রিষ্টধর্ম ও আচিক্ মান্দি ধর্মের মধ্যকার দ্বন্দ্বমূলক বিষয় সামাজিক লিঙ্গ (পরিশিষ্ট: সারণি-৩৬) ও বয়সের (পরিশিষ্ট: সারণি-৩৭) সাথে সম্পর্কিত নয় কেননা χ^2 = ১৪.৭৭৭ (Sig. = .১৪০) ও χ^2 = ২৪.৩৬৮ (Sig. = .২২৭)। কিন্তু খ্রিষ্টধর্ম ও আচিক্ মান্দি ধর্মের মধ্যকার দ্বন্দ্বমূলক বিষয় এলাকার (পরিশিষ্ট: সারণি-৩৮) সাথে সম্পর্কিত; অর্থাৎ χ^2 = ৩৯.২৭৩ (Sig. = .০০৬)।

৮.২.৪ ।আচিক্ মান্দিদের সমাজ ব্যবস্থায় উত্তরাধিকার প্রথার বিবর্তন :

উত্তরাধিকার ভিত্তিক কাই-স্কয়ার পরীক্ষার ফলাফল নিদের্শ করে যে-

মাতা-পিতা এবং প্রপিতামহগণের ধর্মীয় বিশ্বাস: সামাজিক লিঙ্গ (পরিশিষ্ট: সারণি-৪০) ও এলাকা (পরিশিষ্ট: সারণি-৪২) ভিত্তিক পর্যালোচনায় পর্যবেক্ষিত হয় যে আচিক্ মান্দিদের মাতাসহ মাতামহী, পিতাসহ পিতামহীর খ্রিষ্টধর্ম বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত নয়; যেহেতু χ^2 = ২.৯২১ (Sig. = .২৩২) ও χ^2

= ৭.৪৩৪ (Sig. = .১১৫)। তবে বয়সের (পরিশিষ্ট: সারণি-৪১) সাথে সম্পর্ক পাওয়া যায় χ^2 = ৪৬.১৫৩ (Sig. = .০০০) ।

পরিবারবর্গের সঙ্গে ধর্মান্তর: সামাজিক লিঙ্গ (পরিশিষ্ট: সারণি-৪৩) ও বয়সের (পরিশিষ্ট: সারণি-৪৪) পর্যবেক্ষণ মোতাবেক পরিবারের সাথে সম্মিলিতভাবে ধর্মান্তর সম্পর্কিত নয়; কারণ χ^2 = .৭৫০ (Sig. = .৬৮৭) ও χ^2 = ৬.৩৪০ (Sig. = .১৭৫)। বরং এলাকার (পরিশিষ্ট: সারণি-৪৫) সাথে সম্মিলিতভাবে ধর্মান্তরের সম্পর্ক দেখা যায় χ^2 = ১৫.৪২২ (Sig. = .০০৪)।

ধর্মান্তরিতের সময়ব্যাপ্তি: যখন মাতা-পিতা এবং প্রপিতামহগণ খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী নয় তখন ধর্মান্তরিত হবার সময়ব্যাপ্তির সাথে সামাজিক লিঙ্গ (পরিশিষ্ট: সারণি-৪৭) ভিত্তিক আলোচনায় কোন সম্পর্ক পর্যবেক্ষিত হয়নি; কেননা χ^2 = ৭.৬০২ (Sig. = .০৫৫)। অপরপক্ষে বয়স (পরিশিষ্ট: সারণি-৪৮) ও এলাকার (পরিশিষ্ট: সারণি-৪৯) সাথে সম্পর্ক পাওয়া যায় যেহেতু χ^2 = ৩৮.৫৪৯ (Sig. = .০০০) ও χ^2 = ২৮.৭৩৪ (Sig. = .০০০)।

উপরোক্ত কাই-স্কয়ার বিশ্লেষণে যেসকল ক্ষেত্রে জনতাত্ত্বিক পরিলেখ গুলোর সাথে আচিক্ মান্দিদের ধর্মীয় বিকাশ ও সমাজের বিবর্তনের সম্পর্ক পরিসংখ্যানগত ভাবে অর্থবহ ও তাৎপর্যপূর্ণ পরিলক্ষিত হয়েছে তা নিম্ন উল্লেখ করা হল:

১. এলাকার সাথে আচিক্ মান্দিদের ধর্মীয় বিশ্বাসে ভিন্নতা সম্পর্কিত।
২. সামাজিক লিঙ্গের সাথে আচিক্ মান্দিদের ধর্ম দেব-দেবীর উপাসনা সম্পর্কিত।
৩. এলাকার সাথে পাদ্রিগণ কর্তৃক আচিক্ মান্দিদের সনাতনী ধর্মের রীতি-নীতি পালনের বিধি-নিষেধ সম্পর্কিত।
৪. এলাকার সাথে আচিক্ মান্দিদের সমাজে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত।
৫. বয়সের সাথে আচিক্ মান্দিদের মাতাসহ মাতামহী, পিতাসহ পিতামহীর খ্রিষ্টধর্ম বিশ্বাস সম্পর্কিত।
৬. এলাকার সাথে খ্রিষ্টধর্ম ও আচিক্ মান্দি ধর্মের মধ্যকার দ্বন্দ্বমূলক বিষয় সম্পর্কিত।
৭. এলাকরা সাথে সম্মিলিতভাবে ধর্মান্তর সম্পর্কিত।
৮. বয়সের সাথে ধর্মান্তরিত হবার সময়ব্যাপ্তি (যখন মাতা-পিতা এবং প্রপিতামহগণ খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী নয়) সম্পর্কিত।
৯. এলাকার সাথে ধর্মান্তরিত হবার সময়ব্যাপ্তি (যখন মাতা-পিতা এবং প্রপিতামহগণ খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী নয়) সম্পর্কিত।

৯.১। উপসংহার :

সিনক্রেটিজমের অনুশীলন তথা গবেষণাকে দু'টি মাত্রায় বিবেচনা করা যায়। প্রথমত: এর মাধ্যমে সমকালীন সমাজ বা গোষ্ঠীর মধ্যে ধর্মীয় প্রবণতার তীব্রতা হ্রাস এবং দ্বিতীয়ত: গতানুগতিক গির্জা বা উপসনালয়ের সঙ্গে এর বিভিন্নমুখী পার্থক্য থাকার কারণে ধর্মীয় বহুমাত্রিকতার সৃষ্টি। এই উভয় মাত্রার ভিত্তিতে সিনক্রেটিজমের প্রকৃতি নির্ধারণের জন্য ধর্মের যে উপাদানসমূহ ব্যবহার করা প্রয়োজন তা হচ্ছে: প্রথমত, বিশ্বাস বা অতিন্দ্রিয় অস্তিত্বের ধারণা। দ্বিতীয়টি হচ্ছে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান যা সাধারণত গির্জা ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে পরিলক্ষিত হয়। তৃতীয়ত, নৈতিকতা বা সামাজিকতা সম্পর্কিত বিধি-বিধান যা অনেক ক্ষেত্রেই গতানুগতিক ধারার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে থাকে এবং সর্বশেষ আধ্যাত্মিক কর্মকাণ্ড ব্যাখ্যা যা মূল খ্রিষ্টধর্মের সঙ্গে সাংসারেক ধর্মের যোগাযোগ সৃষ্টি করে। আচিক্ মান্দি বা গারো সম্প্রদায়ের এই সিনক্রেটিক প্রবণতার বিশ্লেষণের জন্য তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে এই চারটি উপাদান গুরুত্বসহকারে এই গবেষণায় বিবেচিত হয়েছে। বিশেষ করে বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠান এই দু'য়ের পার্থক্যকে যথাযথভাবে উদঘাটনের ব্যবস্থা গ্রহণ অতীব প্রয়োজনীয় বলে মনে করা হয়েছে। তাই যেসব ক্ষেত্রে এই সিনক্রেটিক প্রবণতা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় তাকে পরিচ্ছন্নভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।

বিশ্বাস: আচিক্ মান্দিদের ধর্মান্তরের সাথে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তাদের একটি বড় পরিবর্তন এসেছে। ধর্মদার্শনিকরা ধর্মের বিবর্তনের ক্ষেত্রে কয়েকটি ধাপ চিহ্নিত করেছেন। ধর্মদার্শনিকদের মতে, প্রাথমিক পর্যায়ে মানুষের ধর্মবিশ্বাস ছিল উপজাতীয় ধর্ম (Tribal Religion)। এই আদিম পর্যায়ে বিমূর্ত সত্তার ধারণা তো বটেই কোন একেশ্বরের ধারণা থাকারও প্রশ্ন ওঠে না। এক্ষেত্রে দার্শনিক ব্রাইটম্যান (Brightman, 1940) -এর মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য[১]।

ধর্মের ঐতিহাসিক বিবর্তনে উপজাতীয় ধর্মের পরের পর্যায় হল জাতীয় ধর্ম যেখানে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ্যণীয়: (ক) বিশেষ জাতি কেন্দ্রিক, (খ) সামাজিক প্রতিষ্ঠান, (গ) মঠ ও উপসনালয়,

[১] ...the aim of religious practices was not the achievement of some noble ideal, or the discovery of the divine will, but rather the preservation of the traditions and the identity of the tribe or clan in its struggle for survival as well as in its conflicts against other tribes. Save for totemism and for traces of the high "god", there was hardly a glimmer of an intertribal religious consciousness.

(ঘ) আচার-অনুষ্ঠান ও জীবিত প্রাণী উৎসর্গ, (ঙ) ধর্মগ্রন্থ, (চ) সামাজিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতা, (ছ) আত্মার অস্তিত্ব ও আত্মার অমরত্ব এবং (জ) বহুঈশ্বরে বিশ্বাস (Brightman, 1940 : 47)।

তবে ধর্মের বিবর্তনের চরম পর্যায় হল ইউনিভার্সালধর্ম বা বিশ্বধর্ম। এখানে যে বৈশিষ্ট্যগুলো দেখা যায় সেগুলো হচ্ছে: (ক) ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত পুরুষ, (খ) সর্বজনীন, (গ) ব্যক্তিগত, (ঘ) নৈতিক, (ঙ) বৌদ্ধিক, (চ) মরমীবাদী এবং (ছ) একেশ্বরবাদী (Brightman, 1940 : 57-63)। খ্রিষ্টধর্ম বর্তমান বিশ্বে অন্যতম প্রধান ইউনিভার্সালধর্ম। স্বভাবতই উপজাতীয় ধর্মবিশ্বাস থেকে খ্রিষ্টধর্মের মৌলিক ধারণাগুলো অনেক জটিল। দার্শনিকরা মনে করেন, একেশ্বরবাদ ও বিমূর্ত সত্তার ধারণা মানুষের চিন্তা চেতনা বিকাশের সর্বোচ্চ পর্যায়।

প্রাথমিক পর্যায়ের ধর্মান্তরিত গারোদের পক্ষে এমন বিমূর্ত একেশ্বরের ধারণা অনুধাবন করা সহজসাধ্য ছিল না নিঃসন্দেহে। এছাড়াও সাংসারেক ধর্মে পৃথিবী সৃষ্টি সম্পর্কে পৌরাণিক কিছু কাহিনী থাকলেও মৃত্যু পরবর্তী জীবন ও স্বর্গ-নরক সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট নয়। ইউনিভার্সাল ধর্ম হিসেবে খ্রিষ্টধর্মে সমগ্র বিশ্বমানবতার যে কল্যাণের বাণী এসেছে তা যেকোন উপজাতীয় ধর্মে অনুপস্থিত। সময়ের পরিবর্তনের সাথে আধুনিক যুগে খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী গারোরা খ্রিষ্টধর্মের অনেক ধারণা অনুধাবন করতে পারলেও শিক্ষিত গারোরা ছাড়া অন্যান্যরা খ্রিষ্টধর্মের বিশ্বভ্রাতৃত্বের ধারণা কতটা অনুধাবন করতে পেরেছে তা প্রশ্নসাপেক্ষ।

গারোদের সাংসারেক ধর্ম ছিল পৌরাণিক কাহিনী নির্ভর। আধুনিক শিক্ষিত গারোরা এগুলোতে বিশ্বাস না করলেও এগুলো তাদের ঐতিহ্যের পরিচায়ক বলে মনে করেন। তবে প্রত্যন্ত অঞ্চলে এখনও পূর্ববর্তী বিশ্বাসের অনেক কিছু লক্ষ্য করা যায়। সালসেং প্রণব রাংসা (Rangsa, 2006 : 291-292) এ ধরণের কিছু পূজার (আ'মোয়া ক্রীতা) বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর ভাষায়:

> *''আমি ১৯৭৮ ও ১৯৭৯ সালে পীরগাছা গ্রামের মতি মণ্ডল মৃ এর বাড়িতে থাকতাম। ঐ দু'বছরই তাঁর বাড়িতে তাতারা-রাবুগার উদ্দেশ্যে অ'মোয়া অনুষ্ঠান সম্পাদন হয় এবং আমি তা স্বচক্ষে দেখার সুযোগ পেয়েছি। ১৯৭৮ সালে রেণু নকরেক এর জন্য এবং ১৯৭৯ সালে মতি মণ্ডলের দ্বিতীয়া স্ত্রীর জন্য আ'মোয়া অনুষ্ঠান করা হয়। রেণু নকরেক প্রায় ৩০ বছরের একজন বয়স্কা মহিলা এবং মতি মণ্ডলের কন্যা সম্পর্কীয় আত্মীয়। যেহেতু তাঁরা খ্রিষ্টান এবং তাদের বাড়িতে আ'মোয়া করা যায় না, কাজেই মতি মণ্ডলের বাড়িতে আ'মোয়ার ব্যবস্থা করা হয়।*

মীর্জাপুর হাসপাতাল ও জলছত্র হাসপাতালের ডাক্তারদের কাছে অনেকদিন চিকিৎসা করার পরেও উন্নতি কিছুই হয়নি। অনেক টাকা পয়সা খরচ করার পরেও রোগীর অবস্থা দিন দিন আরও অবনতির দিকে যাচ্ছিল। তখন গ্রামের প্রাচীন লোকেরা বললেন, 'ডালগিবা চিকগিংআ', অর্থাৎ প্রধান দেবতার কুনজর পড়েছে। এখানে ডালগিবা বলতে তাতারা-রাবুগাকে বুঝানো হয়েছে। আবিমায় তাতারা-রাবুগাকে ডালগিবা-কুসুমাংও বলা হয়ে থাকে। ঘটনাচক্রে মতি মণ্ডলের দ্বিতীয় স্ত্রী এবং রেণু নকরেক উভয়ই আ'মোয়ার পরে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠে। এই ঘটনা স্বচক্ষে দেখার পর অনেক খ্রিষ্টান গারোই এখন 'তাতারা-রাবুগা'র আ'মোয়া করে থাকে। গারোরা বিশ্বাস করে, এই আ'মোয়ার সময় একবার 'ঘোরি-রওয়া ও 'গ্রিকআ' নাচ পরিবেশন করা হলে প্রত্যেক বারই তা পালন করতে হয়। তাই অনেকে বিশেষ করে খ্রিষ্টান গারোরা 'ঘোরি-রওয়া' ও গ্রিকআ' বাদ দিয়ে 'তাতারা-রাবুগা'র আ'মোয়া করে থাকে। জলছত্র মিশনের পালক পুরোহিত রেভাঃ ফাদার হোমারিক সি.এস.সি. -কে এই ব্যাপারে যখন আমি প্রশ্ন করি তখন তিনি উত্তরে বলেছেন, এটা হলো গারোদের বিশ্বাসের 'হাইব্রিড'।"

গ্রামাঞ্চলের গারোরা মানাতেও বিশ্বাস করে। নেত্রকোণায় দূর্গাপুরে বিরিশিরি এলাকাতেও তাদের মানা বিশ্বাসের কিছু দৃষ্টান্ত মেলে। তাদের মতে স্থানীয় চিগাস্থান, আইত পাড়াতে হিরা-কুচ্ছুনি, হাসং-মিদ্দি প্রভৃতি অশরীরী শক্তির অবস্থান লক্ষ্য করা যায় (Hasan, 1978 : 43)।

আচার-অনুষ্ঠান ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ড: খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণের সাথে সাথে গারোদের পুরোনো সাংসারেক ধর্মের অনেক আচার-অনুষ্ঠান ও রীতিনীতিই তারা পরিত্যাগ করেছে। তবে অন্যান্য অনেক উৎসব ও অনুষ্ঠান পালিত না হলেও ওয়ানগালা উৎসবটি এখনও ভিন্নভাবে হলেও উদ্‌যাপিত হয় (পরিশিষ্ট: চিত্র ৮)। খ্রিষ্টিয় উৎসব ও পার্বণ এখন পূর্বেকার গারোদের উৎসব পার্বণাদির স্থান অধিকার করেছে। বড়দিনে গারোরা সকলেই গির্জা ঘরে সম্মিলিত উপাসনা করে, পূর্বরাত্রে কোন কোন গির্জায় মধ্যরাত্রির উপাসনা হয় এবং পরবর্তী সারা রাত্রি খোল করতালসহ ঘরে ঘরে কীর্তন হয়। এরপর সমস্ত গারো খ্রিষ্টানদের জন্য বাৎসরিক ধর্মীয় সম্মিলন হয়, বিপুল উৎসাহ আনন্দ ও উদ্দীপনা নিয়ে বিভিন্ন দূরবর্তী অঞ্চলবাসী গারোরা এই সম্মিলনীতে যোগদান করে থাকে।

তবে খ্রিষ্টধর্ম তাদের মাতৃতান্ত্রিক সমাজের মৌলিক বৈশিষ্ট্যের কোন পরিবর্তন আনতে পারেনি। তাদের সংস্কৃতির অনেকগুলো বিষয় আছে যা তাদের নতুন ধর্মের মাধ্যমে সামান্যই প্রভাবিত হয়েছে। পরিবার এবং গোত্র সম্পর্ক এবং এ সংক্রান্ত সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান পালনের

ক্ষেত্রে খ্রিষ্টধর্মের প্রভাব সামান্যই (Burling, 1997 : 188)। উত্তরাধিকার সূত্র এখনও নারীদের মাধ্যমে নির্ধারিত হয় এবং সম্পত্তি মায়ের কাছে থেকে কন্যার কাছে হস্তান্তরিত হয়। শিশুরা তাদের মায়ের পদবী গ্রহণ করে এবং নিজেদের মায়ের মাহারীর (kinship group) বলেই পরিচয় দেয়। জ্ঞাতি সম্পর্ক রক্ষার মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা এখনও অনুসরণ করা হয়। এক্ষেত্রে নৃবিজ্ঞানী কিবরিয়াউল খালেক (Khaleque, 1984 : 233) -এর বক্তব্যটি স্মরণ করা যেতে পারে[২]।

নৈতিকতা: গারো সমাজে চাকমা সমাজের মতো কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অস্তিত্ব কখনই ছিল না। তাদের রাষ্ট্র বা সরকার লিখিত আইন ও বিধি ব্যবস্থা, সুগঠিত বিচার প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি কোন কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। তা সত্ত্বেও তাদের সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় ছিল। ব্রিটিশ শাসকরা ১৭৯০ সাল থেকে চেষ্টা চালিয়ে ১৮৭২-৭৩ খ্রিষ্টাব্দে এর দিকে গারোদের শাসনের আওতায় আনতে সক্ষম হয়। (Bonnerjea, 1929 : 121) যে কার্যকরী শক্তি তাদের সমাজকে নিয়ন্ত্রিত রাখতো তা হচ্ছে জনমত। ব্রাউন (Radcliffe Brown) বলেন, ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে আধুনিক শাস্তির ব্যবস্থা ছিল না দুটি কারণে: (১) নৈতিক বল প্রয়োগ বা বাধ্যবাধকতার বিধান, এবং (২) ধর্মীয় অতি-প্রাকৃত শক্তির বিধান (Radcliffe-Brown, 1940 : xi-xxiii) ।

গারো সমাজে বিচার অনুষ্ঠানগুলো সাধারণত অন্যায়কারী ও অন্যায়ের শিকার উভয় দলের মাহারীর লোকেরা আয়োজন করতো যে কোন মাহারীর সদস্য দোষী সাব্যস্ত হলে তা গোটা মাহারীর অন্যায় বলে গণ্য হতো এবং জরিমানার টাকা দেওয়ার দায়িত্ব থাকতো মাহারীর উপর। মাহারীর যে কোন সদস্য অন্যায় করলে মাহারীর সম্মান নষ্ট হবে এ ভয়ে প্রত্যেক মাহারীরই নিজ সদস্যদের নৈতিকভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখতে চেষ্টা করতো। গারো সমাজ ধর্মান্তর ও কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে এসে অনেক পরিবর্তন হলেও তাদের সমাজে নৈতিক শৃঙ্খলা রক্ষায় তাদের ঐতিহ্যবাহী প্রথা-পদ্ধতিসমূহ এবং 'জনমত' আজও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

আধ্যাত্মিকতা: আচিক্ মান্দিদের সাংসারেক ধর্মে মৃত্যু পরবর্তী জীবন বা স্বর্গ-নরক সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ধারণা নেই। তারা জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করে। মৃত্যুর পরে আত্মা প্রথমে চিকমাং বা 'কৈলাশ' পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করে। তাদের বিশ্বাস ছিল সেখানে রাক্ষস নাওয়াং মৃতব্যক্তির জন্য অপেক্ষা

[২] "Christianity has changed the religion of Garos and obviously there have been changes in the outlook of people; Christianity never touched fundamental structures of the society, tather it allowed them to remain in its original form. Thus, matriliny is approved by the Christianity."

করে। মৃত ব্যক্তির আত্মাকে শক্তিশালী করার জন্য পূর্বে তারা গরু বা কোন জীব উৎসর্গ করতো এ বিশ্বাস থেকেই। বর্তমান মান্দিদের মধ্যে নাওয়াং রাক্ষসের বিশ্বাস নেই বললেই চলে। তবে ওয়ানগালা উৎসবের প্রারম্ভে এখনও গরু বলি দেওয়া হয়। খ্রিষ্টধর্মের অধিবিদ্যক ধারণা অন্যান্য আধুনিক ধর্মের মতই স্পষ্ট। তবে এর পাশাপাশি বিভিন্ন অশরীরী আত্মা, পূর্বপুরুষের আত্মা এবং ক্ষতিকর মিতে সম্পর্কিত বিশ্বাস গারোদের মধ্যে এখনও লক্ষ্য করা যায়।

আচিক্ মান্দি ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে সিনক্রেটিজমের যে ধারণা পরিলক্ষিত হয় তার সারকথা নিম্নে প্রকাশ করা হল:

১। বাংলাদেশের মান্দি জনগোষ্ঠীর অনেকেই কয়েকপুরুষ ধরে খ্রিষ্টধর্ম অনুসরণ করে আসছে। বংশপরম্পরায় খ্রিষ্টধর্ম পালন করায় খ্রিষ্টধর্মের মৌলিক শিক্ষাগুলো প্রায় সকলেই শিশুকাল থেকে পেয়ে আসছে।

২। খ্রিষ্টধর্মের মৌলিক বিষয়ে আধুনিক মান্দি সমাজের অধিকাংশ খ্রিষ্টধর্মানুসারীর ধারণার সাথে বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর খ্রিষ্টধর্মানুসারীর ধারণা খুব বেশি ভিন্ন নয়। কেননা অনেক সময়ই তারা একই চার্চে একসাথে উপাসনা করছে এবং একই ধর্মযাজকের বক্তৃতা একসাথে শুনছে। তবে শহরাঞ্চলের সাথে গ্রামাঞ্চলের মান্দিদের বিশ্বাসের ও ধর্মীয় ধারণার কিছুটা ভিন্নতা লক্ষণীয়।

৩। খ্রিষ্ট ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠান পালনের ক্ষেত্রে মান্দি গোষ্ঠীর স্বকীয়তা স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। গ্রামে বা শহরে যে কোন ধর্মীয় উৎসব তারা তাদের গোষ্ঠীর সদস্যদের সাথে একসাথে পালন করতে চায়। বড়দিনের পূর্বে একারণে ঢাকার মান্দিরা প্রায় সকলেই নিজ এলাকায় ফিরে যায়। আবার আধুনিক ঢাকার মান্দিরা ঢাকায় তাদের বন্ধু ও সহকর্মী মান্দিদের সাথে একসাথে উৎযাপনের জন্য 'প্রাক-বড়দিন' উৎসব আয়োজন করে।

৪। খ্রিষ্ট ধর্মীয় উৎসবে তাদের নিজস্ব বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার, ঐতিহ্যবাহী নাচ ও গানের অনুষ্ঠান তাদের আরেকটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। অবশ্য এক্ষেত্রে শহর ও গ্রামের মান্দি এলাকার মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট। গ্রামাঞ্চলে সাধারণত: ঢোল-করতালসহ নাচ-গানের মাধ্যমে ধর্মীয় উৎসব

পালিত হয়। শহরের অনুষ্ঠানে ঐতিহ্যবাহী নাচ, গান, বাদ্যযন্ত্রের সাথে আধুনিক বাদ্যযন্ত্রও ব্যবহৃত হয়।

৫। ঢাকার মান্দিরা এখানে স্থায়ী বা অস্থায়ী বাসিন্দা যাই হোক তাদের গোষ্ঠীর সব সদস্যরা একে অপরের সাথে সব সময়েই যোগাযোগ রাখে। উৎসবে একে অপরের সাথে আনন্দ ভাগাভাগি করে নেয় (পরিশিষ্ট: চিত্র ৯)।

৬। আধুনিককালে মান্দিদের অতীতের অধিকাংশ উৎসব পালিত না হলেও ওয়ানগালা ভিন্নভাবে হলেও পালিত হয় (পরিশিষ্ট: চিত্র ১০)। হয়তো একারণে মান্দি জনগোষ্ঠীর অনেকেই তাদের ঐতিহ্যবাহী অন্যান্য অনুষ্ঠান সম্পর্কে না জানলেও ওয়ানগালা উৎসবের সম্পর্কে জানে। ওয়ানগালা উৎসবে চার্চে যে প্রার্থনা ও অনুষ্ঠান হয় তা খ্রিষ্টিয় ধর্মযাজক পরিচালনা করেন। তবে আধুনিককালে কোন কোন খ্রিষ্টধর্ম যাজক তাদের ওয়ানগালা উৎসবের নাচ ও অন্যান্য ঐতিহ্যবাহী নাচ-গান সংরক্ষণ জরুরী মনে করেন (পরিশিষ্ট: চিত্র ১১)।

৭। তাদের অতীতের ধর্ম ও সমাজে নৈতিকতাবোধ অত্যন্ত গুরুত্বর্পূণ স্থান অধিকার করে ছিল। ঐতিহ্যগতভাবে তারা সৎ ও সত্যবাদী, বিশ্বস্ত, অপরের জিনিস চুরি করা তাদের নীতিরিরুদ্ধ, তারা পরোপকারী, অন্যকে সাহায্য করতে আন্তরিক এবং সর্বোপরি তারা নারীদের সম্মানের চোখে দেখে। এসব নৈতিক ধারণা তারা বংশানুক্রমে বহুকাল কাল ধরে তাদের ধর্ম ও সমাজ থেকে অর্জন করছে। এর অনেক ধারণাই খ্রিষ্টধর্মের সাথে মিলে যায়। একথা নি:সন্দেহে বলা যায়, আধুনিককালের মান্দি জনগোষ্ঠীর সদস্যদেরও নৈতিকতাবোধ প্রবল। হয়তো এক্ষেত্রে তাদের অতীতের সমাজব্যবস্থা ও আধুনিক খ্রিষ্টধর্ম বিশ্বাস দুটিরই অবদান আছে।

৮। আধুনিক খ্রিষ্টধর্মানুসারী মান্দিরা খ্রিষ্টধর্মের অধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভ করছে এবং এই শিক্ষা অনুযায়ী ঈশ্বেরের স্বরূপ সম্পর্কিত ধারণা, ঈশ্বর কর্তৃক জগৎ সৃষ্টি, মানুষের মৃত্যু-পরবর্তী জীবন, মানবাত্মা ও শয়তানের স্বরূপ, মানবজীবনের লক্ষ্য প্রভৃতি বিভিন্ন অধ্যাত্মিক এবং অধিবিদ্যক ধারণা তারা লাভ করছে। তবে এক্ষেত্রেও শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চলের মান্দিদের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য দেখা যায়। গ্রামাঞ্চলের কোন কোন এলাকায় বিভিন্ন অশরীরী সত্ত্বা এবং মানুষের জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের কুপ্রভাব সম্পর্কে ধারণা লক্ষ্য

করা যায়। অসুখ-বিসুখের কারণও অনেক সময় কোন অশরীরী সত্ত্বার অসন্তুষ্টি বা কুদৃষ্টি বলে মনে করা হয় এবং সে অনুযায়ী পূজা আয়োজনের মাধ্যমে নিরাময়ের ব্যবস্থা করা হয়।

৯। ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাসী মান্দিরা মদ্যপান করে থাকে এবং চুঁ বা পঁচুই পান এখনও তাদের গোষ্ঠীর একটি বৈশিষ্ট্য। এছাড়া বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে তারা বৃহত্তর বাঙালী জনগোষ্টীর বিভিন্ন খাদ্যের পাশাপাশি তাদের ঐতিহ্যবাহী খাদ্যসামগ্রী দিয়ে উৎযাপন করে।

১০। খ্রিষ্টধর্ম অনুসরণের পরও তাদের সংস্কৃতির অন্যান্য দিকের তুলনায় তাদের মাতৃতান্ত্রিক প্রথার পরিবর্তন এসেছে সবচেয়ে কম। এখনও তারা মায়ের ধারায় বংশ গণণা করে। তবে অত্যন্ত সীমিত সংখ্যায় হলেও মিশ্রবিবাহের প্রভাব তাদের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। সংখ্যায় কম হলেও মান্দি জনগোষ্ঠীর যারা হিন্দু বা মুসলমানদের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে তারা সেই ধর্মের রীতি অনুসরণ করেছে। আবার আধুনিক খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী মান্দি জনগোষ্ঠীর কেউ কেউ মনে করেন মাতৃতান্ত্রিক প্রথার পরিবর্তন প্রয়োজন।

১১। বর্তমানে বাংলাদেশের মান্দি জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই খ্রিষ্টধর্মের অনুসারী হলেও সবাই একই ডিনোমিনেশন বা খ্রিষ্টধর্মের একই শ্রেনির অনুসারী নয়। বর্তমান গবেষণার সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ক্যাথলিক ধর্মে অনুসারীদের সংখ্যা সর্বোচ্চ। বিশ্লেষণে আরো দেখা যায়, কোন এলাকায় ক্যাথলিক ধর্মের অনুসারী বেশী বা সকলই ক্যাথলিক ধর্মের অনুসারী, কোন কোন এলাকায় ব্যাপ্টিস্ট ধর্মের অনুসারী বেশী এবং কোন এলাকায় খ্রিষ্টধর্মের অন্য কোন শাখার অনুসারী বেশী।

১২। কোন কোন এলাকার পাদ্রিগণ মনে করেন আচিক্ মান্দিদের সনাতনী ধর্মের রীতি-নীতি পালন করা খ্রিষ্টধর্মের মৌলিক নীতি বিরুদ্ধ আবার কোন কোন এলাকার পাদ্রিগণ মনে করেন আচিক্ মান্দিদের সনাতনী ধর্মের রীতি-নীতি পালন করেও খ্রিষ্টধর্ম অনুসরণ সম্ভব।

১৩। আচিক্ মান্দিদের ধর্মান্তরের ক্ষেত্রে আরো একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, কখনও তাদের গোষ্ঠীর সদস্যরা একাকী ধর্মান্তরিত হয়েছে কখনও পরিবারের সাথে আবার কখনও গ্রামের সকলে একসাথে একত্রে ধর্মান্তারিত হয়েছে। সাধারণত: কোন গ্রামের গ্রাম প্রধান বা নকমা খ্রিষ্টধর্মে

ধর্মান্তরিত হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে এধরনের দলবদ্ধভাবে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হবার দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যায়।

১৪। আচিক্ মান্দিরা প্রায় দেড়শ বছর আগে থেকে খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত হতে শুরু করলেও সাম্প্রতিককালে তাদের খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তরের হার অতীতের চেয়ে অনেক বেশি। স্বভাবতই যারা অল্পবয়স্ক বা তরুণ তাদের অনেকেই কয়েক পুরুষ আগে খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে। তরুনদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত প্রবীনদের প্রপিতামহগণের মধ্যে খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীর সংখ্যা কম।

১৫। আধুনিক মান্দিরা খ্রিষ্ট ধর্মীয় অনুশাসন পালন করছে ও খ্রিষ্টধর্মের মৌলিক বিষয়গুলোতে সাধারণভাবে সকলেই বিশ্বাস করে। তবে সাংসারেক ধর্মে ও বিভিন্ন মিদ্দির অস্তিত্বে বিশ্বাস ও তাদের সন্তুষ্ট করার জন্য পূজা-অর্চনা এখনও তাদের সমাজে প্রচলিত আছে। তবে তাদের আদি ধর্মে বিশ্বাস ও আদি ধর্মের বিভিন্ন মিদ্দি বা দেব-দেবীর উপাসনার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ ভেদে পার্থক্য লক্ষ্য করা গিয়েছে।

১৬। বর্তমানে আচিক্ মান্দিদের বিবাহ-অনুষ্ঠান স্থানীয় মিশনের খ্রিষ্টধর্ম যাজক পরিচালনা করেন। খ্রিষ্টধর্ম যাজকই বিয়ে পড়ান বা বিবাহ রেজিস্ট্রি করেন। অতীতের মতো 'খামাল' বা মান্দি পুরহিত এখন আর বিয়ের অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন না। অতীতের মতো তাদের সমাজে বিয়ের নানা বৈচিত্র্যময় প্রথাও এখন আর নাই। খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তরের হার বৃদ্ধি পাবার সাথে সাথে তাদের সমাজে বহুবিবাহের পরিমান কমে এসেছে। তবে বিয়ের পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাদের ঐতিহ্যবাহী রীতি এখনও অনেকটা প্রচলিত আছে। যখন অভিভাবকগণ তাদের মেয়ের বিয়ে ঠিক করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন প্রথম পছন্দ হয় মেয়ের বাবার ভাগ্নে। পূর্বের মতো এখনও তাদের সমাজে বিয়ের ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রী দু'জন ভিন্ন মাহারীর হতে হবে বলে তারা মনে করেন।

১৭। যে কোন জাতির ভাষা তাদের কথোপকথনের মাধ্যম, শিক্ষার বাহন এবং সমাজ কাঠামোর একটি মৌলিক উপাদান। ঐতিহ্যগতভাবে আচিক্ মান্দি জনগোষ্ঠী বিভিন্ন দলে বিভক্ত ছিল এবং বিভিন্ন দলের ভিন্ন ভিন্ন ভাষা ছিল। অতীতে তাদের মাতৃভাষাই ছিল কথোপকথনের একমাত্র মাধ্যম। কালের পরিক্রমায় আচিক্ মান্দিরা বাংলা ও ইংরেজি ভাষা শিখেছে। ঢাকায়

বসবাসরত মান্দিদের নতুন প্রজন্মের কেউ কেউ মাতৃভাষা প্রায় ভুলতে বসেছে বললেও অতুক্তি হবে না। তবে খ্রিষ্টধর্ম তাদের জনগোষ্ঠীতে প্রচারের শুরু থেকেই ধর্মপ্রচারকগণ তাদের ভাষার মাধ্যমে ধর্মপ্রচারের গুরুত্ব অনুভব করেছেন। ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকেই রাণীখং মিশনে প্রথম মান্দি ভাষার প্রার্থনা করা ও খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষাদান শুরু হয়েছিল। মাঝখানে কিছুদিন মান্দি ভাষায় প্রার্থনা বন্ধ থাকলেও ১৯৬২ থেকে ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রোমে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় ভ্যাটিকান মহাসভায় মণ্ডলীর উপাসনার স্থানীয়করণের সুপারিশক্রমে বাংলাদেশের মান্দি এলাকায় মান্দি ভাষায় উপাসনা আবার শুরু হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে কয়েকটি এলাকার গির্জায় মান্দি ভাষায় প্রার্থনা ও ধর্মোপদেশ দান করা হয়।

১৮। সামাজিক মূল্যবোধ এবং লোকাচারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ গারো সমাজের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। খ্রিষ্টধর্মের প্রভাবে তাদের সমাজজীবনের অনেক কিছুতে পরিবর্তন আসলেও অনেক সামাজিক মূল্যবোধ তারা আগের মতই অনুসরণ করছে। আধুনিক কালেও গারোরা তাদের অনেক লোকাচারকে অলংঘণীয় জীবনবিধান হিসেবে মনে করে।

১৯। অতীতে আচিক্ মান্দি সমাজে নিজস্ব বিচার ব্যবস্থা ছিল এবং অপরাধীকে শাস্তি দেয়ার নিজস্ব রীতি-নীতি ছিল। অনেক সময় এই বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে অপরাধী নির্ধারণ প্রায় অসম্ভব মনে হলে অলৌকিক শক্তির সাহায্যে অপরাধী নির্ধারণের বিধান তাদের সমাজে প্রচলিত ছিল। বর্তমানে বাংলাদেশের মান্দিরা প্রয়োজনে আধুনিক আইন আদালতের সাহায্য নিয়ে থাকে। তাদের নিজস্ব বিচার ব্যবস্থা এখন আর আগের মত কার্যকর নয়। তারা বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় আইন এবং খ্রিষ্ট ধর্মীয় নীতি-নৈতিকতার অনুসারী। তবে গ্রামাঞ্চলের সহজ-সরল মান্দি জনগোষ্ঠী এখনও প্রয়োজনে অপরাধী নির্ধারণের জন্য অলৌকিক শক্তির সাহায্য গ্রহণ করে থাকে।

২০। আচিক্ মান্দি নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর প্রচলিত আইন অনুযায়ী কোন পুরুষ কোন রকম সম্পত্তির অধিকারী হতে পারে না। কোন পরিবারে পুত্র সন্তান যা অর্জন করে তার সবই তার মা বা বোনের সম্পত্তি হবে। বিবাহিত পুরুষ যা অর্জন করে তার সমস্তই তার স্ত্রীর সম্পত্তি হবে এবং স্ত্রীবিয়োগ ঘটে থাকলে তার কন্যার সম্পত্তি হবে। খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণের ফলে আচিক্ মান্দি

জনগোষ্ঠীর মাতৃতান্ত্রিক প্রথার পরিবর্তন এসেছে সবচেয়ে কম। এখনও বিবাহের পরে স্বামীরা সাধারণত স্ত্রীর পরিবারের সাথে বসবাস করতে যায়। একক পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে শহরে অধিকাংশ সময়ই এ প্রথার ব্যতিক্রম ঘটে। তবে এখনও আচিক্ মান্দি সমাজে নারীরাই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে।

পরিশেষে একথা বলা যায় যে, আধুনিক খ্রিষ্টধর্মানুসারী মান্দি জনগোষ্ঠীর ধর্মবিশ্বাস, আচার অনুষ্ঠানে সিনক্রেটিজম লক্ষ্য করা গেলেও এবং এই সিনক্রেটিক বৈশিষ্ট্যগুলোর মূল উৎস তাদের আদি ধর্মবিশ্বাস ও ঐতিহ্যবাহী আচার অনুষ্ঠান হলেও, তারা প্রকৃতপক্ষে খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী নয় একথা বলা সঙ্গত নয়। কোন কোন সমালোচক বিশ্বের বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠী যেভাবে খ্রিষ্টধর্ম অনুসরণ করছে তাকে সিনক্রেটিক ও বিকৃত বলে সমালোচনা করেছেন। কিন্তু বর্তমান মান্দি জনগোষ্ঠী যেভাবে খ্রিষ্টধর্ম অনুসরণ করছে তাকে সার্বিক বিচারে খ্রিষ্টধর্মের বিকৃত রূপ হিসেবে অভিহিত করা বা তারা তাদের আদিম ধর্মে ফিরে গিয়েছে একথা বলার কোন সুযোগ নেই। তবে তাদের ঐতিহ্যবাহী ধর্ম ও আচার-অনুষ্ঠানের সাথে কিছুটা সিনক্রেটিজমের ফলে অন্যান্য খ্রিষ্টধর্মানুসারী সমাজের থেকে তারা স্বকীয় ও অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

প্রথম অধ্যায় :

Ambasta, A. (1998). *Capitalist Restructuring and Formation of Adivasi Proletarians– Agrarian Transition in Thane District (Western India) C. 1817-1990* (Unpublished Ph.D Thesis), Institute of Social Studies, India.

Bal, E. (2007). *They Ask Me If We Eat Frogs: Garo Ethnicity in Bangladesh,* Singapore City: Institute of Southeast Asian Studies, Singapore.

Bal, E., Takami, Y. and Sangren, J. (1999). *Manderangni Jagring- Images of the Garos in Bangladesh,* Dhaka: The University Press Limited, Bangladesh.

Baumann, G. (1999). *The Multicultural Riddle, Rethinking National, Ethnic, and Religions Identities,* New York and London: Routledge, USA.

Burling, R. (1997). *The Strong Women of Modhupur,* Dhaka: The University Press Limited, Bangladesh.

Devalle S. B. C (1992). *Discourses of Ethnicity: Culture and Protest in Jharkhand,* Michigan: Sage Publications, The University of Michigan, USA.

Hall, H. (1991). *Old and New Identities, Old and New Ethnicities," In Culture, Globalization and the World System,* edited by King, A. D., England: Basingstoke, UK.

Hamel, J., Dofour, S. and Fortin D. (1993). *The Case Study Method,* New Delhi: Sage Publication, India.

Hefner, R. W. (1993). *Conversion to Christianity: Historical and Anthropological Perspectives on a Great Transformation, Introduction: World Building and the Rationality of Conversion,* Oxford: University of California Press Ltd., UK.

Islam, S. (2000). *Banglapedia,* Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, vol. 4, Bangladesh.

Jangcham, S. (2010). *গারো অঞ্চলে খ্রীষ্টধর্মের আগমন এবং অবদান*, গারো সম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয়- উৎপত্তি ও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ময়মনসিংহ: শতবর্ষ জুবিলী কমিটি, ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশ, বাংলাদেশ।

Kothari C. R. (2004). *Research Methodology- Methods and Techniques*, New Delhi: New Age International (P) Limited, Publishers, India.

Lofland, J. (1996). *Social Movement Organization: Guide to Research on Insurgent Realities*, New Brunswick: Aldine transaction, Canada.

Playfair, M. A. (1909). *The Garos,* Meghalaya: D. J. Publication, India.

Rema, R. F. P. (2010). *গারো অঞ্চলে খ্রীষ্টধর্মের আগমন এবং অবদান*, খিষ্ট্রধর্ম গ্রহণ করার পরে মান্দিদের অবস্থা, ময়মনসিংহ: শতবর্ষ জুবিলী কমিটি, ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশ, বাংলাদেশ।

দ্বিতীয় অধ্যায় :

Berman, M., Brown, D. and Corbett, G. G. (2005). *The Syntax Morphology Interface: A Study of Syncretism*, Cambridge: Cambridge University Press, UK.

Bryson, T. (1992). *The Hermeneutich of Religious Syncretism, Practical Vedanta,* Unpublished Thesis, Chicago University, USA.

Herbermann, C. (1913). *Syncretism, Catholic Encyclopedia*, Rebert Appleton Company.

Herskovits, M. J. (1941). *The Myth of Negro Past,* Boston: M. A. Becon Press, USA.

Ingham, J. M. (1986). *Mary, Michael, Lucifer. Folk Catholicism in Central Mexico,* Austin: University of Texas Press.

Kalus-Peter Koepping, "Manipulated Identities: Syncretism and Uniqueness of Tradition in Modern Japanese Discourse." In Stewart and Shaw Ed.) Opcit.

Kiernan, J. (1994). *Variations on a Christian Theme: The Healing Synthesis of Zulu Zionism, Syncretism/Anti-Syncretism: The Politics of Religious Synthesis,* edited by Shaw, R. and Stewart, C., London and NY: Routledge.

McGuire, M. B. (1997). *Religion the Social Context*, London: Wadsworth Publishing Company.

Meyer, B. (1990). *Die Uber-setzung des Teufels. Uber Die Religiosen Vorstellungen von Mitgliedern Einer Chemaligen Missionskirche in (Sudost) Ghana,* (The Translation of the Devil. About the Religious Concepts of Members of a

Chemical Mission Church in Southeast Ghana), Unpublished MA Thesis, University of Amsterdam.

Meyer, B. (1992). "If you are Devil, You are a Witch and if you are a Witch, you are a Devil": The Integration of "Pagan" Ideas in the Conceptual Universe of Ewe Christians, *The Journal of Religion in Africa,* 22 (2).

Meyer, B. (1994). *Beyond Syncretism: Translation and Diabolization in the Appropriation of Protestantism in Africa, Syncretism/Anti-Syncretism: The Politics of Religious Synthesis,* edited by Shaw, R. and Stewart, C. (2005), London and NY: Routledge, UK & USA.

Pina-Cabral, J. (1992). *'The God of the Gentiles are Demons: The Problem of Pagan Survivals in Europe Culture',* in Hastrup (ed.), *Other Histories*, London: Routledge, UK.

Playfair, M. A. (1909). *The Garos,* Meghalaya: D. J. Publication, India.

Psalms. *The Book of Psalms,* Commonly Referred to Simply as Psalms, the Psalter or "the Psalms", is the First Book of the KETUVIM, the Third Section of the Hebrew Bible, and thus a Book of the Christian Old Testament.

Roy, A. (1983). *The Islamic Syncretistic Tradition in Bengal,* New Jersey: Princeton University Press, USA.

Schneider, J. (1990). Spirits and the Spirit of Capitalism, in E. Badone (ed.) *Religious Orthodoxy and Popular Faith in Europe Society*, Princeton, NJ: Princeton University Press, USA.

Screech, M. A. (1980). *Erasmass and the Paise of Folly,* London: Penguin, UK.

Shaw, R. and Stewart, C. (2005). *Syncretism/Anti-Syncretism: The Politics of Religious Synthesis,* Introduction: Problematizing Syncretism, London and NY: Routledge, USA.

Sundkler, B. G. M. (1976). *Bantu Prophets in South Africa*, London: The International African Institute/Oxford University Press, UK.

Taussig, M. T. (1980). *The Devil and Commodity Fetishism in South America*, Chapel Hill: University of North Carolina Press, USA.

Vanderleen W. G. (1938). *Trans. Religions in Essence Manifestation* by J.C. Turner, New York: Macmillan, USA.

Wach, J. (1944). *Sociology of Religion,* Chicago: The University of Chicago Press, USA.

Islam, K. N. and Islam, A. N. (2002). "সমকালীন জাপানীদের ধর্মবিশ্বাস", *তুলনামূলক ধর্ম এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, বাংলাদেশ।

তৃতীয় অধ্যায় :

Abedin, Z. (1997). CHT that Shed Blood, Dhaka: Ramon Publishers, Bangladesh.

Balle, K. W. (1987). *'Animism and Animatism' in Encyclopedia of Religion*, vol. 1, New York: Macmillan Publishing Company, USA.

Chakma, G. B. (1996). *পাবর্ত্য চট্টগ্রাম ও লুসাই পাহাড়*, রাঙ্গামাটি: উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ। (জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা কর্তৃক লেউইনের A Fly on the Wheel- এর অনুবাদকৃত গ্রন্থ)।

Chakma, S. (1985). *বাংলাদেশের উপজাতি*, ঢাকা: বা!লা একাডেমী, বাংলাদেশ।

Chakma, S. (2000). *বাংলাদেশের উপজাতি ও আদিবাসীদের সমাজ, সংস্কৃতি ও আচার ব্যবহার*, ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, বাংলাদেশ ।

Chakma, S. (2007). *আদিবাসী জনগোষ্ঠী*, বাংলদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৫, চাকমা, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ডিসেম্বর, বাংলাদেশ। (*Indigenous Communities, Cultural Survey of Bangladesh Series-5,* Chakma, Dhaka: Bangladesh Asiatic Society, December, Bangladesh).

Dalton, E. T. (1972). *Tribal History of Eastern India*, Calcutta, (Reprint, 1978), Delhi: Cosmo Publications, India.

Drang, S. (2001). *বাংলাদেশের বিপন্ন আদিবাসী*, ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, বাংলাদেশ।

Durkheim E. (1966). *The Elementary Forms of Religious Life*, New York: The Free Press, USA.

Ghosh, S. (1985). চাকমা জাতি, কলিকাতা।

Herskovits, M. J. (1948). *Man & His Work*, New York: Alfred Knofp Inc., USA.

Kamal, M., Islam, Z. and Chakma, S. (2007). *আদিবাসী জনগোষ্ঠী, বাংলদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৫*, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ডিসেম্বর, বাংলাদেশ। (*Indigenous Communities, Cultural Survey of Bangladesh Series-5*, Dhaka: Bangladesh Asiatic Society, December, Bangladesh).

Khaing, T. S. (1988). *Rakhain Mrauk phya Dthama Sak Taing Rang Thah Mya (Sak people of northern Arakan)*, Burma: Akyab College.

Koreber A. L. (1962). *Anthropology Today*, Chicago: University of Chicago Press, USA. (304-320)

LaBrre, W. (1967). *'Totemism' in Encyclopedia Britannica*, vol. 22, Chicago: William Brenton Publisher, USA.

Lewin, T. H. (1869). *The Hill Tracts of Chittagong and the Dwellers Therein, with comparative vocabularies of the Hill Districts,* Calcutta: Bengal Printing Company Ltd., India.

Lowie, R. H. (1960). *Primitive Society,* London: Routledge and Kegan Paul, UK.

Majid, M. (1992). *পটুয়াখালীর রাখাইন উপজাতি*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, বাংলাদেশ।

Malinowski, B. (1948). *Magic, Science & Religion,* New York: A Doubleday Anchor Book, USA.

Marett, R. R. (1914). *Threshold of Religion*, London: Methuen & Co. Ltd., UK.

Murdock G. P. Ford, C. S., Hudson, A. E., Kennedy, R. Simmons, L. W. and Whiting W. M. (1961). *Outline of the Cultural Material*, Human Relations Area Files, USA.

Nue, U. S. (2007). *আদিবাসী জনগোষ্ঠী, বাংলদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৫*, মারমা, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ডিসেম্বর। (*Indigenous Communities, Cultural Survey of Bangladesh Series-5*, Marma, Dhaka: Bangladesh Asiatic Society, December).

Pru, K. S. (1981). *মারমা উপজাতি পরিচিতি*, অঙ্কুর, সংখ্যা-১, রাঙামাটি: পাবলিক লাইব্রেরী, বাংলাদেশ ।

Rivers, W. H. R. (1924). *Social Organization,* London: Kegan & Paul, UK.

Saad, E. S. (2011). Religious Aspects of Adibasi Life in Bangladesh, *Bangladesh e-Journal of Sociology*, 8(1), Biannual e-Journal of the Bangladesh Sociological Society.

Sattar, A. (1975). *Tribal Culture in Bangladesh*, Dacca: Muktadhara (Swadhin Bangla Sahitya Parisad, Bangladesh.

Schendel, W. V., May. W. and Dewa, A. K. (2001). *The Chittagong Hill Tracts Living in a Borderland*, Dhaka: The University Press Limited, Bangladesh.

Tripura, P. (2007). *আদিবাসী জনগোষ্ঠী, বাংলদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৫*, ত্রিপুরা, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ডিসেম্বর। (*Indigenous Communities, Cultural Survey of Bangladesh Series-5*, Tripura, Dhaka: Bangladesh Asiatic Society, December).

Tylor, R. B. (1980). *Cultural Ways: A Concise Edition of Introduction to Cultural Anthropology*, Boston: Pearson Allyn and Bacon, USA.

Wagner, R. (1987). *'Totemism' in Encyclopedia of Religion*, vol. 14, New York: Macmillan Publishing Company, USA.

Quader, G. M. (2008). Indigenous people of Bangladesh, *The Daily Star*, July 17, Dhaka, Bangladesh.

চতুর্থ অধ্যায় :

Bal, E. (2007). *They Ask Me If We Eat Grogs: Garo Ethnicity in Bangladesh*, Singapore City: ISEAS Publishing Institute of Southeast Asian Studies, Singapore.

Baldwar, C. D. (1934). *God and the Garos*, Sydney: Australian Baptist Publishing House, Australia.

Burnlings, R. (1997). *The Strong Women of Modhopres*, Dhaka: The University Press Limited, Bangladesh, Bangladesh.

Dalton, E. T. (1872). *Descriptive Ethnology of Bengal*, Calcutta: Office of the Superintendent of Government Printing, (Second reprint published by Indian Studies Past and Present in 1973), India.

Kamal, M., Islam, Z. and Chakma, S. (2007). *আদিবাসী জনগোষ্ঠী, বাংলদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৫*, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ডিসেম্বর, বাংলাদেশ। (*Indigeneous Communities, Cultural Survey of Bangladesh Series-5*, Dhaka: Bangladesh Asiatic Society, December, Bangladesh).

Khaleque, K. (1984). Religious Syncretism Among the Bangladeshi Garos', *Bangladesh Journal of Social Studies*, 2(1), University of Dhaka.

Marak, J. (1985). *Garo Customary Laws and Practices: A Sociological Study,* Shilong: Vendrame Missiological Institute, India.

Marak, M. (1982). *"মাটির মানুষ", বিধি-পিটার দাংগো*, সুভাস জে সাংমা আলবার্ট মানকিন: বাংলাদেশী গারোদের কথা, বাংলাদেশ আদিবাসী কল্যাণ সমিতি, ঢাকা।

Nawaj, (1984). Garos Society in Transition, *Tribal Culture in Bangladesh*, (edited by Qureshi, M. S.), Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi University, Bangladesh.

Playfair, M. A. (1909). *The Garos,* Meghalaya: D. J. Publication, India.

Sangma, M. N. (1933). *Unpublished Documents on Garo Affairs: Sonaram Rongrokgre Sagma Versus King Enpera,* New Delhi: Scholar Publishing House, India.

Sangma, M. S. (1981). *History and the Culture of the Garos,* New Delhi: Books Today, India.

পঞ্চম অধ্যায় :

Baldwin, C. D. (1934). *God and the Garos,* Sydney: Australian Baptist Publishing House, Australia.

Bisi, S. P. (1958). *Keri Saheber Munshi (A Socio-historical Novel),* Kolkata: Mitra and Ghosh Publishers Pvt. Ltd., India. *(কেরী সাহেবের মুন্সী*, কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স প্রাঃ লিঃ, ভারত।

BMS Archive. *Baptist Missionary Society Periodical Account*, vol. iv, BMS Archive, London.

Burling, R. (1997). *The Strong Women of Modhupur*, Dhaka: The University Press Limited, Bangladesh.

Das, J. T. S. (2016). *বাংলাদেশে খ্রিষ্টধর্মের দুশো বছর এবং অতঃপর*, ঢাকা: কীর্তণখোলা প্রকাশনা, বাংলাদেশ।

Gedart, R. E. E. and Jangcham, S. (2018). *গারো অঞ্চলে ক্যাথলিক মিশনারীদের আগমন (১৯০৯-১৯৫৯)*, ঢাকা: প্রদেশপাল, পবিত্র ক্রুশ যাজক সংঘ, বাংলাদেশ।

Grant, C. (1792). *Observations on the State of Society Among the Asiatic Subjects of Great Britain: Particularly with Respect to Morals; and on the Means of Improving It,* London: The British Library, UK.

Hammersley, M. and Atkinson, P. (1997), *Ethnography,* NY: Routledge, USA.

Kar, P. C. (1970). *British Annexation of Garohills*, Calcutta: Nababharat Publishers, India.

Marak, R. M. (2018). *বিরিশিরি মিশন এবং ব্যাপ্টিস্ট মণ্ডলীর ইতিহাস*, , ঢাকা: থকবিরিম প্রকাশনা, বাংলাদেশ।

Rema, R. F. P. (2010). *গারো অঞ্চলে খ্রীষ্টধর্মের আগমন এবং অবদান*, গারো অঞ্চলে কাতলিক মণ্ডলীর ইতিহাস, ময়মনসিংহ: শতবর্ষ জুবিলী কমিটি, ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশ, বাংলাদেশ।

ষষ্ঠ অধ্যায়:

Carrey, R. W. (1919). *The Garo Jungle Book*, Assam: Tura Books Room, Garo Hills, India.

Dalton, E. T. (1872). *Descriptive Ethnology of Bengal,* Calcutta: Office of the Superintendent of Government Printing, (Second reprint published by Indian Studies past and Present in 1973), India.

Jangcham, S. (1985). গারো উপজাতি ও তাদের সাংস্কৃতিক বিবর্তন, (উপজাতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি শীর্ষক সেমিনার, উপজাতীয় কালচারাল একাডেমী, বিরিশিরি, দূর্গাপুর, নেত্রকোনা, এপ্রিল ১৬), *গারো জাতিসত্তা* (মুস্তফা মজিদ সম্পাদিত), ঢাকা: মাওলা ব্রাদাস, বাংলাদেশ।

Khalek, K. (2006). গারোদের অপরাধ ও বিচার: সেকাল ও একাল, *গারো জাতিসত্তা* (মুস্তফা মজিদ সম্পাদিত), ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, বাংলাদেশ ।

Majid, M. (2006). *গারো জাতিসত্তা*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদাস, বাংলাদেশ।

Nawaj, A. (1985). গারোদের আদি ধর্ম, ধর্মান্তর ও ধর্মের সাথে সংস্কৃতির বিবর্তন, (উপজাতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি শীর্ষক সেমিনার, উপজাতীয় কালচারাল একাজেমী, বিরিশিরি, দূর্গাপুর, নেত্রকোনা, এপ্রিল ১৬), *গারো জাতিসত্তা* (মুস্তফা মজিদ সম্পাদিত), ঢাকা: মাওলা ব্রাদাস, বাংলাদেশ।

Playfair, M. A. (1909). *The Garos,* Meghalaya: D. J. Publication, India.

Ritchil, C. (1985). *গারো আইন* (রেভা. সি. ডি. বলডুইন), ভাষান্তর: রেভা. ক্লেমেন্ট রিছিল, ঢাকা: থকবিরিম-অক্টোবর ২০১৮, বাংলাদেশ।

Ritchil, C. (1985). গারোদের আদি ধর্ম, খ্রিষ্ট ধর্মে ধর্মান্তর ধর্মের সাথে সংস্কৃতির সম্পর্ক, (উপজাতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি শীর্ষক সেমিনার, উপজাতীয় কালচারাল একাজেমী, বিরিশিরি, দূর্গাপুর, নেত্রকোনা, এপ্রিল ১৬), *গারো জাতিসত্তা* (মুস্তফা মজিদ সম্পাদিত), ঢাকা: মাওলা ব্রাদাস, বাংলাদেশ।

সপ্তম অধ্যায়ঃ

Burling, R. (1997). *The Strong Women of Modhupur,* Dhaka: The University Press Limited, Bangladesh.

Das, J. T. S. (2016). *বাংলাদেশে খ্রিষ্টধর্মের দুশো বছর এবং অতঃপর*, ঢাকা: কীর্তণখোলা প্রকাশণা, বাংলাদেশ।

Drang, S. (2001). *বাংলাদেশের বিপন্ন আদিবাসী*, ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, বাংলাদেশ ।

Jangcham, S. (2010). *গারো অঞ্চলে খ্রীষ্টধর্মের আগমন এবং অবদান*, গারো সম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয়- উৎপত্তি ও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ময়মনসিংহ: শতবর্ষ জুবিলী কমিটি, ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশ, বাংলাদেশ।

Khaleque, K. (1982.). Social Change Among: The Garo: A Study of the Plains Village in Bangladesh: Unpublished Dissertation, Australian National University, Canberra.

Nakne, C. (1967). Garo and Khasi: A Comparative Study in Matrilineal Systems, Paris: Mouton, France.

অষ্টম অধ্যায়ঃ

Kothari C. R. (2004). *Research Methodology- Methods and Techniques*, New Delhi: New Age International (P) Limited, Publishers, India.

Lind, D. A., Marchal, W. G. and Wathen, S. A. (2018). *Statistical Techniques in Business and Economics*, New York: McGraw-Hill Education, USA.

নবম অধ্যায়ঃ

Bonnerjea, B. (1929). Materials for the Study of Garo Ethnology, Indian Antiquary, vol. 58, India, pp.121-127.

Brightman, E. S. (1940). *A Philosophy of Religion*, New York: Prentice-Hall, USA.

Burling, R. (1997). *The Strong Women of Modhupur, Bangladesh*, Dhaka: The University Press Limited, Bangladesh.

Hasan, M. (1978). গারো উপজাতি একটি অনক্ষর সমাজ ব্যবস্থা, *জানিরা গবেষণা জার্নাল*, জানুয়ারি, বাংলাদেশ।

Khaleque, (1984). Garo Matrilineal Cross-cousin Marriage: Continuity and Discontinuity in the Face of Social Change, *Tribal Culture in Bangladesh*, (edited by Qureshi, M. S.), Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi University, Bangladesh.

Kottak, C. P. (1976). *Cultural Anthropology*, 8th ed., New York: The McGraw-Hill Companies, USA.

Radcliffe-Brown, A. R. (1940). *Preface to Fortes and Evans Pritchard*, eds, African Political System, London: Oxford University Press, UK.

Rangsa, S. P. (2006). স্রষ্টার উদ্দেশ্যে পূজাঃ আ'মোয়া ক্রীতা, *গারো জাতিসত্তা* (মুস্তফা মজিদ সম্পাদিত), ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, বাংলাদেশ ।

অন্যান্য সহায়ক উৎস:

Behera, M. C. (2000). *Tribal Religion: Change and Continuity*, New Delhi: Commonwealth Publishers, India.

Bessaignet, P. (1960). Tribes of the Northern Border of Eastern Bengal, *Social Research in East Pakistan*, Dacca.

Channa, S. M. (2000). International Encyclopedia of Tribal Religion, vol. 12, New Delhi: Cosmo Publication, India.

Channa, S. M. (2002). *The Christian Mission: Christianity and Tribal Religion*, New Delhi: Cosmo Publication, India.

Chatterji, J. (1996). *Customary Laws and Women in Manipur*, New Delhi: Uppal Publishing House, India.

Choudhury, M. (1995). Bengali as a Vehicle of Abstract Thought, *The Daily Star*, Dhaka, Bangladesh.

Dey, S. (2004). *Degrading Forest Environment and Local Garo Females in Modhupur Garh, Bangladesh*. Dhaka: University of Dhaka, Bangladesh.

Ferdous, A. (2011). *Study on Genetic Polymorphism of Autosomal STR Loci in Ethnic Population (Chakma and Garo) in Bangladesh*, Dhaka: University of Dhaka, Bangladesh.

Gomes, S. G. (1988). *The Pahrias: A Glimpse of the Tribal Life in Northeastern Bangladesh*, Dhaka: Caritas, Bangladesh.

Goswami, M. C. and Majumdar, D. N. (1972). *Social Institutions of the Garo of Meghalaya: An Analytical Study*, Calcutta: Nababharat Publishers, India.

Hasan, M. M. (2013). *Generic Polymorphism on Y-Chromosomal Haplotype STR Loci in Garo and Santal Population in Bangladesh*, Dhaka: University of Dhaka, Bangladesh.

Jahan, S. A. (2013). *The Indigenous Art of Dance and Its Evolution among Garo Culture*, Dhaka: University of Dhaka, Bangladesh.

Marak, P. R. (2005). *The Garo Tribal Religion: Beliefs and Practices*, New Delhi: Anshah Publishing House, India.

Melton, J. G. and Baumann, M. (2002). Religions of the World: A Comprehensive Encyclopedia of Beliefs and Practices, *The World Religious Statistics*, (edited by Barrett, D. B.), California: ABC-Clio LLC, USA.

Moore, H. L. (1999). *Anthropological Theory Today*, Anthropological Theory at the Turn of the Century, Cambridge: Polity Press, UK.

Quereshi, M. S. (1984). *Tribal Culture in Bangladesh*, Rajshahi: Institute for Bangladesh Studies, University of Rajshahi, Bangladesh.

Rema, R. F. P., Mankhin, R. F. R. and Jangcham, M. S. (2010). *গারো অঞ্চলে খ্রীষ্টধর্মের আগমন এবং অবদান*, ময়মনসিংহ: শতবর্ষ জুবিলী কমিটি, ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশ, বাংলাদেশ।

Risley, H. H. (1891). *Tribes and Cases of Bengal*, Ethnographic Glossary, vol. 1 and 2, Calcutta: Bengal Secretariat Press, India. Reprint (1998) Calcutta: P. Mukherjee, India.

Ryuji, Y. (1970). *Cultural Formations of Munda*, Tokyo: Takai University Press, Japan.

Saad, E. S. (2004). উপজাতি ধর্ম: একটি তাত্ত্বিক সমীক্ষা, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, সংখ্যা-৭৯, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।

Sattar, A. (1966). *অরণ্য জনপথে*, ঢাকা: সাকিব ব্রাদার্স, বাংলাদেশ।

Singh, B. and Bhandari, J. S. (1980). *The Tribal World and Its Transformations*, Michigan: Concept, University of Michigan, USA.

আচিক্ মান্দি জনগোষ্ঠীর ধর্মবিশ্বাস ও খ্রিষ্টধর্মের সিনক্রেটিক প্রবণতা

[এ জরিপ শুধু গবেষণা কার্যক্রমের জন্য ব্যবহৃত]

নাম: _____

মাতার নাম: _____

পিতার নাম: _____

পেশা: _____ বয়স: _____

লিঙ্গ: ☐ পুরুষ ☐ মহিলা এলাকা: _____

প্রশ্নমালা

নিম্ন লিখিত প্রশ্নসমূহের প্রতিটিতে উপযুক্ত জায়গায় টিক [✓] চিহ্ন দিন।

১. আপনি কোন্ ধর্মে বিশ্বাসী? (এক এর অধিক ঘরে টিক মার্ক দেয়া যাবে)
[ক] আচিক্ মান্দি ধর্ম [খ] ক্যাথলিক ধর্ম [গ] ব্যাপ্টিস্ট ধর্ম [ঘ] অন্যান্য

২. আপনি কি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন?
[ক] হ্যাঁ [খ] না [গ] অনিশ্চিত

৩. আপনি খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী হলে কোন গির্জার উপসনায় গিয়ে থাকেন?
[ক] ক্যাথলিক [খ] ব্যাপ্টিস্ট [গ] প্রেসবিটেরিয়ান [ঘ] অন্যান্য

৪. আপনার মতে খ্রিষ্টধর্ম ও আচিক্ মান্দি ধর্মের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি?
[ক] হ্যাঁ [খ] না

৫. আচিক্ মান্দি ধর্মে দেব-দেবীর উপাসনা আছে কি?
[ক] হ্যাঁ [খ] না

৬. আপনি কি দেব-দেবীর উপাসনা করেন?
[ক] হ্যাঁ [খ] না

৭. আপনি কি স্বর্গ ও নরকে বিশ্বাস করেন?
[ক] হ্যাঁ [খ] না [গ] সন্দেহবাদী

৮. আপনি যদি খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী হয়ে থাকেন তাহলে আপনি যিশু খ্রিষ্টকে ঈশ্বরপুত্র বলে মনে করেন?
[ক] হ্যাঁ [খ] না

৯. আপনার মতে মৃত্যু পরবর্তী জীবন আছে কি?
[ক] হ্যাঁ [খ] না

১০. আপনার মতে খ্রিষ্টধর্ম ও আচিক্ মান্দি ধর্মের মধ্যে কোন দ্বন্দ্বমূলক বিষয় আছে কি?
[ক] হ্যাঁ [খ] না

১১. উপরিউক্ত প্রশ্নের উত্তর যদি হ্যাঁ হয় তাহলে নিম্নলিখিত কোন কোন বিষয়ের উপর দ্বন্দ্ব রয়েছে তা উল্লেখ করুন?
[ক] খ্রিষ্টের জন্মবৃত্তান্তে বিশ্বাস [খ] একেশ্বরবাদে বিশ্বাস
[গ] ঋতু ভিত্তিক আনুষ্ঠানিকতায় বিশ্বাস [ঘ] মৃত্যু পরবর্তী জীবনে বিশ্বাস
[ঙ] গির্জার পবিত্রতায় বিশ্বাস [চ] অন্যান্য (ব্যাখ্যা দিন) _____

_____

_____

_____

_____

_____

১২. আপনি যদি খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী হয়ে থাকেন তা হলে খ্রিষ্টধর্মের গির্জায় ধর্মীয় উপাসনার জন্য আপনি সপ্তাহে কতটুকু সময় ব্যয় করেন?
[ক] মোটেই না [খ] ১ ঘন্টা ৩ ঘণ্টা [গ] ৩ বা ততোধিক ঘণ্টা

১৩. পাদ্রিগণ কি আপনাকে আচিক্ মান্দি ধর্ম পালনে নিষেধ করেন?
[ক] হ্যাঁ [খ] না

১৪. গির্জার ধর্মীয় উপদেশবাণীর মধ্যে আচিক্ মান্দি দেব-দেবীর উপাসনাকে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হয়?
[ক] হ্যাঁ [খ] না

১৫. আপনি খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী হয়েও কি আচিক্ মান্দি অনুষ্ঠানে যোগদান/ অংশগ্রহণ করেন?
[ক] হ্যাঁ [খ] না

১৬. আপনার পরিবারের অন্যান্য সদস্যবর্গও কি খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী?
[ক] হ্যাঁ [খ] না

১৭. উপরিউক্ত প্রশ্নের উত্তর যদি 'না' হয় তাহলে আপনার পরিবারবর্গের মধ্যে ধর্ম নিয়ে কোন বাগ্‌বিতণ্ডা হয় কি?
[ক] হ্যাঁ [খ] না

১৮. আচিক্ মান্দি সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহে গির্জার পাদ্রিরা কি উপস্থিত থাকেন?
[ক] হ্যাঁ [খ] না

১৯. উপরিউক্ত প্রশ্নের উত্তর যদি 'হ্যাঁ' হয় তাহলে গির্জার পাদ্রির পরিচয় বর্ণনা করুন।

_____

_____

_____

_____

_____

_____

২০. আপনার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য কি খ্রিষ্টধর্ম স্বীকার করে?
[ক] হ্যাঁ [খ] না

২১. আপনার মাতা-পিতা এবং প্রপিতামহগণ কি খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী ছিলেন?
[ক] হ্যাঁ [খ] না

২২. উপরিউক্ত প্রশ্নের উত্তর যদি 'না' হয় তবে কতদিন আগে আপনি ধর্মান্তরিত হয়েছেন?
[ক] ১ থেকে ৫ বছর [খ] ৫ থেকে ১০ বছর [গ] ১০ বছরের অধিক

২৩. আপনি কি আপনার পরিবারবর্গের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে ধর্মান্তরিত হয়েছেন?
[ক] হ্যাঁ [খ] না [গ] আংশিক

২৪. গত দশ বছরের মধ্যে আপনার ধর্মবিশ্বাসে কি কোন পরিবর্তিন হয়েছে?
[ক] অধিক ধর্মাবলম্বী হয়েছি [খ] ক্রমান্বয়ে কম ধর্মাবলম্বী হচ্ছি [গ] কোন পরিবর্তন নাই

২৫. আপনার মতে সমাজে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু?
[ক] খুবই বেশী [খ] সাধারণ [গ] সামান্য [ঘ] নাই

২৬. আপনি সামাজিক কর্মকাণ্ডে আচিক্ মান্দি নৈতিকতার উপর কতটুকু আস্থা রাখেন?
[ক] পূর্ণাঙ্গ [খ] মাঝামাঝি [গ] সামান্য [ঘ] মোটেও না

২৭. আপনার নৈতিক মানদণ্ডে খ্রিষ্টধর্মের প্রভাব কতটুকু?
[ক] পূর্ণাঙ্গ [খ] মাঝামাঝি [গ] সামান্য [ঘ] মোটেও না

২৮. খ্রিষ্টধর্ম ও আচিক্ মান্দির মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব আছে কি?
[ক] হ্যাঁ [খ] না

২৯. নিম্নলিখিত কোন কোন ক্ষেত্রে এই দ্বন্দ্ব দেখা যায়?
[ক] বিবাহ সক্রান্ত অনুষ্ঠানাদিতে [খ] উত্তরাধিকারে [গ] পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে

৩০. নিম্নোক্ত ধারণা ও নীতি-বিশ্বাসসমূহের বিপরীতে আপনার বিশ্বাসসমূহকে চিহ্নিত করুন–

[ক] বাইবেলে পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাস
[খ] ওল্ড টেস্টামেন্ট
[গ] নিউ টেস্টামেন্ট
[ঘ] বুক অব মর্মন
[ঙ] অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি সম্মান
[চ] খ্রিষ্টে বিশ্বাস
[ছ] ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস
[জ] 'ডেভিল' -এর অস্তিত্বে বিশ্বাস
[ঝ] বিবর্তনে বিশ্বাস
[ঞ] সৃষ্টিতত্ত্বে বিশ্বাস
[ট] বহু বিবাহে বিশ্বাস
[ঠ] মাংস ভক্ষণে বিশ্বাস

৩১. আপনার ধর্মবিশ্বাস কী তা অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন–

_____

_____

_____

_____

৩২. আপনার খ্রিষ্টধর্মের বিশ্বাসের সঙ্গে আচিক্ মান্দি ধর্মের কী কী পার্থক্য রয়েছে? [সংক্ষেপে বর্ণনা করুন]

_____

_____

_____

_____

— : ধন্যবাদ : —

জনতাত্ত্বিক পরিলেখ

সারণি- ০১ : উত্তরদাতাদের সামাজিক লিঙ্গ ভিত্তিক গণসংখ্যা সন্নিবেশ।

সামাজিক লিঙ্গ	গণনা
পুরুষ	৭১
মহিলা	২৯
মোট	১০০

উৎস : গবেষকের জরিপ।

সারণি- ০২ : উত্তরদাতাদের বয়স ভিত্তিক গণসংখ্যা সন্নিবেশ।

বয়স	গণনা
১৫-২৪	৫৬
২৫-৩৪	৩০
৩৫-৪৪	১
৪৫-৫৪	৪
৫৫-৬৪	৬
৬৫-৭৪	২
৭৫-৮৪	১
মোট	১০০

উৎস : গবেষকের জরিপ।

সারণি- ০৩ : উত্তরদাতাদের এলাকা ভিত্তিক গণসংখ্যা সন্নিবেশ।

এলাকা	গণনা
টংনাপাড়া	৩৪
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী	৩৩
কালাচাঁদপুর	৩৩
মোট	১০০

উৎস : গবেষকের জরিপ।

সারণি- ০৪ : উত্তরদাতাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ভিত্তিক গণসংখ্যা সন্নিবেশ।

ধর্মীয় বিশ্বাস	গণনা
ক্যাথলিক ধর্ম	৭৩
ব্যাপ্টিস্ট ধর্ম	২৪
অন্যান্য	২
উত্তর নাই	১
মোট	১০০

উৎস : গবেষকের জরিপ।

ধর্মীয় বিশ্বাসে আচিক্ মান্দি গোষ্ঠীর বর্তমান ধর্মবিশ্বাস

সারণি- ০৫ : ধর্মীয় বিশ্বাসের গণসংখ্যা সন্নিবেশ।

প্রতিক্রিয়া	ঈশ্বরে বিশ্বাস	দেব-দেবীর উপাসনা বিশ্বাস	স্বর্গ ও নরকে বিশ্বাস	যিশুখ্রিষ্টকে ঈশ্বরপুত্র বিশ্বাস	মৃত্যু পরবর্তী জীবনে বিশ্বাস
হ্যাঁ	৯৯	৩	৯২	৯৯	৭৭
না	-	৯৭	১	-	২০
অনিশ্চিত	১	-	৭	১	৩
মোট	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০

উৎস : গবেষকের জরিপ।

সারণি- ০৬ : বিশ্বাসের বিভিন্নতার গণসংখ্যা সন্নিবেশ।

বিশ্বাসের বিভিন্নতা	ক্যাথলিক	ব্যাপ্টিস্ট	অন্যান্য	মোট	শতকরা
বাইবেলে পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাস	৬২	২৩	২	৯২	১২.৫৫
ওল্ড টেস্টামেন্ট	৫৮	২০	১	৭৯	১০.৭৮
নউ টেস্টামেন্ট	৬১	২০	১	৮২	১১.১৯
বুক অব মর্মন	২	০	০	২	০.২৭
অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি সম্মান	৬৪	২০	২	৮৬	১১.৭৩
খ্রিষ্টে বিশ্বাস	৬৬	২২	২	৯০	১২.২৮
ত্রত্ববাদে বিশ্বাস	৬৭	১৯	১	৮৭	১১.৮৭
'ডেভিল' -এর অস্তিত্বে বিশ্বাস	৩৫	১৭	১	৫৩	৭.২৩
বিবর্তনে বিশ্বাস	১৯	২	০	২১	২.৮৬
সৃষ্টিতত্ত্বে বিশ্বাস	৫৫	১৯	২	৭৬	১০.৩৭
বহু বিবাহে বিশ্বাস	১	০	০	১	০.১৪
মাংস ভক্ষণে বিশ্বাস	৪৯	১৪	১	৬৪	৮.৭৩
মোট	N=১০০				

উৎস : গবেষকের জরিপ।

সারণি- ০৭ : ধারণা ও নীতি-বিশ্বাসসমূহের বিপরীতে বিশ্বাসসমূহের সামাজিক লিঙ্গ ভিত্তিক পর্যালোচনা।

প্রতিক্রিয়া সমূহ	সামাজিক লিঙ্গ			
	পুরুষ		মহিলা	
	গণনা	কলাম N %	গণনা	কলাম N %
বাইবেলে পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাস	৬৫	৯১.৫%	২৭	৯৩.১%
ওল্ড টেস্টামেন্ট	৫৬	৭৮.৯%	২৩	৭৯.৩%
নউ টেস্টামেন্ট	৫৮	৮১.৭%	২৪	৮২.৮%
বুক অব মর্মন	০	০.০%	২	৬.৯%
অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি সম্মান	৬১	৮৫.৯%	২৫	৮৬.২%
খ্রিষ্টে বিশ্বাস	৬৪	৯০.১%	২৬	৮৯.৭%
ত্রত্ববাদে বিশ্বাস	৬৩	৮৮.৭%	২৪	৮২.৮%

প্রতিক্রিয়া সমূহ	সামাজিক লিঙ্গ			
	পুরুষ		মহিলা	
	গণনা	কলাম N %	গণনা	কলাম N %
'ডেভিল' -এর অস্তিত্বে বিশ্বাস	৩৭	৫২.১%	১৬	৫৫.২%
বিবর্তনে বিশ্বাস	১৯	২৬.৮%	৩	১০.৩%
সৃষ্টিতত্ত্বে বিশ্বাস	৫৬	৭৮.৯%	২০	৬৯.০%
বহু বিবাহে বিশ্বাস	১	১.৪%	০	০.০%
মাংস ভক্ষণে বিশ্বাস	৪৭	৬৬.২%	১৭	৫৮.৬%
মোট	N=১০০		N=১০০	

Pearson Chi-Square Tests

		সামাজিক লিঙ্গ
বিশ্বাস	Chi-square	১১.০৮৩
	df	১২
	Sig.	.৫২২[a]

Results are based on nonempty rows and columns in each innermost subtable.
a. The minimum expected cell count in this subtable is less than one. Chi-square results may be invalid.
উৎস : গবেষকের জরিপ।

সারণি- ০৮ : ধারণা ও নীতি-বিশ্বাসসমূহের বিপরীতে বিশ্বাসসমূহের বয়স ভিত্তিক পর্যালোচনা।

প্রতিক্রিয়া সমূহ	বয়স					
	১৫-২৪		২৫-৩৪		৩৫+	
	গণনা	কলাম N %	গণনা	কলাম N %	গণনা	কলাম N %
বাইবেলে পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাস	৫০	৮৯.৩%	২৯	৯৬.৭%	১৩	৯২.৯%
ওল্ড টেস্টামেন্ট	৪১	৭৩.২%	২৬	৮৬.৭%	১২	৮৫.৭%
নউ টেস্টামেন্ট	৪১	৭৩.২%	২৮	৯৩.৩%	১৩	৯২.৯%
বুক অব মর্মন	১	১.৮%	১	৩.৩%	০	০.০%
অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি সম্মান	৪৯	৮৭.৫%	২৫	৮৩.৩%	১২	৮৫.৭%
খ্রিষ্টে বিশ্বাস	৫০	৮৯.৩%	২৬	৮৬.৭%	১৪	১০০.০%
ত্রত্ববাদে বিশ্বাস	৪৭	৮৩.৯%	২৭	৯০.০%	১৩	৯২.৯%
'ডেভিল' -এর অস্তিত্বে বিশ্বাস	৩২	৫৭.১%	১৪	৪৬.৭%	৭	৫০.০%
বিবর্তনে বিশ্বাস	১৩	২৩.২%	৬	২০.০%	৩	২১.৪%
সৃষ্টিতত্ত্বে বিশ্বাস	৪২	৭৫.০%	২০	৬৬.৭%	১৪	১০০.০%
বহু বিবাহে বিশ্বাস	০	০.০%	০	০.০%	১	৭.১%
মাংস ভক্ষণে বিশ্বাস	৩৭	৬৬.১%	২০	৬৬.৭%	৭	৫০.০%

Pearson Chi-Square Tests

		বয়স
বিশ্বাস	Chi-square	২৯.১৫২
	df	২৪
	Sig.	.২১৪[a]

Results are based on nonempty rows and columns in each innermost subtable.
a. The minimum expected cell count in this subtable is less than one. Chi-square results may be invalid.
উৎস : গবেষকের জরিপ।

সারণি- ০৯ : ধারণা ও নীতি-বিশ্বাসসমূহের বিপরীতে বিশ্বাসসমূহের এলাকা ভিত্তিক পর্যালোচনা।

প্রতিক্রিয়া সমূহ	এলাকা					
	টংনাপাড়া		ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী		কালাচাঁদপুর	
	গণনা	কলাম N %	গণনা	কলাম N %	গণনা	কলাম N %
বাইবেলে পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাস	৩৪	১০০.০%	২৮	৮৪.৮%	৩০	৯০.৯%
ওল্ড টেস্টামেন্ট	৩২	৯৪.১%	২৬	৭৮.৮%	২১	৬৩.৬%
নউ টেস্টামেন্ট	৩৪	১০০.০%	২৮	৮৪.৮%	২০	৬০.৬%
বুক অব মর্মন	০	০.০%	০	০.০%	২	৬.১%
অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি সম্মান	৩৩	৯৭.১%	৩২	৯৭.০%	২১	৬৩.৬%
খ্রিষ্টে বিশ্বাস	৩৪	১০০.০%	৩১	৯৩.৯%	২৫	৭৫.৮%
ত্রত্ববাদে বিশ্বাস	৩৩	৯৭.১%	২৯	৮৭.৯%	২৫	৭৫.৮%
'ডেভিল' -এর অস্তিত্বে বিশ্বাস	২১	৬১.৮%	২০	৬০.৬%	১২	৩৬.৪%
বিবর্তনে বিশ্বাস	৪	১১.৮%	১৩	৩৯.৪%	৫	১৫.২%
সৃষ্টিতত্ত্বে বিশ্বাস	২৯	৮৫.৩%	২৪	৭২.৭%	২৩	৬৯.৭%
বহু বিবাহে বিশ্বাস	১	২.৯%	০	০.০%	০	০.০%
মাংস ভক্ষণে বিশ্বাস	২২	৬৪.৭%	২১	৬৩.৬%	২১	৬৩.৬%

Pearson Chi-Square Tests

		এলাকা
বিশ্বাস	Chi-square	৯৪.৪৭৩
	df	২৪
	Sig.	.০০০*,b

Results are based on nonempty rows and columns in each innermost subtable.
*. The Chi-square statistic is significant at the .05 level.
b. The minimum expected cell count in this subtable is less than one. Chi-square results may be invalid.
উৎস : গবেষকের জরিপ।

আচিক্ মান্দিদের আচার অনুষ্ঠানে বিবর্তনের স্বরূপ

সারণি- ১০ : আচিক্ মান্দি ধর্মে দেব-দেবীর উপাসনার সামাজিক লিঙ্গ ভিত্তিক পর্যালোচনা।

Crosstabulation

		দেব-দেবীর উপাসনা			মোট
		হ্যাঁ	না	উত্তর নাই	
সামাজিক লিঙ্গ	পুরুষ	৬৭	৩	১	৭১
	মহিলা	২২	৬	১	২৯
মোট		৮৯	৯	২	১০০

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	৭.৪২২[a]	২	.০২৪
Likelihood Ratio	৬.৬৫৮	২	.০৩৬
Linear-by-Linear Association	৫.৬১৯	১	.০১৮
N of Valid Cases	১০০		

a. 3 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .58.
উৎস : গবেষকের জরিপ।

সারণি- ১১ : আচিক্ মান্দি ধর্মে দেব-দেবীর উপাসনার বয়স ভিত্তিক পর্যালোচনা।

Crosstabulation

		দেব-দেবীর উপাসনা			মোট
		হ্যাঁ	না	উত্তর নাই	
বয়স	১৫-২৪	৫১	৩	২	৫৬
	২৫-৩৪	২৭	৩	০	৩০
	৩৫+	১১	৩	০	১৪
মোট		৮৯	৯	২	১০০

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	৫.০৩৫[a]	৪	.২৮৪
Likelihood Ratio	৫.২৫২	৪	.২৬২
Linear-by-Linear Association	.২৬৩	১	.৬০৮
N of Valid Cases	১০০		

a. 5 cells (55.6%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .28.

উৎস : গবেষকের জরিপ।

সারণি- ১২ : আচিক্ মান্দি ধর্মে দেব-দেবীর উপাসনার এলাকা ভিত্তিক পর্যালোচনা।

Crosstabulation

		দেব-দেবীর উপাসনা			মোট
		হ্যাঁ	না	উত্তর নাই	
এলাকা	টংনাপাড়া	৩০	৪	০	৩৪
	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী	৩১	১	১	৩৩
	কালাচাঁদপুর	২৮	৪	১	৩৩
মোট		৮৯	৯	২	১০০

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	৩.১৪০[a]	৪	.৫৩৫
Likelihood Ratio	৪.১৬৬	৪	.৩৮৪
Linear-by-Linear Association	.৪৩৮	১	.৫০৮
N of Valid Cases	১০০		

a. 6 cells (66.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .66.

উৎস : গবেষকের জরিপ।

সারণি- ১৩ : আচিক্ মান্দি ধর্ম পালনে পাদ্রিগণ কর্তৃক নিষেধাজ্ঞার সামাজিক লিঙ্গ ভিত্তিক পর্যালোচনা।

Crosstabulation

		পাদ্রিগণ কর্তৃক আচিক্ মান্দি ধর্ম পালনে নিষেধাজ্ঞা			মোট
		হ্যাঁ	না	উত্তর নাই	
সামাজিক লিঙ্গ	পুরুষ	২৬	৪৩	২	৭১
	মহিলা	৭	২২	০	২৯
মোট		৩৩	৬৫	২	১০০

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	২.৫৩০[a]	২	.২৮২
Likelihood Ratio	৩.১২৩	২	.২১০
Linear-by-Linear Association	.৭৫০	১	.৩৮৬
N of Valid Cases	১০০		

a. 2 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .58.

উৎস : গবেষকের জরিপ।

সারণি- ১৪ : আচিক্ মান্দি ধর্ম পালনে পাদ্রিগণ কর্তৃক নিষেধাজ্ঞার বয়স ভিত্তিক পর্যালোচনা।

Crosstabulation

		পাদ্রিগণ কর্তৃক আচিক্ মান্দি ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনে নিষেধাজ্ঞা			মোট
		হ্যাঁ	না	উত্তর নাই	
বয়স	১৫-২৪	১৪	৪১	১	৫৬
	২৫-৩৪	১৪	১৫	১	৩০
	৩৫+	৫	৯	০	১৪
মোট		৩৩	৬৫	২	১০০

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	৪.৯৯৬[a]	৪	.২৮৮
Likelihood Ratio	৫.২০৩	৪	.২৬৭
Linear-by-Linear Association	১.৮৭৭	১	.১৭১
N of Valid Cases	১০০		

a. 4 cells (44.4%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .28.

উৎস : গবেষকের জরিপ।

সারণি- ১৫ : আচিক্ মান্দি ধর্ম পালনে পাদ্রিগণ কর্তৃক নিষেধাজ্ঞার এলাকা ভিত্তিক পর্যালোচনা।

Crosstabulation

		পাদ্রিগণ কর্তৃক আচিক্ মান্দি ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনে নিষেধাজ্ঞা			মোট
		হ্যাঁ	না	উত্তর নাই	
এলাকা	টংনাপাড়া	১৮	১৪	২	৩৪
	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী	৯	২৪	০	৩৩
	কালাচাঁদপুর	৬	২৭	০	৩৩
মোট		৩৩	৬৫	২	১০০

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	১৫.২১১[a]	৪	.০০৪
Likelihood Ratio	১৫.৭৮৩	৪	.০০৩
Linear-by-Linear Association	৫.৪৬৫	১	.০১৯
N of Valid Cases	১০০		

a. 3 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .66.

উৎস : গবেষকের জরিপ।

সারণি- ১৬ : গির্জার ধর্মীয় উপদেশবাণীর মধ্যে আচিক্ মান্দি ধর্মের দেব-দেবীর উপাসনাকে নিষিদ্ধ ঘোষণার সামাজিক লিঙ্গ ভিত্তিক পর্যালোচনা।

Crosstabulation

		আচিক্ মান্দি দেব-দেবীর উপাসনাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা			মোট
		হ্যাঁ	না	উত্তর নাই	
সামাজিক লিঙ্গ	পুরুষ	৪৫	২৪	২	৭১
	মহিলা	১২	১৬	১	২৯
মোট		৫৭	৪০	৩	১০০

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	৪.১২৭[a]	২	.১২৭
Likelihood Ratio	৪.১০০	২	.১২৯
Linear-by-Linear Association	৩.৩৮৬	১	.০৬৬
N of Valid Cases	১০০		

a. 2 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .87.

উৎস : গবেষকের জরিপ।

সারণি- ১৭ : গির্জার ধর্মীয় উপদেশবাণীর মধ্যে আচিক্ মান্দি ধর্মের দেব-দেবীর উপাসনাকে নিষিদ্ধ ঘোষণার বয়স ভিত্তিক পর্যালোচনা।

Crosstabulation

		আচিক্ মান্দি দেব-দেবীর উপাসনাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা			মোট
		হ্যাঁ	না	উত্তর নাই	
বয়স	১৫-২৪	৩৩	২২	১	৫৬
	২৫-৩৪	১৬	১৩	১	৩০
	৩৫+	৮	৫	১	১৪
মোট		৫৭	৪০	৩	১০০

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	১.৩৪৯[a]	৪	.৮৫৩
Likelihood Ratio	১.১৭২	৪	.৮৮৩
Linear-by-Linear Association	.৩৩০	১	.৫৬৬
N of Valid Cases	১০০		

a. 3 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .42.

উৎস : গবেষকের জরিপ।

সারণি- ১৮ : গির্জার ধর্মীয় উপদেশবাণীর মধ্যে আচিক্ মান্দি ধর্মের দেব-দেবীর উপাসনাকে নিষিদ্ধ ঘোষণার এলাকা ভিত্তিক পর্যালোচনা।

Crosstabulation

		আচিক্ মান্দি ধর্মের দেব-দেবীর উপাসনাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা			মোট
		হ্যাঁ	না	উত্তর নাই	
এলাকা	টংনাপাড়া	২৫	৭	২	৩৪
	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী	১৭	১৬	০	৩৩
	কালাচাঁদপুর	১৫	১৭	১	৩৩
মোট		৫৭	৪০	৩	১০০

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	৯.৩৯৮[a]	৪	.০৫২
Likelihood Ratio	১০.৬৭৫	৪	.০৩০
Linear-by-Linear Association	৩.৪৩০	১	.০৬৪
N of Valid Cases	১০০		

a. 3 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .99.
উৎস : গবেষকের জরিপ।

সারণি- ১৯ : খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী হয়েও আচিক্ মান্দি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সামাজিক লিঙ্গ ভিত্তিক পর্যালোচনা।

Crosstabulation

		খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী হয়ে আচিক্ মান্দি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ			মোট
		হ্যাঁ	না	উত্তর নাই	
সামাজিক লিঙ্গ	পুরুষ	৬৬	৪	১	৭১
	মহিলা	২৪	৫	০	২৯
মোট		৯০	৯	১	১০০

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	৩.৭২৯[a]	২	.১৫৫
Likelihood Ratio	৩.৬৮০	২	.১৫৯
Linear-by-Linear Association	১.৩৩৬	১	.২৪৮
N of Valid Cases	১০০		

a. 3 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .29.
উৎস : গবেষকের জরিপ।

সারণি- ২০ : খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী হয়েও আচিক্ মান্দি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের বয়স ভিত্তিক পর্যালোচনা।

Crosstabulation

		খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী হয়ে আচিক্ মান্দি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ			মোট
		হ্যাঁ	না	উত্তর নাই	
বয়স	১৫-২৪	৫১	৫	০	৫৬
	২৫-৩৪	২৬	৪	০	৩০
	৩৫+	১৩	০	১	১৪
মোট		৯০	৯	১	১০০

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	৮.০৮৬[a]	৪	.০৮৮
Likelihood Ratio	৭.০৫৪	৪	.১৩৩
Linear-by-Linear Association	.৪২১	১	.৫১৭
N of Valid Cases	১০০		

a. 5 cells (55.6%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .14.
উৎস : গবেষকের জরিপ।

সারণি- ২১ : খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী হয়েও আচিক্ মান্দি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের এলাকা ভিত্তিক পর্যালোচনা।

Crosstabulation

		খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী হয়ে আচিক্ মান্দি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ			মোট
		হ্যাঁ	না	উত্তর নাই	
এলাকা	টংনাপাড়া	৩০	৩	১	৩৪
	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী	৩১	২	০	৩৩
	কালাচাঁদপুর	২৯	৪	০	৩৩
মোট		৯০	৯	১	১০০

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	২.৭০২[a]	৪	.৬০৯
Likelihood Ratio	২.৯২৪	৪	.৫৭১
Linear-by-Linear Association	.০৯৯	১	.৭৫৩
N of Valid Cases	১০০		

a. 6 cells (66.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .33.

উৎস : গবেষকের জরিপ।

সারণি- ২২ : আচিক্ মান্দি সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহে গির্জার পাদ্রিদের উপস্থিতির সামাজিক লিঙ্গ ভিত্তিক পর্যালোচনা।

Crosstabulation

		আচিক্ মান্দি সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহে গির্জার পাদ্রিরদের উপস্থিতি			মোট
		হ্যাঁ	না	উত্তর নাই	
সামাজিক লিঙ্গ	পুরুষ	৫১	১৭	৩	৭১
	মহিলা	২৩	৬	০	২৯
মোট		৭৪	২৩	৩	১০০

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	১.৪৭৬[a]	২	.৪৭৮
Likelihood Ratio	২.৩০৫	২	.৩১৬
Linear-by-Linear Association	১.০৫০	১	.৩০৫
N of Valid Cases	১০০		

a. 2 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .87.

উৎস : গবেষকের জরিপ।

সারণি- ২৩ : আচিক্ মান্দি সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহে গির্জার পাদ্রিদের উপস্থিতির বয়স ভিত্তিক পর্যালোচনা।

Crosstabulation

		আচিক্ মান্দি সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহে গির্জার পাদ্রিরদের উপস্থিতি			মোট
		হ্যাঁ	না	উত্তর নাই	
বয়স	১৫-২৪	৪৪	১০	২	৫৬
	২৫-৩৪	২৩	৬	১	৩০
	৩৫+	৭	৭	০	১৪
মোট		৭৪	২৩	৩	১০০

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	৬.৯৬৮[a]	৪	.১৩৮
Likelihood Ratio	৬.৪৫৫	৪	.১৬৮
Linear-by-Linear Association	১.৯০৮	১	.১৬৭
N of Valid Cases	১০০		

a. 4 cells (44.4%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .42.
উৎস : গবেষকের জরিপ।

সারণি- ২৪ : আচিক্ মান্দি সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহে গির্জার পাদ্রিদের উপস্থিতির এলাকা ভিত্তিক পর্যালোচনা।

Crosstabulation

		আচিক্ মান্দি সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহে গির্জার পাদ্রিরদের উপস্থিতি			মোট
		হ্যাঁ	না	উত্তর নাই	
এলাকা	টংনাপাড়া	২৩	৯	২	৩৪
	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী	২৪	৯	০	৩৩
	কালাচাঁদপুর	২৭	৫	১	৩৩
মোট		৭৪	২৩	৩	১০০

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	৩.৭২১[a]	৪	.৪৪৫
Likelihood Ratio	৪.৫৯৮	৪	.৩৩১
Linear-by-Linear Association	১.৮১২	১	.১৭৮
N of Valid Cases	১০০		

a. 3 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .99.
উৎস : গবেষকের জরিপ।

সারণি- ২৫ : খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী হয়ে খ্রিষ্টধর্মের গির্জায় ধর্মীয় উপাসনায় সাপ্তাহিক সময় ব্যয়ের সামাজিক লিঙ্গ ভিত্তিক পর্যালোচনা।

Crosstabulation

		খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী হয়ে ধর্মীয় উপাসনায় সময় ব্যয়			মোট
		মোটেই না	১ ঘন্টা ৩ ঘণ্টা	৩ বা ততোধিক ঘণ্টা	
সামাজিক লিঙ্গ	পুরুষ	৯	৬১	১	৭১
	মহিলা	৬	২০	৩	২৯
মোট		১৫	৮১	৪	১০০

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	৫.৭২৩[a]	২	.০৫৭
Likelihood Ratio	৫.১৯৬	২	.০৭৪
Linear-by-Linear Association	.০১০	১	.৯২১
N of Valid Cases	১০০		

a. 3 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.16.
উৎস : গবেষকের জরিপ।

সারণি- ২৬ : খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী হয়ে খ্রিষ্টধর্মের গির্জায় ধর্মীয় উপাসনায় সাপ্তাহিক সময় ব্যয়ের রযস ভিত্তিক পর্যালোচনা।

Crosstabulation

		খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী হয়ে ধর্মীয় উপাসনায় সময় ব্যয়			মোট
		মোটেই না	১ ঘন্টা ৩ ঘণ্টা	৩ বা ততোধিক ঘণ্টা	
বয়স	১৫-২৪	৮	৪৬	২	৫৬
	২৫-৩৪	৫	২৪	১	৩০
	৩৫+	২	১১	১	১৪
মোট		১৫	৮১	৪	১০০

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	.৫০৭[a]	৪	.৯৭৩
Likelihood Ratio	.৪৪২	৪	.৯৭৯
Linear-by-Linear Association	.০১৫	১	.৯০১
N of Valid Cases	১০০		

a. 5 cells (55.6%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .56.

উৎস : গবেষকের জরিপ।

সারণি- ২৭ : খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী হয়ে খ্রিষ্টধর্মের গির্জায় ধর্মীয় উপাসনায় সাপ্তাহিক সময় ব্যয়ের এলাকা ভিত্তিক পর্যালোচনা।

Crosstabulation

		খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী হয়ে ধর্মীয় উপাসনায় সময় ব্যয়			মোট
		মোটেই না	১ ঘন্টা ৩ ঘণ্টা	৩ বা ততোধিক ঘণ্টা	
এলাকা	টংনাপাড়া	৩	৩১	০	৩৪
	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী	৩	২৮	২	৩৩
	কালাচাঁদপুর	৯	২২	২	৩৩
মোট		১৫	৮১	৪	১০০

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	৮.৩৩৯[a]	৪	.০৮০
Likelihood Ratio	৯.২৬৫	৪	.০৫৫
Linear-by-Linear Association	১.৪০৩	১	.২৩৬
N of Valid Cases	১০০		

a. 5 cells (55.6%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.32.

উৎস : গবেষকের জরিপ।

আচিক্ মান্দি পরিবার ও সমাজের বিবর্তন

সারণি- ২৮ : সমাজে ধর্মের প্রয়োজনীয়তার সামাজিক লিঙ্গ ভিত্তিক পর্যালোচনা।

Crosstabulation

		সমাজে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা				মোট
		খুবই বেশী	সাধারণ	সামান্য	নাই	
সামাজিক লিঙ্গ	পুরুষ	৪৯	২০	২	০	৭১
	মহিলা	১৯	৭	১	২	২৯
মোট		৬৮	২৭	৩	২	১০০

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	৫.০৮৫[a]	৩	.১৬৬
Likelihood Ratio	৫.১৪২	৩	.১৬২
Linear-by-Linear Association	২.৩১৭	১	.১২৮
N of Valid Cases	১০০		

a. 4 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .58.
উৎস : গবেষকের জরিপ।

সারণি- ২৯ : সমাজে ধর্মের প্রয়োজনীয়তার বয়স ভিত্তিক পর্যালোচনা।

Crosstabulation

		সমাজে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা				মোট
		খুবই বেশী	সাধারণ	সামান্য	নাই	
বয়স	১৫-২৪	৩৮	১৫	২	১	৫৬
	২৫-৩৪	২০	১০	০	০	৩০
	৩৫+	১০	২	১	১	১৪
মোট		৬৮	২৭	৩	২	১০০

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	৫.৫৪৩[a]	৬	.৪৭৬
Likelihood Ratio	৬.২১৩	৬	.৪০০
Linear-by-Linear Association	.১৭২	১	.৬৭৮
N of Valid Cases	১০০		

a. 7 cells (58.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .28.
উৎস : গবেষকের জরিপ।

সারণি- ৩০ : সমাজে ধর্মের প্রয়োজনীয়তার এলাকা ভিত্তিক পর্যালোচনা।

Crosstabulation

		সমাজে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা				মোট
		খুবই বেশী	সাধারণ	সামান্য	নাই	
এলাকা	টংনাপাড়া	২৯	৪	১	০	৩৪
	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী	১৮	১৫	০	০	৩৩
	কালাচাঁদপুর	২১	৮	২	২	৩৩
মোট		৬৮	২৭	৩	২	১০০

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	১৫.৭২৬[a]	৬	.০১৫
Likelihood Ratio	১৬.৮৮৫	৬	.০১০
Linear-by-Linear Association	৫.৬৬৩	১	.০১৭
N of Valid Cases	১০০		

a. 6 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .66.
উৎস : গবেষকের জরিপ।

সারণি- ৩১ : সামাজিক কর্মকাণ্ডে আচিক্ মান্দি ধর্মের নৈতিকতার প্রভাবের বন্টন।

প্রতিক্রিয়া	সামাজিক কর্মকাণ্ডে আচিক্ মান্দি নৈতিকতা	নৈতিক মানদণ্ডে খ্রিষ্টধর্মের প্রভাব
পূর্ণাঙ্গ	৪৮	৭০
মাঝামাঝি	৩৫	২৬
সামান্য	১১	৩
মোটেও না	৪	-
উত্তর নাই	২	১
মোট	১০০	১০০

উৎস : গবেষকের জরিপ।

সারণি- ৩২ : সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে খ্রিষ্টধর্মের স্বীকৃতির সামাজিক লিঙ্গ ভিত্তিক পর্যালোচনা।

Crosstabulation

		সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে খ্রিষ্টধর্মের স্বীকৃতি			মোট
		হ্যাঁ	না	উত্তর নাই	
সামাজিক লিঙ্গ	পুরুষ	৩৯	৩০	২	৭১
	মহিলা	২০	৮	১	২৯
মোট		৫৯	৩৮	৩	১০০

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	১.৮৮১[a]	২	.৩৯১
Likelihood Ratio	১.৯৩৫	২	.৩৮০
Linear-by-Linear Association	১.১৯৫	১	.২৭৪
N of Valid Cases	১০০		

a. 2 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .87.

উৎস : গবেষকের জরিপ।

সারণি- ৩৩ : সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে খ্রিষ্টধর্মের স্বীকৃতির বয়স ভিত্তিক পর্যালোচনা।

		সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে খ্রিষ্টধর্মের স্বীকৃতি			মোট
		হ্যাঁ	না	উত্তর নাই	
বয়স	১৫-২৪	৩৩	২২	১	৫৬
	২৫-৩৪	১৬	১২	২	৩০
	৩৫-৪৪	০	১	০	১
	৪৫-৫৪	৩	১	০	৪
	৫৫-৬৪	৫	১	০	৬
	৬৫-৭৪	১	১	০	২
	৭৫-৮৪	১	০	০	১
মোট		৫৯	৩৮	৩	১০০

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	৬.৩০১[a]	১২	.৯০০
Likelihood Ratio	৭.১৫৬	১২	.৮৪৭
Linear-by-Linear Association	.৮৬৩	১	.৩৫৩
N of Valid Cases	১০০		

a. 17 cells (81.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .03.
উৎস : গবেষকের জরিপ।

সারণি- ৩৪ : সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে খ্রিষ্টধর্মের স্বীকৃতির এলাকা ভিত্তিক পর্যালোচনা।

Crosstabulation

		সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে খ্রিষ্টধর্মের স্বীকৃতি			মোট
		হ্যাঁ	না	উত্তর নাই	
এলাকা	টংনাপাড়া	১৮	১৫	১	৩৪
	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী	১৭	১৫	১	৩৩
	কালাচাঁদপুর	২৪	৮	১	৩৩
মোট		৫৯	৩৮	৩	১০০

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	৪.০৪১[a]	৪	.৪০১
Likelihood Ratio	৪.১৮৮	৪	.৩৮১
Linear-by-Linear Association	২.০৭৬	১	.১৫০
N of Valid Cases	১০০		

a. 3 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .99.
উৎস : গবেষকের জরিপ।

সারণি- ৩৫ : খ্রিষ্টধর্ম ও আচিক্ মান্দি ধর্মের মধ্যকার দ্বন্দ্বমূলক বিষয়ের গণসংখ্যা সন্নিবেশ।

দ্বন্দ্বমূলক বিষয়	গণনা	শতকরা
খ্রিষ্টের জন্মবৃত্তান্তে বিশ্বাস	২৬	৬.৬
একেশ্বরবাদে বিশ্বাস	৮৫	২১.৬
ঋতুভিত্তিক আনুষ্ঠানিকতায় বিশ্বাস	৭৩	১৮.৬
মৃত্যু পরবর্তী জীবনে বিশ্বাস	৩৯	৯.৯
গির্জার পবিত্রতায় বিশ্বাস	১৮	৪.৬
বিবাহ প্রথা	৮০	২০.৪
উত্তরাধিকার প্রথা	৬২	১৫.৮
পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক	৪	১.০
অন্যান্য	১	০.৩
উত্তর নাই	৫	১.৩
মোট	N=১০০	১০০%

উৎস : গবেষকের জরিপ।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি- ৩৬ : খ্রিষ্টধর্ম ও আচিক্ মান্দি ধর্মের মধ্যকার দ্বন্দ্বমূলক বিষয়ের সামাজিক লিঙ্গ ভিত্তিক পর্যালোচনা।

	সামাজিক লিঙ্গ	
	পুরুষ	মহিলা
	গণনা	গণনা
খ্রিষ্টের জন্মবৃত্তান্তে বিশ্বাস	১৫	১১
একেশ্বরবাদে বিশ্বাস	৬৩	২২
ঋতু ভিত্তিক আনুষ্ঠানিকতায় বিশ্বাস	৫২	২১
মৃত্যু পরবর্তী জীবনে বিশ্বাস	২৬	১৩
গির্জার পবিত্রতায় বিশ্বাস	১১	৭
বিবাহ প্রথা	৫৫	২৫
উত্তরাধিকার প্রথা	৪৯	১৩
পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক	২	২
অন্যান্য	১	০
উত্তর নাই	১১	৪

Pearson Chi-Square Tests

		সামাজিক লিঙ্গ
ধর্মীয় দ্বন্দ্ব	Chi-square	১৪.৭৭৭
	df	১০
	Sig.	.১৪০[a,b]

Results are based on nonempty rows and columns in each innermost subtable.

a. More than 20% of cells in this subtable have expected cell counts less than 5. Chi-square results may be invalid.

b. The minimum expected cell count in this subtable is less than one. Chi-square results may be invalid.

উৎস : গবেষকের জরিপ।

সারণি- ৩৭ : খ্রিষ্টধর্ম ও আচিক্ মান্দি ধর্মের মধ্যকার দ্বন্দ্বমূলক বিষয়ের বয়স ভিত্তিক পর্যালোচনা।

	বয়স		
	১৫-২৪	২৫-৩৪	৩৫+
	গণনা	গণনা	গণনা
খ্রিষ্টের জন্মবৃত্তান্তে বিশ্বাস	১৩	৯	৪
একেশ্বরবাদে বিশ্বাস	৪৮	২৫	১২
ঋতু ভিত্তিক আনুষ্ঠানিকতায় বিশ্বাস	৩৬	২৪	১৩
মৃত্যু পরবর্তী জীবনে বিশ্বাস	২২	১৫	২
গির্জার পবিত্রতায় বিশ্বাস	৯	৭	২
বিবাহ প্রথা	৪৪	২২	১৪
উত্তরাধিকার প্রথা	৩৪	২০	৮
পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক	৩	১	০
অন্যান্য	০	০	১
উত্তর নাই	৯	৪	২

Dhaka University Institutional Repository

Pearson Chi-Square Tests

		বয়স
ধর্মীয় দ্বন্দ্ব	Chi-square	২৪.৩৬৮
	df	২০
	Sig.	.২২৭[a,b]

Results are based on nonempty rows and columns in each innermost subtable.

a. More than 20% of cells in this subtable have expected cell counts less than 5. Chi-square results may be invalid.

b. The minimum expected cell count in this subtable is less than one. Chi-square results may be invalid.

উৎস : গবেষকের জরিপ।

সারণি- ৩৮ : খ্রিষ্টধর্ম ও আচিক্ মান্দি ধর্মের মধ্যকার দ্বন্দ্বমূলক বিষয়ের এলাকা ভিত্তিক পর্যালোচনা।

	এলাকা		
	টংনাপাড়া	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী	কালাচাঁদপুর
	গণনা	গণনা	গণনা
খ্রিষ্টের জন্মবৃত্তান্তে বিশ্বাস	১৪	৫	৭
একেশ্বরবাদে বিশ্বাস	২৭	৩১	২৭
ঋতু ভিত্তিক আনুষ্ঠানিকতায় বিশ্বাস	৩০	২১	২২
মৃত্যু পরবর্তী জীবনে বিশ্বাস	১৫	১২	১২
গির্জার পবিত্রতায় বিশ্বাস	৯	৪	৫
বিবাহ প্রথা	২৯	২২	২৯
উত্তরাধিকার প্রথা	২৪	২১	১৭
পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক	০	৩	১
অন্যান্য	০	০	১
উত্তর নাই	১	৮	৬

Pearson Chi-Square Tests

		এলাকা
ধর্মীয় দ্বন্দ্ব	Chi-square	৩৯.২৭৩
	df	২০
	Sig.	.০০৬[*,b,c]

Results are based on nonempty rows and columns in each innermost subtable.

*. The Chi-square statistic is significant at the .05 level.

b. More than 20% of cells in this subtable have expected cell counts less than 5. Chi-square results may be invalid.

c. The minimum expected cell count in this subtable is less than one. Chi-square results may be invalid.

উৎস : গবেষকের জরিপ।

আচিক্ মান্দিদের সমাজ ব্যবস্থায় উত্তরাধিকার প্রথার বিবর্তন

সারণি- ৩৯ : উত্তরাধিকার স্থিতির গণসংখ্যা সন্নিবেশ।

প্রতিক্রিয়া	খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী মাতা-পিতা এবং প্রপিতামহগণ	পরিবারবর্গের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে ধর্মান্তরিত
হ্যাঁ	৮৮	২২
না	৮	৭৪
উত্তর নাই	৪	৪
মোট	১০০	১০০

উৎস : গবেষকের জরিপ।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি- ৪০ : খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী মাতা-পিতা এবং প্রপিতামহগণের সামাজিক লিঙ্গ ভিত্তিক পর্যালোচনা।

Crosstabulation

		খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী মাতা-পিতা এবং প্রপিতামহগণ			মোট
		হ্যাঁ	না	উত্তর নাই	
সামাজিক লিঙ্গ	পুরুষ	৬৫	৪	২	৭১
	মহিলা	২৩	৪	২	২৯
মোট		৮৮	৮	৪	১০০

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	২.৯২১[a]	২	.২৩২
Likelihood Ratio	২.৬৮৭	২	.২৬১
Linear-by-Linear Association	২.৫৩২	১	.১১২
N of Valid Cases	১০০		

a. 3 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.16.

উৎস : গবেষকের জরিপ।

সারণি- ৪১ : খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী মাতা-পিতা এবং প্রপিতামহগণের বয়স ভিত্তিক পর্যালোচনা।

Crosstabulation

		খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী মাতা-পিতা এবং প্রপিতামহগণ			মোট
		হ্যাঁ	না	উত্তর নাই	
বয়স	১৫-২৪	৫৪	০	২	৫৬
	২৫-৩৪	২৯	১	০	৩০
	৩৫+	৫	৭	২	১৪
মোট		৮৮	৮	৪	১০০

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	৪৬.১৫৩[a]	৪	.০০০
Likelihood Ratio	৩৪.৮৫২	৪	.০০০
Linear-by-Linear Association	১৬.৬০০	১	.০০০
N of Valid Cases	১০০		

a. 6 cells (66.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .56.

উৎস : গবেষকের জরিপ।

সারণি- ৪২ : খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী মাতা-পিতা এবং প্রপিতামহগণের এলাকা ভিত্তিক পর্যালোচনা।

Crosstabulation

		খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী মাতা-পিতা এবং প্রপিতামহগণ			মোট
		হ্যাঁ	না	উত্তর নাই	
এলাকা	টংনাপাড়া	২৭	৫	২	৩৪
	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী	৩৩	০	০	৩৩
	কালাচাঁদপুর	২৮	৩	২	৩৩
মোট		৮৮	৮	৪	১০০

Dhaka University Institutional Repository

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	৭.৪৩৪[a]	৪	.১১৫
Likelihood Ratio	১০.৯০৯	৪	.০২৮
Linear-by-Linear Association	.২৩৩	১	.৬২৯
N of Valid Cases	১০০		

a. 6 cells (66.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.32.
উৎস : গবেষকের জরিপ।

সারণি- ৪৩ : পরিবারবর্গের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে ধর্মান্তরিত হওয়ার সামাজিক লিঙ্গ ভিত্তিক পর্যালোচনা।

Crosstabulation

		পরিবারবর্গের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে ধর্মান্তরিত			মোট
		হ্যাঁ	না	উত্তর নাই	
সামাজিক লিঙ্গ	পুরুষ	১৪	৫৪	৩	৭১
	মহিলা	৮	২০	১	২৯
মোট		২২	৭৪	৪	১০০

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	.৭৫০[a]	২	.৬৮৭
Likelihood Ratio	.৭২৮	২	.৬৯৫
Linear-by-Linear Association	.৫০২	১	.৪৭৯
N of Valid Cases	১০০		

a. 2 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.16.
উৎস : গবেষকের জরিপ।

সারণি- ৪৪ : পরিবারবর্গের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে ধর্মান্তরিত হওয়ার বয়স ভিত্তিক পর্যালোচনা।

Crosstabulation

		পরিবারবর্গের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে ধর্মান্তরিত			মোট
		হ্যাঁ	না	উত্তর নাই	
বয়স	১৫-২৪	৮	৪৫	৩	৫৬
	২৫-৩৪	৮	২১	১	৩০
	৩৫+	৬	৮	০	১৪
মোট		২২	৭৪	৪	১০০

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	৬.৩৪০[a]	৪	.১৭৫
Likelihood Ratio	৬.৫০৭	৪	.১৬৪
Linear-by-Linear Association	৫.১২১	১	.০২৪
N of Valid Cases	১০০		

a. 4 cells (44.4%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .56.
উৎস : গবেষকের জরিপ।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি- ৪৫ : পরিবারবর্গের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে ধর্মান্তরিত হওয়ার এলাকা ভিত্তিক পর্যালোচনা।

Crosstabulation

		পরিবারবর্গের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে ধর্মান্তরিত			মোট
		হ্যাঁ	না	উত্তর নাই	
এলাকা	টংনাপাড়া	১২	২২	০	৩৪
	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী	২	২৭	৪	৩৩
	কালাচাঁদপুর	৮	২৫	০	৩৩
মোট		২২	৭৪	৪	১০০

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	১৫.৪২২[a]	৪	.০০৪
Likelihood Ratio	১৭.৩০১	৪	.০০২
Linear-by-Linear Association	.৬১১	১	.৪৩৪
N of Valid Cases	১০০		

a. 3 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.32.

উৎস : গবেষকের জরিপ।

সারণি- ৪৬ : ধর্মান্তরিত হবার সময় সময়ব্যাপ্তির গণসংখ্যা সন্নিবেশ।

প্রতিক্রিয়া	গণনা
১ থেকে ৫ বছর	১
৫ থেকে ১০ বছর	৭
১০ বছরের অধিক	২১
উত্তর নাই	৭১
মোট	১০০

উৎস : গবেষকের জরিপ।

সারণি- ৪৭ : ধর্মান্তরিত (যখন মাতা-পিতা এবং প্রপিতামহগণ খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী নয়) হবার সময় সময়ব্যাপ্তির সামাজিক লিঙ্গ ভিত্তিক পর্যালোচনা।

Crosstabulation

		ধর্মান্তরিত হবার সময়ব্যাপ্তি				মোট
		১ থেকে ৫ বছর	৫ থেকে ১০ বছর	১০ বছরের অধিক	উত্তর নাই	
সামাজিক লিঙ্গ	পুরুষ	০	৬	১১	৫৪	৭১
	মহিলা	১	১	১০	১৭	২৯
মোট		১	৭	২১	৭১	১০০

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	৭.৬০২[a]	৩	.০৫৫
Likelihood Ratio	৭.৪৬৩	৩	.০৫৯
Linear-by-Linear Association	১.৭৪৮	১	.১৮৬
N of Valid Cases	১০০		

a. 4 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .29.

উৎস : গবেষকের জরিপ।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি- ৪৮ : ধর্মান্তরিত (যখন মাতা-পিতা এবং প্রপিতামহগণ খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী নয়) হবার সময় সময়ব্যাপ্তির বয়স ভিত্তিক পর্যালোচনা।

Crosstabulation

		ধর্মান্তরিত হবার সময়ব্যাপ্তি				মোট
		১ থেকে ৫ বছর	৫ থেকে ১০ বছর	১০ বছরের অধিক	উত্তর নাই	
বয়স	১৫-২৪	০	১	৭	৪৮	৫৬
	২৫-৩৪	১	৩	৪	২২	৩০
	৩৫+	০	৩	১০	১	১৪
মোট		১	৭	২১	৭১	১০০

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	৩৮.৫৪৯[a]	৬	.০০০
Likelihood Ratio	৩৭.০২৫	৬	.০০০
Linear-by-Linear Association	২২.৮৮২	১	.০০০
N of Valid Cases	১০০		

a. 7 cells (58.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .14.

উৎস : গবেষকের জরিপ।

সারণি- ৪৯ : ধর্মান্তরিত (যখন মাতা-পিতা এবং প্রপিতামহগণ খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী নয়) হবার সময় সময়ব্যাপ্তির এলাকা ভিত্তিক পর্যালোচনা।

Crosstabulation

		ধর্মান্তরিত হবার সময় সময়ব্যাপ্তি				মোট
		১ থেকে ৫ বছর	৫ থেকে ১০ বছর	১০ বছরের অধিক	উত্তর নাই	
এলাকা	টংনাপাড়া	১	৬	১২	১৫	৩৪
	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী	০	০	০	৩৩	৩৩
	কালাচাঁদপুর	০	১	৯	২৩	৩৩
মোট		১	৭	২১	৭১	১০০

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	২৮.৭৩৪[a]	৬	.০০০
Likelihood Ratio	৩৬.২২২	৬	.০০০
Linear-by-Linear Association	৮.২৭৮	১	.০০৪
N of Valid Cases	১০০		

a. 6 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .33.

উৎস : গবেষকের জরিপ।

গণসংখ্যা সন্নিবেশ

সারণি- ৫০ : বিগত দশ বছরে ধর্মবিশ্বাসে পরিবর্তনের গণসংখ্যা সন্নিবেশ।

প্রতিক্রিয়া	গণনা
অধিক ধর্মাবলম্বী হয়েছি	৫৫
ক্রমান্বয়ে কম ধর্মাবলম্বী হচ্ছি	১৩
কোন পরিবর্তন নাই	৩১
উত্তর নাই	১
মোট	১০০

উৎস : গবেষকের জরিপ।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি- ৫১ : পরিবারের অন্যান্য সদস্যবর্গ খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীর গণসংখ্যা সন্নিবেশ।

প্রতিক্রিয়া	গণনা
হ্যাঁ	৯৮
না	০
উত্তর নাই	২
মোট	১০০

উৎস : গবেষকের জরিপ।

সারণি- ৫২ : পরিবারবর্গের মধ্যে ধর্ম নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডার (যখন পরিবারের অন্যান্য সদস্যবর্গ খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী নয়) গণসংখ্যা সন্নিবেশ ।

প্রতিক্রিয়া	গণনা
হ্যাঁ	১২
না	৩৪
উত্তর নাই	৫৪
মোট	১০০

উৎস : গবেষকের জরিপ।

সারণি- ৫৩ : খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী হয়ে খ্রিষ্টধর্মের গির্জায় ধর্মীয় উপাসনায় সাপ্তাহিক সময় ব্যয়ের গণসংখ্যা সন্নিবেশ।

	খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী হয়ে ধর্মীয় উপাসনায় সময় ব্যয়				মোট
	ক্যাথলিক	ব্যাপ্টিস্ট	অন্যান্য	উত্তর নাই	
মোটেই না	১২	২	০	১	১৫
১ ঘন্টা ৩ ঘণ্টা	৫৮	২১	২	০	৮১
৩ বা ততোধিক ঘণ্টা	৩	১	০	০	৪
মোট	৭৩	২৪	২	১	১০০

উৎস : গবেষকের জরিপ।

সারণি- ৫৪ : আচার অনুষ্ঠান ও ধর্মীয় রীতি-নীতিতে আচিক্ মান্দিদের দেব-দেবীর উপাসনার গণসংখ্যা সন্নিবেশ।

প্রতিক্রিয়া	দেব-দেবীর উপাসনা	আচিক্ মান্দিদের ধর্ম পালনে পাদ্রীরা নিষেধাজ্ঞা	ধর্মীয় উপদেশবানীতে দেবদেবীর উপাসনায় নিষেধাজ্ঞা	খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী হয়েও আচিক্ মান্দিদের অনুষ্ঠানে	আচিক্ মান্দিদের সামাজিক অনুষ্ঠানে পাদ্রীদের উপস্থিত
হ্যাঁ	৮৯	৩৩	৫৭	৯০	৭৪
না	৯	৬৫	৪০	৯	২৩
উত্তর নাই	২	২	৩	১	৩
মোট	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০

উৎস : গবেষকের জরিপ।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি- ৫৫: খ্রিষ্টধর্ম ও আচিক্ মান্দি ধর্মে দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের গণসংখ্যা সন্নিবেশ।

প্রতিক্রিয়া	গণনা
হ্যাঁ	৮৯
না	১১
মোট	১০০

উৎস : গবেষকের জরিপ।

সারণি- ৫৬: আচিক্ মান্দি সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহে গির্জার পাদ্রীর পরিচয়ের গণসংখ্যা সন্নিবেশ।

গির্জার পাদ্রী	গণনা
ফাদার	৬৮
প্যাস্টর	১৮
ব্রাদার	১৯
সিস্টার	১৭
প্রিয়েচার	৪
রেভারেন্ট	২
বিশপ	৫
ডিকন	১
উত্তর নাই	১৫

উৎস : গবেষকের জরিপ।

সারণি- ৫৭: পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের খ্রিষ্টধর্মের অবস্থার গণসংখ্যা সন্নিবেশ।

প্রতিক্রিয়া	গণনা
হ্যাঁ	৯৮
না	০
উত্তর নাই	২
মোট	১০০

উৎস : গবেষকের জরিপ।

সারণি- ৫৮: সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে খ্রিষ্টধর্ম অনুসরণ করার গণসংখ্যা সন্নিবেশ।

প্রতিক্রিয়া	গণনা
হ্যাঁ	৫৯
না	৩৮
উত্তর নাই	৩
মোট	১০০

উৎস : গবেষকের জরিপ।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি- ৫৯: সমাজে ধর্মের প্রয়োজনীয়তার গণসংখ্যা সন্নিবেশ।

প্রতিক্রিয়া	গণনা
খুবই বেশী	৬৭
সাধারণ	২৭
সামান্য	৩
নাই	২
মোট	১০০

উৎস : গবেষকের জরিপ।

সারণি- ৬০ : ধর্মীয় প্রকারভেদে আচিক্ মান্দি ধর্ম পালনে পাদ্রীদের নিষেধাজ্ঞার গণসংখ্যা সন্নিবেশ।

	খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী হয়ে ধর্মীয় উপাসনায় সময় ব্যয়				মোট
	ক্যাথলিক	ব্যাপ্টিস্ট	অন্যান্য	উত্তর নাই	
হ্যাঁ	২৩	৮	১	১	৩৩
না	৪৮	১৬	১	০	৬৫
উত্তর নাই	২	০	০	০	২
মোট	৭৩	২৪	২	১	১০০

উৎস : গবেষকের জরিপ

সারণি- ৬১ : ধর্মীয় প্রকারভেদে গির্জার ধর্মীয় উপদেশবাণীতে আচিক্ মান্দিদের দেব-দেবীর উপাসনাকে নিষিদ্ধতার গণসংখ্যা সন্নিবেশ।

	খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী হয়ে ধর্মীয় উপাসনায় সময় ব্যয়				মোট
	ক্যাথলিক	ব্যাপ্টিস্ট	অন্যান্য	উত্তর নাই	
হ্যাঁ	৩৭	১৭	২	১	৫৭
না	৩৩	৭	০	০	৪০
উত্তর নাই	৩	০	০	০	৩
মোট	৭৩	২৪	২	১	১০০

উৎস : গবেষকের জরিপ

সারণি- ৬২ : : ধর্মীয় প্রকারভেদে খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী হয়েও আচিক্ মান্দি অনুষ্ঠানে যোগদানের গণসংখ্যা সন্নিবেশ।

	খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী হয়ে ধর্মীয় উপাসনায় সময় ব্যয়				মোট
	ক্যাথলিক	ব্যাপ্টিস্ট	অন্যান্য	উত্তর নাই	
হ্যাঁ	৬৬	২২	২	০	৯০
না	৭	১	০	১	৯
উত্তর নাই	০	১	০	০	১
মোট	৭৩	২৪	২	১	১০০

উৎস : গবেষকের জরিপ

Dhaka University Institutional Repository

সারণি- ৬৩ : আচিক্ মান্দি সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহে গির্জার পাদ্রিদের উপস্থিতির গণসংখ্যা সন্নিবেশ।

	খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী হয়ে ধর্মীয় উপাসনায় সময় ব্যয়				মোট
	ক্যাথলিক	ব্যাপ্টিস্ট	অন্যান্য	উত্তর নাই	
হ্যাঁ	৫৪	১৭	২	১	৭৪
না	১৮	৫	০	০	২৩
উত্তর নাই	১	২	০	০	৩
মোট	৭৩	২৪	২	১	১০০

উৎস : গবেষকের জরিপ

সারণি- ৬৪ : ধর্মীয় প্রকারভেদে পরিবারের অন্য সদস্যদের খ্রিষ্টধর্মের অবস্থার গণসংখ্যা সন্নিবেশ।

	খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী হয়ে ধর্মীয় উপাসনায় সময় ব্যয়				মোট
	ক্যাথলিক	ব্যাপ্টিস্ট	অন্যান্য	উত্তর নাই	
হ্যাঁ	৭২	২৩	২	১	৯৮
না	০	০	০	০	০
উত্তর নাই	১	১	০	০	২
মোট	৭৩	২৪	২	১	১০০

উৎস : গবেষকের জরিপ

সারণি- ৬৫ : ধর্মীয় প্রকারভেদে পরিবারবর্গের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে ধর্মান্তরিত হবার গণসংখ্যা সন্নিবেশ।

	খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী হয়ে ধর্মীয় উপাসনায় সময় ব্যয়				মোট
	ক্যাথলিক	ব্যাপ্টিস্ট	অন্যান্য	উত্তর নাই	
হ্যাঁ	১৯	১	১	১	২২
না	৫১	২২	১	০	৭৪
উত্তর নাই	৩	১	০	০	৪
মোট	৭৩	২৪	২	১	১০০

উৎস : গবেষকের জরিপ

সারণি- ৬৬ : খ্রিষ্টধর্ম ও আচিক্ মান্দির মধ্যে পারিবারিক এবং উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বের গণসংখ্যা সন্নিবেশ।

প্রতিক্রিয়া	গণনা
বিবাহ সংক্রান্ত	৫৩
উত্তরাধিকার	৪১
পারিবারিক সম্পর্ক	৩
উত্তর নাই	৩
মোট	১০০

উৎস : গবেষকের জরিপ।

সারণি- ৬৭ : ধর্মীয় প্রকারভেদে খ্রিষ্ট ধর্ম ও আচিক্ মান্দি ধর্মের মধ্যকার দ্বন্দ্বমূলক বিষয়ের গণসংখ্যা সন্নিবেশ।

	বিবাহ সংক্রান্ত	উত্তরাধিকার	পারিবারিক সম্পর্ক	উত্তর নাই
ক্যাথলিক	৬০	৪০	৩	৫
ব্যাপ্টিস্ট	১৯	১৯	১	০
অন্যান্য	১	২	০	০

উৎস : গবেষকের জরিপ।

Dhaka University Institutional Repository

আলোকচিত্র

চিত্র **১** : বিরিশিরি গির্জাঘর (বর্তমান চিত্র)।

চিত্র **২** : রাণীখং গির্জাঘর (বর্তমান চিত্র)।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ৩ : ভালুকাপাড়া গির্জাঘর (বর্তমান চিত্র)।

চিত্র ৪ : মরিয়মনগর গির্জাঘর (বর্তমান চিত্র)।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ৫ : ময়মনসিংহ গির্জাঘর (বর্তমান চিত্র)।

চিত্র ৬ : জলছত্র গির্জাঘর (বর্তমান চিত্র)।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ৭ : বিড়ইডাকুনী গির্জাঘর (বর্তমান চিত্র)।

চিত্র ৮ : ওয়ানগালা উৎসবে পাদ্রিদের অংশগ্রহণ।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ৯ : উৎসবে একে অপরের সাথে আনন্দ ভাগাভাগি।

চিত্র ১০ : ওয়ানগালা উৎসবে বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধিত্ব।

চিত্র ১১ : ওয়ানগালা উৎসবের নাচ